অতিলৌকিক উপন্যাসিকা
নিতাই ফকির
হরর বড় গল্প
কালচৈত্রীর বজ্রপাত
দুটি রহস্য গল্প
শিকার ও
যাত্রা সমীকরণ

এপ্রিল, ২০১৭

রহস্য পত্রিকা

রাফায়েল
সাবাতিনির গল্প
গুপ্তচর
রোমাঞ্চ গল্প
বসতি

ভেনেজুয়েলান
সৌন্দর্যের
গোপন রহস্য

সবা প্রকাশনা

একটি রেমাশ নিবেদন

লিমন

Remash

Presents

https://www.banglapdf.net
https://www.boighar.com
https://www.boilovers.com

Scan & Edit

Md. Shahidul Kaysar Limon
মোঃ শহীদুল কায়সার লিমন
https://www.facebook.com/limon1999

জন্মদিনে রক্ত দিন
বাঁচান ৪টি প্রাণ

কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম বর্তমানে হোল ব্লাডসহ প্লাটিলেট কনসেনট্রেট, ফ্রেশ প্লাজমা, ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা, প্লাটিলেট রিচ প্লাজমা, প্লাটিলেট পুওর প্লাজমা, ক্রায়ো-প্রিসিপিটেট, প্রোটিন সলিউশন ও আরসিসি অর্থাৎ রক্তের মোট ৮টি উপাদান সরবরাহ করছে

স্ক্রিনিং ছাড়া

রক্ত নেবেন না। এমনকি তা আপনজনের হলেও নয়। কারণ তার রক্তেও সুপ্ত থাকতে পারে সংক্রামক ঘাতক ব্যাধির জীবাণু।

যেকোনো গ্রুপের নিরাপদ সুস্থ ও স্বেচ্ছা রক্তের প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন

স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম
কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক
[পুরনো ১১৯/পি শান্তিনগর] ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৫১৯৬৯, ০৯৬১৩-০০২০২৫, ০১৭১৪-০১০৮৬৯
website www.quantummethod.org.bd

আজীবন স্বেচ্ছা রক্তদাতা হোন
দুঃসময়ের জন্যে রক্ত সঞ্চয় করুন

এই সংখ্যায়

৩৩ বর্ষ • ৬ সংখ্যা • এপ্রিল ২০১৭

রহস্য পত্রিকা

এই পত্রিকার কোনও লেখা কর্তৃপক্ষের যথাযথ অনুমতি ছাড়া অন্য কোথাও মুদ্রণ করা যাবে না।

সম্পাদক
কাজী আনোয়ার হোসেন

নির্বাহী সম্পাদক
কাজী শাহনূর হোসেন
কাজী মায়মুর হোসেন

শিল্প সম্পাদক
ধ্রুব এষ

প্রকাশনা ও মুদ্রণ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগ
রহস্যপত্রিকা
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
টেলিফোন: ৮৩১৪১৮৪
মোবাইল: ০১৭৮৪-৮৪০২২৮
mail: alochonabibhag@gmail.com
www.faccbook.com/shebaofficial

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭

প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

মূল্য :: চল্লিশ টাকা

সত্য ঘটনা
নিঃশব্দ আততায়ী ৬
রূপান্তর: ডিউক জন
মুক্তিযুদ্ধ
অকুতোভয় বীর ১১
রুবেল কান্তি নাথ
ফিচার
ড্রেসলার সিনড্রোম ১৪
ডা. মোঃ ফজলুল কবির গাজেল
ডেনেজুয়েলান সৌন্দর্যের
গোপন রহস্য ৫৪
অন্বেষা বড়ুয়া
ফলেট প্যাপিলাইটিস ১২৮
ডা. মোঃ ফারুক হোসেন
বিজ্ঞানের রহস্য ১৩২
তারেকুর রহমান
হরর গল্প
মায়া ১৫
রিয়াজুল আলম শাওন
ছায়াশ্বাপদ ৯৪
আবুল ফাতাহ
মনোজগৎ
কথা রাখা না রাখার কথা ১৮
বিপ্ত চৌধুরী
ক্লাসিক গল্প
প্রজাপতি ২১
রূপান্তর: বসরু চৌধুরী
অনুবাদ গল্প
গুপ্তচর ২৯
রূপান্তর: শাহেদ জামান
দ্য বডিগার্ড ৫৬
রূপান্তর: ডা. রাফসান রেজা রিয়াদ
রহস্য গল্প
যাত্রা সমীকরণ ৩৯
মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ
শিকার ১৩৬
রূপান্তর: আফরানুল ইসলাম সিয়াম
সায়েন্স ফ্যান্টাসি
কন্ট্রোলার ৪৮
প্রান্ত ঘোষ দস্তিদার
অতিলৌকিক উপন্যাসিকা
নিতাই ফকির ৬৬
তৌফির হাসান ইব রাকিব
লোককথা
নিতাই মাস্টার ৭৭
সুমন দাস
সময়ের গল্প
অপারেশন রমনা পার্ক ৮৪
মুনতাসীর মারুফ
রম্য গল্প
দ্বন্দ্ব ৯০
খো. মেহেদি হাসান
হরর বড় গল্প
কালচৈত্রীর বজ্রপাত ১০৭
নাসির খান
মনস্তাত্ত্বিক গল্প
লাশের গন্ধ ১১৮
মনিজা রহমান
রোমাঞ্চ গল্প
বসতি ১২৪
স্নিগ্ধা আফসানা রোশনী
ভৌতিক গল্প
জলভূতের খপ্পরে ১২৯
জাহাঙ্গীর আলম সুজন
মিনি গল্প
সর্বনাশ ১৩৩
মোঃ সাজেদুল ইসলাম সাজিদ

আরও রয়েছে

খোলা চিঠি ৫ গল্পকলি ১৩ ইতিহাসের গল্প ২৪
আপনার স্বাস্থ্য ২৬ ভ্রমণ অভিজ্ঞতা ৩৭, ৬২, ১০১
মজার অভিজ্ঞতা ৪৫ বিজ্ঞান বার্তা ৫২ প্রশ্ন-উত্তর ৭৬
রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা ৮০ খণ্ডচিত্র ৮৮ স্মৃতিচারণা ৯২
শব্দ-ফাঁদ ১০০ ভাগ্যচক্র ১১৫ জানা-অজানা ১২৩
আত্ম-উন্নয়ন ১৩৫ বই-পরিচিতি ১৪৪

গা শিউরে ওঠা হরর কাহিনি পড়তে ভালবাসেন?
তা হলে রুমানা বৈশাখীর সাম্প্রতিক বইগুলো আপনার জন্যই!

পিশাচ কাহিনি
'অবলৌকিক'
বিদ্যা প্রকাশ

অতিপ্রাকৃত উপন্যাস
'পুনঃশায়াতিন'
জাগৃতি প্রকাশনী

অতিপ্রাকৃত উপন্যাস
'শায়াতিন'
জাগৃতি প্রকাশনী

হরর উপন্যাস 'ছায়ারীরী'
বিদ্যা প্রকাশ

এ ছাড়াও
আছে–
ভালবাসার
সমস্যা
সমাধানে

'প্রিয় সম্পর্ক'
জাগৃতি প্রকাশনী

ঘরে বসেই রুমানা বৈশাখীর যে-কোনও বই কিনতে ডায়াল করুন–
মিট মনস্টার: ০১৭৩৫-৮৯৮৫৪৬ নম্বরে। কুরিয়ার চার্জ মাত্র ২৫ টাকা।
ফেসবুকে সম্পূর্ণ বইয়ের তালিকা দেখতে ভিজিট করুন–
https://www.facebook.com/meatmonsterr/
এ ছাড়াও কিনতে পারেন রকমারি ডট কম থেকে। ফোন: ১৬২৯৭।

খোলা চিঠি

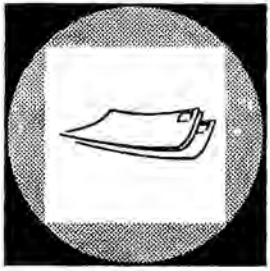

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

আশরাফুল ইসলাম বকুল
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

কুষ্টিয়া জেলার খোকসা থানার গোপগ্রাম নিবাসী আব্দুস সামাদ। দেশের স্বাধীনতার ডাকে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালের এক রাতে বাড়ি থেকে পালান। সীমান্ত পার হয়ে প্রতিবেশী দেশ ভারতে প্রবেশ করেন মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিতে। তিন মাস ভারতের বিভিন্ন এলাকায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি সশস্ত্র দল নিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে, দর্শনা হয়ে চুয়াডাঙ্গা প্রবেশ করা মাত্র পাকিস্তানি সৈন্যদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। সেই থেকে আজও নিখোঁজ বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সামাদ! ছেলে ফিরে আসবে, এই আশায় আব্দুস সামাদের মা-বাবা পথ চেয়ে বসে থেকে চোখের পানি ফেলতেন। ছেলে না আসার শোকে দু'জনই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। বিজয়ের ৪৬ বছর পার হচ্ছে। নিখোঁজ বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সামাদ আজও ফেরেননি। তিনি শহীদের তালিকায় রয়েছেন, কিন্তু তাঁর লাশটা পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সামাদের পরিবার-পরিজনেরা শহীদ মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা গ্রহণ করছেন। হয়তো বা আর কোনওদিন তিনি ফিরবেন না।

১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে এভাবে অসংখ্য বীর মুক্তিযোদ্ধা নিখোঁজের তালিকায় রয়েছেন। আমি মনে করি এঁরা সবাই যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, অথবা পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকার বাহিনী এঁদেরকে আটক করে, ক্যাম্পে নিয়ে টর্চার করতে-করতে হত্যা করে লাশ গুম করে ফেলেছে, যার ফলে এসব শহীদের লাশ আজও খুঁজে পাওয়া যায়নি। এই শহীদ মুক্তিযোদ্ধারা তাঁদের জীবন দিয়ে এনে দিয়েছেন আমাদের মহান স্বাধীনতা। বিজয়ের ৪৬ বছর পূর্তি উপলক্ষে সেই সব শহীদ বীর সন্তানকে আমরা জানাই রক্তিম সালাম। যাঁদের রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা, এই মহান বীর যোদ্ধাদের আমরা কোনওদিন ভুলে যাব না। মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সামাদের মত এদেশের লক্ষ-লক্ষ বীর শহীদের প্রতি রইল আমাদের প্রাণঢালা ভালবাসা। মহান মুক্তিযুদ্ধের সাতজন বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধার একজন, ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের কবরটি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর ৭ নং সেক্টরে, চাঁপাইনবাবগঞ্জে যুদ্ধরত অবস্থায় পাকিস্তানিদের গুলিতে শহীদ হন তিনি। ঐতিহাসিক সোনা মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁকে সমাহিত করা হয়। আমি কিছুদিন আগে তাঁর কবরটি পরিদর্শন করি।■

বিজ্ঞপ্তি

রহস্যপত্রিকায় লিখতে হলে লেখার সাথে অবশ্যই ফেরত খাম (নাম-ঠিকানা সহ) বা পোস্টকার্ড পাঠাতে হবে। লেখা মনোনীত হোক বা না হোক আপনাকে তা জানিয়ে দেয়া হবে। আমাদের মনোনীত কোনও লেখা অন্য কোনও পত্রিকায় পাঠালে অবশ্যই যথাশীঘ্র সম্ভব আমাদের জানাতে হবে। সেক্ষেত্রে সেই লেখাটা আমরা ছাপব না। খোলা চিঠি ও প্রশ্নোত্তর বিভাগগুলোর জন্য ফেরত খাম পাঠাতে হবে না। যে-কোনও লেখার কপি রেখে পাঠাবেন, তবে ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়।

নিঃশব্দ আততায়ী

মূল ▮ জে. এইচ. প্যাটারসন
রূপান্তর ▮ ডিউক জন

ওই সময় মানুষখেকোর আতঙ্ক ভাল মতই পেয়ে বসেছিল প্রত্যেককে। কল্পনাপ্রবণ হিন্দুরা অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিকারী বলে ভাবতে শুরু করেছিল প্রাণীগুলোকে।

উনিশশো সাত সালের দশই অক্টোবর ভেসে পড়লাম মারসেই বন্দর থেকে। কর্তব্যের খাতিরে আরও একবার চলেছি মোমবাসা অভিমুখে। ব্রিটিশ ইস্ট আফ্রিকার রৌদ্রকরোজ্জ্বল আর বিপদসঙ্কুল, ভয়ঙ্কর সুন্দর সেই স্বর্গভূমির উদ্দেশে।

তিন হপ্তার মধ্যে পৌঁছে গেলাম গন্তব্যে। কিলিনদিনি পোতাশ্রয়ে নোঙর ফেলা হলো। এখান থেকেই নাইরোবির ট্রেন ধরলাম–কেনিয়ার রাজধানী। ইউগাণ্ডা রেলওয়ের একটা ক্যারিজে অস্থির ঘুমে এপাশ-ওপাশ করতে-করতে জেগে উঠি কোনও এক মধ্যরাতে। নভেম্বরের এক তারিখ ছিল সেদিন। টের পেলাম, উতরাই বেয়ে নেমে চলেছে রেলগাড়িটা, *সাভো*র উপত্যকার দিকে চলেছে, উপকূল থেকে একশো তিরিশ মাইলমত দূরে।

মনে হলো, নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছি আমি। কামরার জানালা দিয়ে উঁকি দিলাম তারা ভরা রাত্রির বুকে। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি কণ্টকময় তেপান্তরের অন্ধকার গভীরতায়। কত না অপার রহস্য লুকিয়ে আছে ওই প্রান্তরে!

রোদজ্বলা এই *নায়ীকার* বিশাল বিস্তারের যেন কোনও পরিবর্তন নেই। কত অজস্র ঘটনা মনে পড়ছে! রেলওয়ের কাজ করতে এসে কত অঘটনই না প্রত্যক্ষ করতে হলো সেবার। বিচিত্র সব

অভিজ্ঞতা হলো। রোজ-রোজ শ্রমিকদের সিংহের পেটে যাওয়া তো ছিল নৈমিত্তিক ঘটনা।

খাই-খাই স্বভাবের এক জোড়া সিংহ ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল জংলি এ জনপদে। জানোয়ারগুলোর উৎপাত এবং অন্তিম পরিণতির গল্পটা বলেছি আমার 'সাভোর মানুষখেকো' বইয়ে। কিন্তু বিয়োগান্ত আরও অনেক মৃত্যু আর অল্পের জন্য বেঁচে ফেরার বহু কাহিনিই লিপিবদ্ধ করা হয়নি এখনও। এরকমই কিছু স্মৃতি হঠাৎ-হঠাৎ হানা দেয় মগজের মধ্যে, ঘোঁট পাকায়। ফেলে আসা ওই সব মুহূর্ত জ্যান্ত হয়ে ওঠে তখন। চোখের সামনে উন্মোচিত হয়ে পড়ে সুপরিচিত স্থান-কাল-পাত্রের স্থানগুলো।

কেঁপে উঠলাম। এই মুহূর্তে বিশেষ করে মনে পড়ছে এমনই এক হতভাগ্য শ্রমিকের কথা। নিষ্ঠুর শিকার হয়েছিল লোকটা হিংস্র জানোয়ার দুটোর একটার। নিজ চোখে ভয়ঙ্কর ঘটনাটা প্রত্যক্ষ করা আরেক রেল-শ্রমিক, জানোয়ারের শিকার হওয়া সহকর্মীকে টেনে নিয়ে যাওয়ার ক'ঘণ্টা পরে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কাহিনির বিবরণ দেয় আমার কাছে। এর চেয়ে বিভীষিকাময় গল্প আমি আর শুনিনি। বেচারী শ্রমিক ছিল এক ভারতীয় কুলি, ওরই মত এক দল লোকের সঙ্গে কাজে যোগ দিয়েছিল রেল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে। রেললাইন বসানো ও মেরামতির জন্য দরকারি মালপত্র আনা-নেয়া করত। মানুষখেকোগুলো তখনও কুখ্যাত অঞ্চলে পরিণত করেনি সাভোকে, যে, ওগুলোর ভয়ে ঈশ্বরের নাম জপত শ্রমিকরা। পরে তো জোড়া শয়তানের দাপটে খোলা প্রান্তরের যত্রতত্র নির্ভয়ে ঘুমানোই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এক সন্ধ্যার কথা। ততক্ষণে বোধ হয় যমদূতের খাতায় উঠে গেছে দুর্ভাগা শ্রমিকটির নাম। খালি এক ট্রাকে সঙ্গীসাথী সমেত বিশ্রাম নিচ্ছিল লোকটা। ট্রাকটা দাঁড়িয়ে ছিল রেলের মূল লাইনের সঙ্গে সংযুক্ত ছোট লাইনের পাশে। এর সাহায্যে লাইন বদল করা হয় গাড়ির।

সব শ্রমিকের জায়গা হয়নি ট্রাকে। কাজেই, কিছু লোক ঠাঁই নিল গিয়ে লাইনের আরেক ধারে গাদা করে রাখা কাঠের স্লিপারের উপরে। আমি যার কাছে ঘটনার বিবরণ শুনি, সেই শ্রমিক ছিল দ্বিতীয় এই দলটাতেই।

লোকটা আমাকে বলে, ম্লান জোছনায় ঘুম ভেঙে গিয়েছিল তার আচমকা। শ্বাসরুদ্ধকর আতঙ্ক নিয়ে দেখতে পায়, ঝোপঝাড়ের ভিতর থেকে চুপিসারে বেরিয়ে আসছে একটা সিংহ। নিঃশব্দে ট্রাকটার দিকে এগোতে লাগল জানোয়ারটা, যেটায় অকাতরে শুয়ে ঘুম দিচ্ছিল কাহিনিকারের ভাই-বেরাদাররা।

তৎক্ষণাৎ চিৎকার করে ওঠে সে: 'হুঁশিয়ার, ভাইয়েরা! সিংহ! সিংহ আসছে!!'

জোর এই গলার আওয়াজে বিড়ালের নিঃশব্দ ক্ষিপ্রতায় সাঁৎ করে ছায়ার মধ্যে লুকিয়ে পড়ল হিংস্র শ্বাপদ। সবাই যখন ঘাড় তুলে ইতিউতি খুঁজছে প্রাণীটাকে, কোথাও দেখা গেল না ওটাকে।

'সেরাতে একটা মালগাড়ি অবস্থান করছিল ছোট লাইনটায়। জানোয়ারটাকে দেখতে না পাবার কারণ, দশাসই শরীরটা নিয়ে এক ছুটে ওয়্যাগনগুলোর নিচের অন্ধকারে পুরোপুরি আড়াল নিয়েছিল সিংহটা। ক'মিনিট পরে জ্বলন্ত এক জোড়া চোখ লক্ষ করতে লাগল গার্ডদের ভ্যানটাকে।

কম্বলে শরীর মুড়ে ভ্যানের মধ্যে শুয়ে ঘুমাচ্ছিল ওজিলভি নামে এক ইঞ্জিনিয়ার। সমুদ্রতীরে হাওয়া-বদলের উদ্দেশে সাময়িকভাবে কাজ থেকে অব্যাহতি নিয়েছিল লোকটা।

বেচারা ওজিলভি! ঘুণাক্ষরেও কি কল্পনা করেছিল, কী অপেক্ষা করছে ওর জন্য?

সন্দেহাতীতভাবে ওকেই পাকড়াও করত বিড়াল গোষ্ঠীর রাজকীয় সদস্যটি। সে উদ্দেশ্যেই লাফ দেবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল ওটা। কিন্তু ঠিক তখনই সামান্য দূরে থাকা এক ক্লিনার ধাতব কোনও কিছু ফেলল স্তূপ করে রাখা লোহার রেলের-পাতের উপরে। ইঞ্জিনে কাজ করত লোকটা।

ধাতুর সঙ্গে ধাতুর টঙ্কারের আওয়াজটা নীরব রাত্রিতে বিচলিত করে তুলল জানোয়ারটাকে। শিকারের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার বদলে অন্ধকারে ফের ঘাপটি মেরে লুকাল সিংহটা।

একটু পরেই স্লিপারের গাদার উপর থেকে

ওটাকে আবার বেরিয়ে আসতে দেখল ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। ভ্যানের ছায়া থেকে বেরিয়ে কয়েক সেকেণ্ড খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল সিংহ। কিংকর্তব্যবিমূঢ় যেন। তারপর আবারও অদৃশ্য হলো মালবাহী ট্রেনটার নিচে।

বগিগুলোর নিচ দিয়ে খুব দ্রুত ছুটেছে নিশ্চয়ই চারপেয়েটা, কারণ, এক মুহূর্ত পরেই কুলিদের ট্রাকের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল ওটাকে।

এবার আর চেঁচিয়ে সাবধান করবার সময় পেল না লোকটা। তার আগেই লাফ দিল অভিজাত প্রাণী। সাক্ষাৎ আজরাইলের মত আকাশ থেকে খসে পড়ল যেন ট্রাকের মধ্যে। কল্পনা হয়তো করা যায়, কিন্তু আতঙ্কের যে বন্যা ছড়িয়ে পড়ল ট্রাক ভর্তি লোকগুলোর মধ্যে, তা এক কথায় অবর্ণনীয়। রাত্রির নীরবতা ভেঙে খান-খান হলো চিৎকার-চেঁচামেচি আর ভয়ার্ত কান্নার শব্দে।

শিকারের ঘাড় কামড়ে ধরল শক্তিশালী শ্বাপদ। টেরিয়ার কুকুর যেমন করে ঝাঁকায় ইঁদুরকে, তেমনিভাবে লোকটাকে ঝাঁকাল শিকারি। তারপর 'খাবার'-টা মুখে করে নামতে গেল ট্রাক থেকে...

হতভাগা লোকটার পাশেই শুয়ে ছিল ওজিলভির চাকর। বুঝতেই পারছেন ওর অবস্থা। শিকারের ঘাড়ে এক পা রেখে ট্রাকের ভিতরে নেমেছিল সিংহ। রসদ জোগাড় করে পালাতে উদ্যত হলো চার হাত-পায়ে। ওদিকে ভীষণ ভয়ে আধমরা অবস্থা জানোয়ারের খপ্পরে পড়া লোকটার। নিশ্চিতভাবেই মৃত্যু ছাড়া আর কিছু চিন্তা করতে পারছিল না কুলি। সম্মিলিত শোরগোলের সঙ্গে যোগ হলো ওর মরণ-চিৎকার। আশপাশে কয়েক মাইল পর্যন্ত জঙ্গল প্রকম্পিত হলো সে-চিৎকারের শব্দে।

কুলির আরেক পাশে শোয়া শ্রমিকটি বুঝতে পারল, পাশ থেকে টেনে নেয়া হচ্ছে ওর সহকর্মীকে। গোড়ালির গাঁট ধরে বাঁচাতে চেষ্টা করল ও বেচারাকে। কিন্তু পশুরাজ তার শিকারকে নিয়ে লাফ দিতেই গোড়ালি ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো অপর কুলিটি।

গল্পকথক আমাকে বলেছিল, লোকটাকে যখন টেনে নেয়া হচ্ছে ট্রাক থেকে, ছেঁচড়ে নেয়া হচ্ছে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে, হৃদয়বিদারক চিৎকার ছাড়ছিল জান্তব স্বরে। হাড় ভাঙার মুড়মুড় আর সন্তুষ্টির স্পষ্ট গড়গড়ানি কানে আসবার আগ পর্যন্ত ক্ষান্ত দেয়নি তারা খোঁজাখুঁজিতে। ওই আওয়াজ ঘোষণা করছিল, সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণার ঊর্ধ্বে চলে গেছে দুর্ভাগা কুলি।

আরেকটি মৃত্যুর কথা উল্লেখ করতেই হবে আমাকে। সেই ইঞ্জিনিয়ারটি, দারুণ সৌভাগ্যের জোরে যে রক্ষা পেয়েছিল সিংহের গ্রাস থেকে, শেষ পর্যন্ত বাঁচেনি সে-ও। ওই ঘটনার পর-পরই জ্বরে পড়ে যায় সে। মোমবাসা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে। সেখানেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে লোকটি।

ডক্টর উইনস্টোন-ওয়াটারস আর আমি দেখতে গিয়েছিলাম প্রকৌশলীকে। মৃত্যুর আগের ক'ঘণ্টা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি লোকটাকে চাঙা করে তুলতে।

রেলওয়ে বিষয়ে সেরা সব বিশেষজ্ঞদের অন্যতম ছিল ওজিলভি। বন্ধু হিসাবেও অসাধারণ।

ফিরে আসি মানুষখেকোর প্রসঙ্গে। জোড়া সিংহের সঙ্গে সম্পৃক্ত কৌতূহলোদ্দীপক আরও দুটো ঘটনা জানিয়ে রাখছি আপনাদের।

প্রথম ঘটনাটা ঘটেছিল সাভো ব্রিজের কাছে। একটুর জন্য রক্ষা পেয়েছিল ওখানে তাঁবু ফেলা আমার কিছু লোক। ওই সময় মানুষখেকোর আতঙ্ক ভাল মতই পেয়ে বসেছিল প্রত্যেককে। কল্পনাপ্রবণ হিন্দুরা অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিকারী বলে ভাবতে শুরু করেছিল প্রাণীগুলোকে।

পাঁচ শিখ কাঠমিস্ত্রি আট ফুট মত উঁচুতে মাচা বানাল একটা। ওটার উপরেই তাঁবু খাটাল তারা, যার ফলে শান্তির ঘুম ঘুমাতে পারল সেখানে। আর, যেমনটা ভেবেছিল–নিরাপদে। প্রতি রাতেই আলগা মই বেয়ে খোলা 'বাড়ি'-তে উঠে যেত লোকগুলো। রবিনসন ক্রুসোর মত, সতর্কতার অংশ হিসাবে রাত নামার সঙ্গে-সঙ্গেই মইটা তুলে নিত মাচার উপরে।

আগেই ওদের সতর্ক করেছিলাম, তেমন

উঁচু হয়নি মাচাটা। এটাও বলেছিলাম যে, এর চেয়ে জলাধারে নামা কিংবা গাছে চড়াও ঢের ভাল। অন্তত যদ্দিন পর্যন্ত না নিরাপদ নিবাস বানাতে পারছি লোকগুলোর জন্য। কাজ অবশ্য চলছিল বাড়ি বানানোর।

না, আমার কথায় জায়গা ছেড়ে নড়তে রাজি হয়নি মিস্ত্রিরা। ওদের সর্দার নাথা সিং আমাকে নিশ্চিন্ত করল এই বলে যে, অত উপরে পুরোপুরি নিরাপদ বোধ করছে ওরা। তা ছাড়া, 'খুদা' তো আছেনই। তিনি সর্বশক্তিমান।

ভাবটা যেন, খুদা বা ঈশ্বরই ওদের রক্ষা করবেন সমস্ত বিপদ-আপদ থেকে। কিন্তু...

এক রাতে স্বাভাবিক নিয়মের ব্যত্যয় ঘটল। কুছ-পরোয়া-নেই ভাব দেখিয়ে সেদিন আর তোলাই হলো না মইটা। শিকারান্বেষী ক্ষুধার্ত এক মানুষখেকো লক্ষ করল সেটা। ভাবল, এর চেয়ে সহজ শিকার মিলবে না আর কোথাও। কাঠমিস্ত্রির স্বাদ পরখ করবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ওটা।

মই লক্ষ্য করে মাপা লাফ দিল সিংহ। আলগোছে উড়ে গেল বাতাসে। কপাল খারাপ। উল্লম্ব সিঁড়িটার উপরে এসে পড়তেই লাফিয়ে উঠে এক পাশে কাত হয়ে যেতে শুরু করল নড়বড়ে মই। ধড়াম করে মাটিতে পড়ল সিংহ, তার উপরে মইটা।

সন্দেহ নেই, মইয়ের বাড়িটা ভাল মতই লেগেছিল হতভম্ব সিংহের গায়ে। দোপেয়েগুলোকে শিকারের চিন্তা বাদ দিয়ে ত্বরিত ভাগল জন্তুটা।

ওদিকে হয়েছে কী, মইয়ের খোঁচায় ফড়ফড় করে চিরে গেছে তাঁবুর কাপড়। ধড়মড় করে জেগে উঠে বসেছে থরহরিকম্প মিস্ত্রিগুলো। ভাবছে, ধারাল থাবায় তাঁবু ফেড়ে দিয়েছে সিংহটা। এক্ষুণি দফারফা করে দেবে ওদের।

আর কি থাকে ওখানে? যে যেভাবে পারে, লাফিয়ে নামল 'নিরাপদ' মাচাটা থেকে। তরাস খাওয়া গলায় চিৎকার করতে-করতে জান হাতে নিয়ে ছুটল কাছেপিঠে যে যে-গাছ পেল, সেদিকেই।

ভাগ্যক্রমে কেউই আহত হয়নি।

ওই ঘটনার পর থেকে খাঁ-খাঁ করতে লাগল মাচাটা। এর চেয়ে অধিকতর নিরাপদ ছিল পাথরের এক পিয়ার (লম্বা কাঠামো, যা পানিতে নামবার জন্য ব্যবহৃত হয়)। বিপদ বুঝলে ওটার মাথায় চড়ে বসত লোকেরা, সুড়ুত করে পিছলে নেমে যেত নদীতে।

অন্য ঘটনাটায় নরখাদকের উপস্থিতি আতঙ্কের নয়া মাত্রা যোগ করেছিল ভয়াবহ এক দুর্ঘটনার সঙ্গে। সাভো ব্রিজ থেকে তিন-চার মাইল দূরে হয়েছিল অ্যাক্সিডেন্টটা।

স্লিপার আর রড বোঝাই একটা রেলগাড়ি আসছিল কোথাও থেকে। রাত্রি বেলা। সাভো থেকে ভারতীয় স্টেশন-মাস্টার মারফত 'লাইন ক্লিয়ার' সঙ্কেত পেয়েছিল ড্রাইভার। দুর্ভাগ্য তার! অতিরিক্ত কাজের চাপে ভুলেই গিয়েছিল স্টেশন-মাস্টার, ইতোমধ্যেই আরেক স্টেশনের আরেক ট্রেনের আরেক ড্রাইভারকে এই একই মেসেজ টেলিগ্রাফ করেছে সে।

তো, সঙ্কেত পেয়ে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের পূর্ণ শক্তি ব্যবহার করে ছুটে চলল দ্বিতীয় ট্রেনটার ড্রাইভার। সাভো নদীর কারণে সৃষ্ট খাড়াই ভেঙে উপরের দিকে উঠতে হবে তাকে। সে কারণেই যতটা সম্ভব, বাড়িয়ে নিয়েছে বেগ। সে তো আর জানে না, কী আকামটা করে রেখেছে ব্যাটা স্টেশন-মাস্টার! সম্পূর্ণ নির্ভার বেচারা ট্রেন চালক। এক মুহূর্তের জন্যও কল্পনা করেনি, ঠিক সেই মুহূর্তে আঁকাবাঁকা সিঙ্গল ট্র্যাক ধরে ছুটে আসছে আরেকটা ট্রেন। তুমুল গতি তুলে উল্টো দিক থেকে!

অনিবার্য ছিল সংঘর্ষটা। আর হলোও তা-ই। তীক্ষ্ণ একটা বাঁকের মুখে এসে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগল ট্রেন দুটোর। লাইনের একেবারে সমান্তরালে চলে যাওয়া নিবিড় জঙ্গলের কারণে একদম শেষ মুহূর্ত ছাড়া কারও পক্ষেই দেখা সম্ভব ছিল না অপর ট্রেনটার হেডলাইটের আলো। যখন দেখল, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

কান ফাটানো আওয়াজ তুলে লাইন থেকে ছিটকে পড়ল বেশির ভাগ বগি। বেশ কিছু ভারতীয় কুলি আর আফ্রিকান আদিবাসী—অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে যারা চড়ে বসেছিল ট্রেনে, চড়া মূল্য দিতে হলো তাদের এর

জন্য। একেবারে জীবন দিয়ে। বিনা টিকেটে ভ্রমণের মাশুল! টিকেট চেকার এখানে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা।

যাদের ভাগ্য একটু 'ভাল', আটকা পড়ল ক্ষয়ক্ষতির মাঝে। সাভো থেকে সাহায্য না আসা পর্যন্ত ওভাবেই থাকতে হয়েছিল তাদের।

একে এই দুর্দশা, গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত আতঙ্ক আরও বাড়িয়ে তুলল নরখাদক সিংহ দুটো। গর্জন করতে-করতে কাছিয়ে আসছিল জানোয়ারগুলো। বেচারীরা আর কী করে! আতঙ্কের ঠেলায় পাগলই হবার দশা হলো কয়েকজনের। নড়তে-চড়তে পারছে না। মানুষখেকো দুটোর দয়ার উপরে পেণ্ডুলামের মত ঝুলছিল লোকগুলোর জীবন।

ভাগ্য ভাল, সিংহ দুটোর দিক থেকে সত্যিকারের কোনও আক্রমণ আসার আগেই পৌঁছে গেল উদ্ধার-দলটা। ডক্টর ব্রক নামে এক মেডিকেল অফিসার ছিলেন দলের সঙ্গে। সেরাতে আর দম ফেলবারই অবকাশ পাননি তিনি।

আহতদের মধ্যে এক সোয়াহিলি কুলির জখম আলাদা করে নাড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিল আমাকে। মারাত্মক ছিল ওর আঘাত। পাঁজরের কয়েকটা হাড় ভেঙে গিয়েছিল, ভেঙে অচল হয়ে গিয়েছিল একটা হাত, আর আক্ষরিক অর্থেই গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিল একটা উরুর মাঝামাঝি অংশ।

ভেবেছিলাম, আর কোনও আশা নেই লোকটার। কিন্তু ব্রক ওর দায়িত্ব নিয়ে নিলেন। ভাঙা জায়গাগুলো মেরামতের ব্যবস্থা হলো, তবে বাঁচানো গেল না পা-টা। ওটা বাদ দিতে হলো কেটে।

প্রায় ছয় হপ্তা পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল লোকটা। এরপর যত বারই দেখেছি ওকে, অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থেকেছি। পা হারিয়েও দমে যায়নি সদা হাস্যময় চলমান খাম্বাটি। ধন্যবাদ দিতে হয় ডাক্তারকে।

সাভোয় আমার ঘটনাবহুল দিনগুলোর স্মৃতিচারণে যতি পড়ল অকস্মাৎ। ট্রেন এসে থেমেছে স্টেশনে। পরিচিত, পুরানো জায়গায় ফেরার অনুভূতি হলো আরও একবার।

স্বীকার করতেই হবে যে, এক রাশ উদ্বেগ নিয়ে তাকাচ্ছিলাম দালানকোঠা আর জলাধারগুলোর অন্ধকার ছায়ায়; কখন না আবার ওত পেতে থাকা কোনও সিংহ আচমকা আমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আবছায়া থেকে। আট কি নয় বছর আগে যেমন দেখে গিয়েছিলাম, এখনও ঠিক সেরকমই আছে সাভো। উধাও হয়েছে কেবল নরখাদক শ্বাপদের সেই টান-টান শিহরণ। এর জন্য অবশ্য আমিই 'দায়ী'। স্টেশন-মাস্টার আর ওর কর্মচারীরা সেজন্য সবিশেষ কৃতজ্ঞ আমার কাছে।

হায়! পুরানো সেই রোমান্টিক ক্যারাভান রোডটা এখন আর ব্যবহার হয় না। জঙ্গল বাড়তে-বাড়তে খেয়ে নিয়েছে রাস্তাটা। আর এই পথটাই শুধু না, অরণ্যের কঠিন নিষ্পেষণে হারিয়ে গেছে সব কিছু। এর মধ্যে আমার তাল পাতার কুঁড়েটা কিংবা *বমার* (সীমানা-বেড়া) হদিস পাওয়া দুষ্কর হবে।

পান্না-সবুজ তাল গাছে ঘেরা বিশাল নদীটা আগের মতই আছে। শীতল আর প্রাণবন্ত।

এবং সুন্দর।

তরঙ্গের আবেগে বয়ে চলেছে অবিরত।

ব্রিজটাও দেখতে পাচ্ছি পরিষ্কার। অদ্ভুত মমতা নিয়ে তাকিয়ে রইলাম ওটার দিকে। কত কথা মনে পড়ছে! কত প্রচেষ্টা! অনাকাঙ্ক্ষিত কত বাধা-বিপত্তি! পাথরের পর পাথর গেঁথে পাণ্ডববর্জিত এ অঞ্চলে শেষ পর্যন্ত দাঁড় করিয়েই ছাড়লাম ব্রিজটাকে।

না বললে অন্যায় হবে। যে সিমেন্ট দিয়ে জোড়া দেয়া হয়েছে পাথরগুলো, অসংখ্য মানুষের রক্ত মিশে আছে তার সঙ্গে। সাভোর মানুষখেকোর অসহায় শিকার হয়েছিল লোকগুলো। আমরা তার সাক্ষী।

ব্রিজের যে অংশে গভীর ঢাল রয়েছে নদীর, হুড়মুড় করে নেমে আসছে তীব্র স্রোত। কিন্তু বাতাস প্রতিকূল বলে কিছুটা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে স্রোতের গতি। এ ছাড়া নদী শান্ত, সমাহিত। মৃদু স্বরে গুনগুন করতে-করতে চলেছে সাগরের দিকে।

আহ, সাভো! প্রিয় সাভো আমার! ■

অকুতোভয় বীর

রুবেল কান্তি নাথ

'শেয়াল-কুকুরের মত
পালিয়ে না মরে,
দেশের জন্য, মানুষের জন্য
বীরের মত মৃত্যুবরণ করেছে
আমার ছেলে।'

গনগনে মধ্য দুপুরের এক ক্ষণ। মাথার উপর থেকে সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়বার পাঁয়তারা করছে। নীরব-নির্জন হ্রদের বুক চিরে আসতে লাগল সাতটি স্পিড বোট। দুটো লঞ্চ।

এগুলোর মধ্যে ছিল পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর দুই কোম্পানি সৈন্য। তাদের সঙ্গে ছিল স্বয়ংক্রিয় ও ভারী অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র।

এরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় কমাণ্ডো ব্যাটালিয়নের কোম্পানি। তাদের লক্ষ্য, বুড়িঘাটের মুক্তিবাহিনীর নতুন প্রতিরক্ষা ঘাঁটি।

দিনটি ছিল ৮ এপ্রিল, ১৯৭১।

লক্ষ্যের দিকে তীব্র গতিতে ছুটে আসছে দুটি স্পিড বোট এবং দুটি লঞ্চ। তাতে রয়েছে ছয়টি তিন ইঞ্চি মর্টার আর বহু মেশিনগান ও রাইফেল।

এই জলপথ পাহারা দিচ্ছে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের যে কোম্পানিটি, মাত্র কয়েকদিন আগে তারা পাকিস্তান বাহিনী ত্যাগ করে এসেছে।

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরক্ষা ঘাঁটির কাছাকাছি পৌঁছেই পাকিস্তানী বাহিনী শুরু করল আক্রমণ। স্পিড বোট থেকে ক্রমাগত চালাতে লাগল মেশিনগানের গুলি, লঞ্চ দুটো থেকে তিন ইঞ্চি মর্টারের শেল।

ঝাঁকে-ঝাঁকে আসতে লাগল গুলি মুক্তিযোদ্ধাদের দিকে। প্রচণ্ড শব্দে আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠছিল। পানির ভিতর থেকে উথলে উঠতে শুরু করল অদ্ভুত আলোড়ন।

শব্দগুলো পাহাড়ের গায়ে-গায়ে বাড়ি খেয়ে এক মহাধ্বনি যজ্ঞের সূচনা করছিল। শীতল সবুজে হঠাৎ করে যেন লেগে গেল শব্দের আগুন।

পাকিস্তানী বাহিনীর একটাই উদ্দেশ্য ছিল, রাঙামাটি-মহালছড়ির জলপথ থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের উৎখাত করে নিজেদের অবস্থান প্রতিষ্ঠা।

আক্রমণের আশঙ্কা মুক্তিযোদ্ধাদের মনে আগেই ছিল। তাদের লোকবল, অস্ত্রশস্ত্র ছিল না বললেই চলে। কিন্তু মনের ভিতর দেশের জন্য জমানো ছিল অসীম সাহস, তেজ ও দৃপ্ত অঙ্গীকার।

দৃঢ় প্রত্যয় বুকে নিয়েই তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দেশকে বর্বরদের হাত থেকে মুক্ত করবার জন্য। মুক্তিযোদ্ধারা খুব দ্রুতই পজিশন

নিয়ে নিল পরিখায়।

শত্রুপক্ষের গোলাগুলির তীব্রতা এত বেশি ছিল যে, ভেঙে যেতে লাগল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিক অবস্থান চিহ্নিত করে ফেলল শত্রুদের মর্টার। আর তাই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তীব্র গুলি বর্ষণে ভেঙে পড়ল।

ল্যান্স নায়েক রউফ দেখতে পেলেন, এভাবে কিছুক্ষণ থাকলে তাঁরা সবাই মারা পড়বেন। ইতোমধ্যে যোদ্ধারা যে যেভাবে পারল, পিছু হটতে শুরু করেছে। শত্রুরা এগিয়ে আসছিল আরও সামনে।

পিছু হটতে রাজি ছিলেন না শুধু একজন।

তিনি ল্যান্স নায়েক মুন্সী আবদুর রউফ। স্বয়ং তিনি নিজ পরিখায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন।

অসম্ভব সাহসে, দৃঢ়চিত্তে মেশিনগানটি উঁচুতে তুলে ফেললেন। অনবরত গুলি করতে লাগলেন পাকিস্তানী বোটগুলোকে লক্ষ্য করে।

প্রচণ্ড দুঃসাহসের সঙ্গেই তিনি কাজে লাগালেন পাকিস্তান রাইফেলসে কাজ করবার অভিজ্ঞতা। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে তিনি যোগই দিয়েছিলেন দেশটাকে হানাদারমুক্ত করবার লক্ষ্যে।

পাকিস্তানী হানাদারদের তিনি পথ ছেড়ে দিতে রাজি ছিলেন না। শত্রু সৈন্যদের বিরুদ্ধে একাই লড়তে শুরু করেছিলেন এই অকুতোভয় বীর।

একেকটা স্পিড বোটকে লক্ষ্য করে মেশিনগান দিয়ে অবিরাম গুলি করতে লাগলেন ল্যান্স নায়েক মুন্সী আবদুর রউফ। তাঁর প্রচণ্ড গুলিবৃষ্টিতে থমকে গেল শত্রুরা।

তারা প্রত্যাশাও করেনি এমন পাল্টা আক্রমণ আসতে পারে! রউফের গুলি খেয়ে একের পর এক শত্রু সেনা লুটিয়ে পড়তে লাগল।

একটি-একটি করে সাতটি বোটই ডুবে গেল। এমন পর্যায়ে শত্রু সেনারা তাদের লঞ্চ দুটি নিয়ে পিছু হটতে বাধ্য হলো।

পিছু হটতে-হটতে দুটো লঞ্চই চলে গিয়েছিল রউফের মেশিনগানের গুলির আওতার বাইরে। নিরাপদ দূরত্বে।

হানাদার বাহিনী তাদের লঞ্চ থেকে এবার শুরু করল মর্টারের গোলা বর্ষণ। তারা লক্ষ্য স্থির করল, যেভাবেই হোক–'মুক্তি'-র মেশিনগানটাকে থামিয়ে দিতে হবে।

ক্রমাগত একের পর এক মর্টারের গোলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা রউফের একার পক্ষে সম্ভব ছিল না। শত্রুর একটি মর্টারের গোলা আচমকা এসে পড়ল তাঁর বাংকারে।

মৃত্যুশেলে ঝাঁঝরা হয়ে গেল তাঁর সমস্ত শরীর। থেমে গেলেন তিনি। হাত থেকে পাশে ছিটকে পড়ল মেশিনগান। ততক্ষণে তাঁর সহযোদ্ধারা সবাই পৌঁছে যেতে পেরেছিলেন নিরাপদ দূরত্বে।

প্রকৃত বন্ধুর মত একটিমাত্র মেশিনগান সম্বল করে একই সঙ্গে শত্রুদের ঘায়েল করলেন, এবং সহযোগী যোদ্ধাদের রক্ষা করলেন রউফ।

তিনি বাংলার রক্তলাল সূর্যের সঙ্গে মিশে গেলেন। মায়ের বুক খালি হলো। বোনের জন্য বিয়ের শাড়ি নেয়া হলো না।

অথচ নিজের বুকের আলো দিয়ে উজ্জ্বল করলেন তিনি স্বাধীনতার পথ। হয়ে গেলেন অমর বীর। শহীদ। বীরশ্রেষ্ঠ।

বীরশ্রেষ্ঠর মা মুকিদুন্নেছা ছেলেকে হারিয়েও গর্ব করেন, 'শেয়াল-কুকুরের মত পালিয়ে না মরে, দেশের জন্য, মানুষের জন্য বীরের মত মৃত্যুবরণ করেছে আমার ছেলে।

'ছেলে হারানোতে তাই আমার কোনও কষ্ট নেই।'

আমরাও জানি, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ চির অমর। চির অম্লান। বাঙালীর, বাংলার সূর্যের সঙ্গে তাঁর আত্মার সম্পর্ক।

১৯৭১ সালের ৮ এপ্রিল রাঙামাটির মহালছড়ির চিংড়ি খাল এলাকায় যুদ্ধ করতে-করতে শহীদ হন ল্যান্স নায়েক মুন্সী আবদুর রউফ।

এই অসামান্য বীরত্বের জন্য তাঁকে 'বীরশ্রেষ্ঠ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। ■

মা

সূর্যদেব

বাচ্চাটি বলল, 'আমার নতুন মা সত্যবাদী। আর পুরানো মা ছিলেন মিথ্যাবাদী।'

আট বছরের এক বাচ্চার মা মারা গিয়েছিল। একদিন বাচ্চাটার বাবা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'বাবা, বলো তো, তোমার নতুন মা এবং পুরানো মায়ের মাঝে পার্থক্য কী?'

বাচ্চাটি বলল, 'আমার নতুন মা সত্যবাদী। আর পুরানো মা ছিলেন মিথ্যাবাদী।'

বাবা তার ছেলের কথা শুনে চমকে গেল। এবং বলল, 'কেন, সোনা, যে মা তোমাকে জন্ম দিল সে মিথ্যাবাদী, আর যে কয়েকদিন হলো এসেছে সে সত্যবাদী হয়ে গেল?'

বাচ্চা বলল, 'আমি যখন সারাদিন খুব দুষ্টুমি করতাম, তখন আমার মা আমাকে বলত, "তুই যদি এমন দুষ্টুমি করিস, তা হলে তোর খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেব।"

'তারপর সারাদিন যখন আমাকে খুঁজে পেত না, তখন সারা গ্রাম খুঁজে আমাকে ধরে এনে নিজ হাতে খাইয়ে দিত।

'আর আমার নতুন মা বলে, "তুই এমন দুষ্টুমি, করলে, খাওয়া-দাওয়া বন্ধ।"

'সত্যি-সত্যি আজ দু'দিন যাবৎ আমাকে কোন খাবার দেয়া হয়নি!' ■

(অনলাইন রচনা অবলম্বনে)

ড্রেস্‌লার সিনড্রোম

সাধারণত হার্ট অ্যাটাকের কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস পর ড্রেস্‌লার সিনড্রোম দেখা যায়।

ডা. মোঃ ফজলুল কবির পাভেল

ড্রেস্‌লার সিনড্রোমে বুকে ব্যথা হয়। হার্টের চারদিকে আরেকটি পর্দা থাকে। এর নাম পেরিকার্ডিয়াম। পেরিকার্ডিয়ামে প্রদাহ হয় বলেই ড্রেস্‌লার সিনড্রোমে বুকে ব্যথা হয়। সাধারণত হার্ট অ্যাটাক, সার্জারি এবং বুকে আঘাতের পর এই সিনড্রোম দেখা যায়। বর্তমানে উন্নতমানের চিকিৎসার ফলে এর প্রকোপ অনেক কমে গেছে। কারও একবার এ সিনড্রোম হলে আবার হবার সম্ভাবনা থাকে।

সাধারণত হার্ট অ্যাটাকের কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস পর ড্রেস্‌লার সিনড্রোম দেখা যায়। ড্রেস্‌লার সিনড্রোমে যেসব উপসর্গ দেখা যায়:

১। বুকে ব্যথা

২। জ্বর

৩। ফুসফুসের চারদিকের আবরণী পুরাতে প্রদাহ হয়। তখন শ্বাস নিলে ব্যথা করে।

ড্রেস্‌লার সিনড্রোমের সাথে অটো-ইমিউনিটির সম্পর্ক আছে। হার্ট অ্যাটাক, ট্রমা বা সার্জারির পরে হার্টের টিস্যুর ইনজুরি হয়। তখন টিস্যুর নেক্রোসিস বা পচন হয়। এই টিস্যু তখন অ্যান্টিজেন হিসেবে কাজ করে যার বিপরীতে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়। এরপর এই অ্যান্টিবডি নেক্রোটিক টিস্যুর পাশাপাশি স্বাভাবিক টিস্যুকেও আক্রমণ করে। ফলে দেখা দেয় ড্রেস্‌লার সিনড্রোম।

ড্রেস্‌লার সিনড্রোম ডায়াগনসিসের জন্য ভালভাবে রোগীর ইতিহাস নিতে হবে। আগে হার্ট অ্যাটাক, সার্জারি এবং আঘাতের ইতিহাস আছে কিনা তা ভালভাবে শুনতে হবে। স্টেথোস্কোপ দিয়ে বুক পরীক্ষা করলে সিনড্রোম সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। ইসিজি, ইকোকার্ডিওগ্রাম এবং এক্সরে করলে নিশ্চিতভাবে রোগটি ধরা পড়ে। রক্ত পরীক্ষা করলে শ্বেতরক্তকণিকার আধিক্য পাওয়া যায়।

ড্রেস্‌লার সিনড্রোমের চিকিৎসায় যেসব ওষুধ ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে আছে–

১। অ্যাসপিরিন

২। আইবুপ্রোফেন

৩। ন্যাপ্রোক্সেন

এসব ওষুধে যদি কাজ না হয় তবে কলচিসিন ব্যবহার করা হয়।

ড্রেস্‌লার সিনড্রোম থেকে সাধারণত জটিলতা হয় না। তবে কিছু সময় হার্টের চারদিকে পানি জমা হয়। তখন এই পানি বের করা হয়। বিরল ক্ষেত্রে পেরিকার্ডিয়াম কেটে ফেলা হয়। ড্রেস্‌লার সিনড্রোম আজকাল তেমন দেখতে পাওয়া যায় না। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে-সাথে এর প্রকোপ একেবারেই কমে গেছে। ■

মায়া

রিয়াজুল আলম শাওন

অশরীরীর মত হেসে উঠল প্রিয়া।

এক

রাত ১১টা। তুমুল গতিতে গাড়ি এগিয়ে চলেছে ময়মনসিংহের দিকে। ড্রাইভিং সিটে রাহাত। পাশে বসে আছে রাহাতের স্ত্রী প্রিয়া। নতুন বিয়ে হয়েছে ওদের। প্রেমের বিয়ে। তাই আবেগটাও একটু বেশি। প্রিয়া রাহাতের শরীরে গা এলিয়ে আছে। রাহাতের গাড়ি চালাতে একটু সমস্যা হচ্ছে। তবু সে প্রিয়াকে কিছু বলছে না। ভালবাসার মানুষের স্পর্শ বড্ড ভাল লাগছে তার। হঠাৎ প্রিয়ার ইচ্ছা হলো রাহাতকে চুমু খাওয়ার। ঠোঁটটা এগিয়ে দিল সে। রাহাতও এক মুহূর্ত দেরি করল না। চুমুটা স্থায়ী হলো ৪০ সেকেণ্ড। এমন সময় ঘটল দুর্ঘটনাটা।

হাইওয়েতে হুট করেই একটা মেয়েকে দেখতে পেল রাহাত। একদম রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে। রাহাতের সম্পূর্ণ মনোযোগ ছিল প্রিয়ার দিকে। তাই গাড়ির গতি কমাতে পারল না। সজোরে ধাক্কা দিল মেয়েটিকে। মেয়েটা কিছুক্ষণ শূন্যে ভেসে রইল। তারপর নিচে পড়ল। খানিকক্ষণ গাড়ি চালিয়ে কড়া ব্রেক করল রাহাত। প্রিয়া তাল রাখতে না পেরে উল্টে পড়ল অন্যদিকে।

প্রথম কথাটা বলল রাহাতই। তার মাথা কাজ করছে না। কাঁপা গলায় বলল, 'প্রিয়া, প্রিয়া। ঠিক আছ?'

প্রিয়া বাম হাতে খুব ব্যথা পেয়েছে। অস্ফুট স্বরে বলল, 'আমি ঠিক আছি, রাহাত।' পরক্ষণেই প্রচণ্ড চমকে উঠে প্রিয়া বলল, 'এটা তুমি কী করেছ, রাহাত? মেয়েটা...মেয়েটা...'

রাহাত মাথা নিচু করে বলল, 'আমার কোন দোষ নেই। হুট করেই মেয়েটা সামনে এসেছে।'

'এখন কী হবে?'

'এটা একদম জনমানবহীন এলাকা। কেউ কিছু জানে না। আমাদের পালাতে হবে।'

'একটা আহত মেয়েকে রেখে আমরা পালিয়ে যাব?'

'আহত হয়েছে নাকি মারা গেছে কীভাবে নিশ্চিত হলে?'

'তবু আমাদের চেষ্টা করতে হবে, রাহাত। মেয়েটাকে হাসপাতালে নিতে হবে।'

'তুমি কি জানো মেয়েটাকে হাসপাতালে নিলে আমরা কত ঝামেলায় পড়ব! পুলিসি ঝামেলা হবে। চিকিৎসার খরচ দিতে হবে। আর মারা গেলে তো কথাই নেই। জেল হয়ে যাবে আমার।'

প্রিয়া কোনভাবেই রাহাতের কথায় রাজি হলো না। এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতেও রীতিমত রাহাতের সঙ্গে ঝগড়া বেধে গেল তার। রাহাত চিৎকার করে বলল, 'এই তোমার আমার প্রতি ভালবাসা!! আমাকে পুলিস ধরে নিয়ে যাক, তুমি তাই চাও?'

'না, কখনওই না। তবে মানুষ হিসাবে আমাদের দায়িত্ব আছে। একটা মানুষকে চাপা দিয়ে আমরা এভাবে পালাতে পারি না।' জোর গলায় বলল প্রিয়া।

রাহাত বলল, 'তোমার দায়িত্ব আমরা যেন ভাল থাকি এটা নিশ্চিত করা। চলো, মেয়েটাকে একটা বস্তায় ভরে পাশের খাদে ফেলে দিই।'

'ছিহ! তোমার মনটা এত ছোট। তোমার কিছু করতে হবে না। যা করার আমিই করব। আমি মেয়েটাকে হাসপাতালে নিয়ে যাব।' বলতে-বলতে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল প্রিয়া।

রাহাত বলল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'মেয়েটাকে খুঁজতে।'

দুর্ঘটনার পর প্রায় মিনিট খানেক গাড়ি চালিয়েছে রাহাত। তাই ঘটনাস্থল বেশ খানিকটা পিছনে পড়ে গেছে। গাড়ি থেকে নেমে প্রিয়া পিছন দিকে হাঁটতে লাগল। মাঝে-মাঝে দু'একটা গাড়ি হাইওয়ে ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। আশপাশে কোন জনবসতি চোখে পড়ছে না।

রাহাত গাড়ি স্টার্ট দেয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না। রাহাতের চিন্তা আগে গাড়ি স্টার্ট দেবে, তারপর প্রিয়াকে বুঝিয়ে শুনিয়ে গাড়িতে তুলবে। রাহাত দাঁতে দাঁত চেপে গাড়ি স্টার্ট দেয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। হেডলাইটের আলোতে রাহাত দেখল গাড়ির সামনের কাঁচটা রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে।

মিনিট দশেক লাগল গাড়ি স্টার্ট নিতে। রাহাত গাড়ি থেকে নামল। প্রিয়াকে এখন বুঝিয়ে নিয়ে আসতে হবে। রাহাত গাড়ি থেকে নেমে বেশ খানিকটা হাঁটার পরেও প্রিয়াকে দেখতে পেল না। কেন জানি রাহাতের বুকটা কেঁপে উঠল। রাহাত চিৎকার করে ডাকল, 'প্রিয়া।'

চারদিকের অন্ধকারটা বেশ বেড়েছে। রাহাত প্রিয়াকে পাগলের মত খুঁজছে। একসময় দূরে একটা টিলার পাশে মানুষের মত একটা অবয়ব দেখতে পেল রাহাত। ছুটে গেল সেদিকে। প্রিয়া দাঁড়িয়ে আছে।

রাহাত বলল, 'প্রিয়া, এখানে একা-একা দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

প্রিয়া রাহাতকে জড়িয়ে ধরল। কাঁদতে লাগল।

'কী হলো, কাঁদছ কেন?' রাহাত বলল।

'মেয়েটা মারা গেছে, রাহাত। আমি পাল্‌স্ চেক করে দেখেছি। পাল্‌স্ পাইনি।' কাঁদতে-কাঁদতেই বলল প্রিয়া।

রাহাত বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল প্রিয়ার দিকে। বলল, 'আমাদের এখান থেকে পালাতে হবে, প্রিয়া।'

প্রিয়া কান্না থামিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, পালাতে হবে। তোমার কথাই ঠিক। লাশটাও খাদে ফেলে দিতে হবে। নতুবা আমরা বিপদে পড়ব।' রাহাত একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। এতক্ষণে প্রিয়া ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে।

রাহাত বলল, 'গাড়ির পিছনে বস্তা আছে। দড়িও আছে। চলো, বস্তায় ভরে লাশটা সামনের

খাদে ফেলে দিই। তা হলে সহজে কেউ লাশটা খুঁজে পাবে না। আর এমনিতেও এদিকে লোকজন বেশি আসে বলে মনে হয় না।'

প্রিয়া বলল, 'আমি নামার সময় বস্তা নিয়েই নেমেছিলাম। মেয়েটার লাশটা বস্তার মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলেছি। দড়ি দিয়ে বেঁধেও ফেলেছি বস্তার মুখ।'

'তুমি এতসব কখন করলে?' অবাক হয়ে জানতে চাইল রাহাত।

'তোমার জন্য আমি সব করতে পারি, রাহাত।' প্রিয়া নরম গলায় বলল।

প্রিয়ার মুখটা দেখতে পাচ্ছে না রাহাত। তার ইচ্ছা করছে প্রিয়ার গালে হাত বুলিয়ে দিতে। প্রিয়া একটু দূরে ইঙ্গিত করে বলল, 'ওই যে বস্তাটা। চলো ফেলে দিই।'

রাহাত দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল। নষ্ট করার মত সময় নেই। রাস্তার মধ্যে লাশটা পড়ে থাকার চেয়ে, খাদের মধ্যে পড়ে থাকা ভাল।

ওরা দু'জনে মিলে বস্তাটা টানাটানি করে খাদের দিকে এগিয়ে নিল। পুরো বস্তাটা থেকে টপটপ করে রক্ত পড়ছে। রাহাতের একবার মনে হলো বস্তার মধ্যে নড়ে উঠছে মেয়েটার দেহ। রাহাত ভিতরে-ভিতরে একটু চমকে উঠলেও প্রিয়াকে বুঝতে দিল না। কিছু সময় পরে খাদের মধ্যে ফেলে দিল লাশটা। ঠিক ওই সময়ে তীব্র ঘ্রাণ পেল রাহাত। প্রিয়ার প্রিয় বডি স্প্রের ঘ্রাণ।

দুই

আবার তীব্রগতিতে গাড়ি এগিয়ে চলেছে। গাড়ির কাঁচ পরিষ্কার করেছে রাহাত। প্রিয়া পিছনের সিটে গা এলিয়ে শুয়ে আছে। সে খুব ক্লান্ত এবং বিধ্বস্ত বোঝা যাচ্ছে। রাহাত বারবার ঘামছে। তার বারবার মনে হচ্ছে সে একটা খুন করেছে।

উঠে বসল প্রিয়া। রাহাতের উদ্দেশে বলল, 'গাড়ি থামাও।'

রাহাত বলল, 'মানে?'

'আর সামনে গিয়ে কী হবে?' প্রিয়ার কণ্ঠে কিছু একটা ছিল যা শুনে সচকিত হলো রাহাত।

রাহাত বলল, 'প্রিয়া, তোমার কী হয়েছে?'

অশরীরীর মত হেসে উঠল প্রিয়া। বলল, 'গাড়ির সবগুলো বাতি জ্বেলে আমাকে দেখো।'

বাতি জ্বালল রাহাত। কেন জানি পিছনে তাকানোর সাহস হচ্ছে না। একবার পিছনে ফিরে দেখল বিশ্রী একটা মুখ। এ প্রিয়া নয়, অন্য কেউ।

রাহাত কাঁপতে-কাঁপতে বলল, 'কে তুমি?'

প্রিয়া বলল, 'আমি সেই মেয়ে, যাকে তুই চাপা দিয়েছিস!'

'কী বলছ!! না, এ হতে পারে না। আমি নিজে তোমাকে খাদের মধ্যে ফেলে দিয়েছি।'

'হা-হা।' মেয়েটার ভয়ঙ্কর হাসি বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। দাঁতে দাঁত ঘষে মেয়েটা বলল, 'বস্তার মধ্যে তোর প্রিয়া ছিল। আমি না। তুই নিজ হাতে প্রিয়াকে খাদের মধ্যে ফেলে দিয়েছিস। আমি মড়ার মত রাস্তায় শুয়ে ছিলাম। প্রিয়া কাছে আসতেই ঝাঁপিয়ে পড়েছি ওর ওপর। খুবলে-খুবলে রক্তাক্ত করেছি ওর দেহ। তবু মরেনি হারামজাদী। তবে খাদে পড়ে যাওয়ার পর এতক্ষণে নিশ্চয়ই মরেছে।'

রাহাতের চোখগুলো বড়-বড় হয়ে গেল। মেয়েটা হাসিমুখে বলল, 'এই রাস্তায় আমাকে অনেকেই দেখতে পায়। যারা আমাকে দেখার জন্য গাড়ি থেকে নামে, তাদের সবাইকে মরতে হয়।'

রাহাত চোখ বন্ধ করল।

তিন

নব বিবাহিত রাসেল আর ইমা ময়মনসিংহের দিকে যাত্রা করেছে। ড্রাইভার তীব্রগতিতে গাড়ি চালাচ্ছে। হঠাৎ গাড়িটি একটা মেয়েকে সজোরে ধাক্কা দিল। লাফিয়ে উঠল রাসেল। রাগত গলায় ড্রাইভারের উদ্দেশে বলল, 'এ কী করলেন আপনি? গাড়ি থামান। মেয়েটাকে হাসপাতালে নিতে হবে।' ভয়ের ছাপ পড়ল ইমার মুখেও।

ড্রাইভার গম্ভীর মুখে বলল, 'এই রোডে বারো বছর ধরে গাড়ি চালাই। আমি সব জানি। এখন এখানে গাড়ি থামালেই মরতে হবে। যা দেখেছেন কিছুই সত্যি না, সব মায়া।'

রাসেল আর ইমা অবাক হয়ে ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে রইল। ■

কথা রাখা না রাখার কথা

বিশু চৌধুরী

কথা রাখার মধ্যে কী এমন অর্জনের রয়েছে যার প্রতি সচেতন হওয়ার কথা এমনকী ধর্মগ্রন্থগুলোতেও খুব বলা হয়?

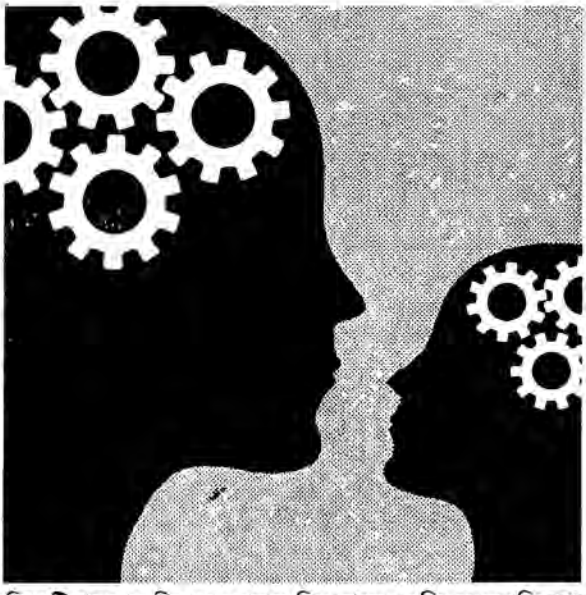

কথা দিয়ে কথা না রাখার বিষয়টি খুব স্বাভাবিক মনে করেন কিছু মানুষ। সত্যি বলতে কি কথা রাখার প্রয়োজনই বা কী বুঝে উঠতে পারেন না অনেকেই। কোন-কোন এলাকার মানুষ ছেলে-বুড়ো নির্বিশেষে অতি ভাবাবেগের বশবর্তী হয়ে হর-হামেশাই যে-কোন কথার পিঠে কথা দিয়ে ফেলেন। অগ্রপশ্চাৎ ভাবেন না। কথা রাখার কথা হয়ে যায় কথার কথা। কথা দিয়ে কথা না রাখা কখনও-কখনও হয়ে ওঠে প্রতারণার কৌশল মাত্র। বাবার কাছে শুনেছিলাম তাঁর এক ঘনিষ্ঠজন ব্রিটিশ আমলে ১০ টাকা ধার নিয়ে দীর্ঘদিন চুপচাপ থাকলেন। আর ধরা দেন না। যদিও ধার নেয়ার সময় বলেছিলেন, তিন দিনের মধ্যে ফেরত দিয়ে দেবেন। একদিন যখন ঠিকই বাবার মুখোমুখি হলেন, অবলীলায় দেনাদার ভদ্রলোক বললেন, 'ফেরত দিতেই যদি পারি তবে ধার নিলাম কেন?' কথাগুলোর মধ্যে যুক্তি এবং চাতুরী যতই থাকুক কথা দেয়া আর কথা রাখার মধ্যে ফারাক রাখা কখনওই সুস্থ মানসিকতার প্রকাশ নয়। এই যে কথার কথা বলা বা কথা রাখার আশ্বাস দেয়ার মিথ্যাচার করা, এসবের প্রভাব মনের অজান্তেই ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে। এটি জন্ম দিতে পারে অপরাধ বোধের চেতনা কিংবা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার বোধের। খুলে বলা যাক। ধরা যাক, আপনার সঙ্গে কারও সাক্ষাৎকার ঠিক করলেন সন্ধ্যা সাতটায়, আর আপনি হাজির হলেন আটটায়। রাস্তার

যানজট, বাড়ির ঝামেলা এসব কারণ আপনার থাকতে পারে, কিন্তু সত্যি হলো আপনি একজনকে বসিয়ে রেখেছিলেন আপনার দায়িত্বহীনতার কারণে। আর এভাবে বারকয়েক ফেইল করলে আপনি হয়ে যাবেন হাসির পাত্র।

কথা রাখার সঙ্গে জীবনের ছন্দ খুঁজে পাওয়া না পাওয়ার বিষয়টি বেশ ভালভাবে জড়িয়ে থাকে। এর সঙ্গে সময়ানুবর্তিতার একটা যোগসূত্র রয়েছে। ট্রেনের টিকেট দেখুন, বাসের টিকেট দেখুন, যেমন ১০টা ৩৭ মিনিট, ৫টা ১৭ মিনিটে ছাড়বে। ঘণ্টা, মিনিট...সুনির্দিষ্ট। একবার অটোয়া থেকে মন্ট্রিয়ল যাচ্ছিলাম। বাস ছাড়তেই ড্রাইভার জানালেন ২ ঘণ্টা ২০ মিনিট লাগবে পৌঁছতে। আমার ইচ্ছে হলো এসব বড়-বড় দেশে সময় নিয়ে যে লম্বা-লম্বা কথা বলা হয় তা ঠিক কিনা দেখার। অপেক্ষায় আছি আমি, বাস চলছে, ঘড়ি দেখছি। বিশ্বাস করুন, ওটি যখন মন্ট্রিয়ল বাস স্ট্যাণ্ডে পৌঁছল তখন ঘড়ির ছোট কাঁটাটি ছিল ঠিক বিশ মিনিটের ওপর।

সিডনি থেকে প্লেন মিস করে আইনি জটিলতায় পড়েছিলেন একজন কলিগ। প্লেন ছাড়বে এক ঘণ্টা পরে। ট্রানজিটে আসেন তিনি। দোকানপাট দেখছেন। মনোহর সমারোহ। হাতে যথেষ্ট সময় আছে মনে করছেন তিনি। এদিকে আধঘণ্টা আগে বন্ধ হয়ে গেছে বোর্ডিং স্টেয়ার। তিনি যখন বোর্ডিং ব্রিজের গেটে পৌঁছলেন, ততক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে প্লেনের দরজা। যাবার কথা ছিল সিডনি থেকে মস্কো। বিদেশ বিভূঁইয়ে এই বিড়ম্বনা সামলাতে অনেক ঝক্কি-ঝামেলা পোহাতে হয়েছিল তাঁর।

এসব গল্পের পেছনে যা লুকিয়ে থাকে তা হলো ক্ষণ সচেতনতা। চলে যাওয়া মুহূর্ত আর ফিরে আসে না। কথা যখন রাখার, তখন-তখনই রাখা না হলে তা গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। যিনি যাঁকে কথা দিয়েছেন বা মেনে নিয়েছেন কথা রাখবেন বলে, তাঁরা পরস্পরের প্রতি না হলেও, নিশ্চিতভাবে, যিনি কথা রাখেন না তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেন। কথা রাখা তাই শুধু কথা রাখাই নয়, এটি হয়ে ওঠে মহানুভবতার মূর্ত প্রকাশ। সহজ ভাষায় আপনি আপনার কথা রেখেছেন। এর অর্থ হলো আমরা পরস্পরকে শ্রদ্ধা করি। কথা রাখার এক মহান গল্প শুনলাম এই সেদিন বিবিসি-তে। কাহিনিটি অনেকটা এ রকম–হাসপাতালে কাজ করেন একজন নার্স, চার সন্তানের মা। নাম ধরা যাক এলিসা। হাসপাতালে একজন রোগী এসেছে, তরুণী সিঙ্গেল মাদার–তার নামও এলিসা। অল্প বয়েসী রোগী এলিসার সঙ্গে পরিচয় হলো নার্স এলিসার। দু'জনেরই এক নাম হওয়ায় এক ধরনের অচেনা যোগাযোগ হলো দু'জনের মধ্যে। রোগী এলিসার মনে হলো একটা আশ্রয়স্থল যেন পাওয়া গেল। রোগী জানাল তার বায়োপসি করা হয়েছে; রিপোর্ট পাওয়া যাবে যে-কোন সময়। দু'দিন পরে সে জানল যে তার ক্যান্সার হয়েছে। মেয়েটি কাঁদছে আর বলছে তার আট বছরের ছোট ছেলে মারফির কী হবে। নার্স এলিসা নিজের পেশাগত দূরত্বের কারণে কোন বাড়তি আশ্বাসও দিতে পারছেন না। মেয়েটি হঠাৎ তাঁকে এক অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসল, 'আমি মরে গেলে আমার ছেলেটিকে তুমি দেখে রাখবে? ওকে আমি তোমার কাছে রেখে যেতে চাই।' নার্স এলিসার কাছে এ এক অভাবিত প্রস্তাব। পেশাদারী জীবনে বহু রোগীকে তিনি দেখেছেন বিপন্ন হতে, কাতর হতে, নিরুপায় হতে, কিন্তু কখনও কারও ব্যক্তিগত বিষয়ে জড়াননি। এ প্রস্তাবে আবেগ আপ্লুত হয়ে তিনি কোন জবাবই দিলেন না। বাড়িতে ফিরে এলেন। স্বামী রবার্টকে এই অদ্ভুত ঘটনাটি জানালেন। তাঁর স্বামী গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, চুপ করে থাকলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, 'ঈশ্বর তোমাকে করুণা করছে, তারই একটি সন্তানকে তোমার আশ্রয়ে দিতে চাইছে। তুমি তা বুঝতে পারছ না।' এলিসা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন শিশুটিকে তিনি নিজের কাছে রাখবেন।

ডিউটি না থাকায় রোগীর ওয়ার্ডে দু'দিন যাননি এলিসা। যেদিন গেলেন সেদিন শুনলেন ডাক্তাররা জবাব দিয়ে দিয়েছেন। তাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। ভীষণ অনুশোচনায় ভুগতে লাগলেন এলিসা। ঠিকানা রাখেননি। নিয়ম

অনুযায়ী রোগীর নথিপত্র খোঁজা বেআইনি। কী করবেন? মনে পড়ল মেয়েটি বলেছিল তার পোষা কুকুরটিকে এই হাসপাতালেরই একজন ওয়ার্ড বয়কে দিয়ে দিয়েছে। লোকটির খোঁজ করলেন এলিসা। খুঁজে পেতে ঠিকানা জোগাড় হলো। গেলেন রোগীর বাড়ি। ছোট-খাট এক রুমের ঘর, আলো-বাতাস নেই, অন্ধকার, অপরিচ্ছন্ন। মেঝেতে পাতা একটি বিছানায় জড়সড় হয়ে রোগী শুয়ে আছে। ঘরে ছোটাছুটি করছে ফুটফুটে একটা ছেলে, যার নাম মারফি। এলিসাকে দেখে যেন আকাশের চাঁদ পেল মেয়েটি। এলিসা জানালেন মারফিকে তিনি ওঁর বাড়িতে নিয়ে যাবেন। মারফি ওঁর কাছে আশ্রয় পাবে শুনে মায়ের দু'চোখ ভরে উঠল জলে। এদিকে সেদিনই অবস্থার অবনতি হলো রোগীর। ওকে আবার হাসপাতালে নিতে হবে। মারফিকে এলিসা তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। রোগী গেল হাসপাতালে। মাকে ছাড়া মারফি মানিয়ে উঠতে পারছে না নতুন জায়গায়। কোন মায়াই তার মায়ের অভাব দূর করতে পারছে না। ধৈর্য হারাচ্ছেন না এলিসা। দিন কয়েক পর শোনা গেল রোগী এলিসার অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে। ওর কাছে গেলেন এলিসা। রোগীর চোখে কৃতজ্ঞতার চিহ্ন। ক্লান্ত হাত বাড়িয়ে এলিসাকে বলল ওর পাশে শুতে। নিয়ম ভেঙে মাথার কাছে বসে আড় হয়ে ওর মাথা জড়িয়ে ধরলেন এলিসা। মৃত্যুপথযাত্রী এলিসা বলল, 'আমি কৃতজ্ঞ তোমার কাছে, স্রষ্টার কাছে, আমার ছেলে নিরাপদ আশ্রয়ে তাঁর করুণায় বড় হবে। আমি শান্তিতে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছি।'

এলিসা চলে গেল। মারফি এখন বড় হচ্ছে নার্স এলিসার ঘরেই ওঁর আর চার সন্তানের সঙ্গে একই আদরে। এ হলো কথার আড়ালে কথা রাখার গল্প। সত্য গল্প।

কথা রাখার মধ্যে কী এমন অর্জনের রয়েছে যার প্রতি সচেতন হওয়ার কথা এমনকী ধর্মগ্রন্থগুলোতেও খুব বলা হয়? কথা রাখার শুভ প্রতিক্রিয়া হলো একটি সুস্থতা বোধের জন্ম দেয়া। হতে পারে এটি খুব ছোট অর্জন, হতে পারে এটি বৃহৎ প্রাপ্তি। কথা রাখার ফলে যে সন্তোষের সৃষ্টি হয় তা মানুষের আরও কাজ করার ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেয়। কর্ম সম্পাদনের সন্তুষ্টি নিজেকে খুব সাধারণের কাতার থেকে উঁচুতে উঠিয়ে দেয়।

কথা রাখার বিষয়টি প্রতিজ্ঞা বা শপথের সঙ্গে তীব্রভাবে যুক্ত থাকে। মায়ের কাছে, বোনের কাছে, বাবার কাছে দেশকে প্রাণ দিয়ে হলেও স্বাধীন করার প্রতিজ্ঞা করে অকাতরে প্রাণ দিয়েছেন এদেশের বহু মুক্তিযোদ্ধা। কথা রেখেছেন তাঁরা। কথা রাখার সঙ্গে ত্যাগের বিষয়টি অবধারিতভাবে সম্পৃক্ত ছিল।

প্রশ্ন হলো কেন কথা সব সময় বা কখনও-কখনও রাখা যায় না? বিশ্লেষকরা মনে করেন ঢিলেমী, যাকে ইংরেজীতে প্রোক্রাস্টিনেশান বলে, এর প্রায় প্রতিশব্দ হিসেবে নেয়া যেতে পারে। কথা রাখার গুরুত্ব আদৌ বোঝার মত মেধা না থাকা, কিংবা এতে যে কোনভাবে সম্মান-অসম্মানের বিষয় জড়িয়ে থাকে তা অনুবাধন করতে না পারা বড় ধরনের অজ্ঞতা।

প্রাচীন শাস্ত্রগুলোতে নীতিবাক্যে এই বিষয়গুলোকে মানুষের মানবিকতা বোধের একটি পূর্বশর্ত হিসেবে চিহ্নিত করা আছে। লক্ষ্য অর্জনের জন্য, আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য, নিজেকে উন্নত করার জন্য কথা রাখা একটি অপরিবর্তনীয় পূর্বশর্ত।

কীভাবে এই দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠা যায়? উত্তর হলো, প্রথমত, যা করা যাবে না সে সম্পর্কে কোন কথাই না দেয়া; দ্বিতীয়ত, কথা দিলে তা ডু অর ডাই চেতনায় সম্পন্ন করা; তৃতীয়ত, নিজেকে নিজে শ্রদ্ধা করা এবং অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া; চতুর্থত, কথা দেয়া বা রাখা উভয় ক্ষেত্রেই নিজের প্রতি সত্যবাদী হওয়া।

কথা না রাখার চাইতে কথা রাখার দৃঢ়তা হয়ে উঠুক সবার জন্য আত্ম-উপলব্ধির পরম শক্তি। শুভ কামনা সবার জন্য। ■

প্রজাপতি

মূল ▮ হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যাণ্ডারসেন
রূপান্তর ▮ খসরু চৌধুরী

'বিয়ের প্রশ্নে– না; এই বয়েসে সবার কাছে আমাদের আর হাসির খোরাক করে তুলো না।'

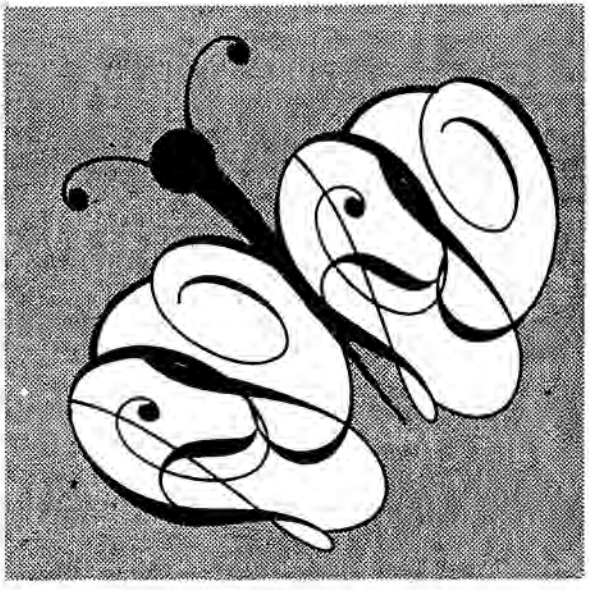

একবার একটা প্রজাপতি বিয়ে করতে চাইল, আর, ধরে নেয়াই যায়, খুব সুন্দরী একটি কনে সে পছন্দ করতে চাইল ফুলেদের মাঝ থেকে। তীক্ষ্ণ, ছিদ্রান্বেষী চোখে সে তাকাতে লাগল ফুলেদের সব বেডের দিকে, আর দেখতে পেল যে নিজ-নিজ বৃন্তের ওপর ফুলেরা বসে আছে শান্ত আর বিনয়ী হয়ে, ঠিক যেমন কুমারীদের বসে থাকা উচিত তাদের বাগ্‌দানের আগে; কিন্তু ফুল রয়েছে অসংখ্য জাতের, তাই তার কনে খোঁজাটা বেশ ক্লান্তিকরই হবে মনে হচ্ছে। প্রজাপতি খুব বেশি ঝামেলা পছন্দ করে না, তাই উড়ে গেল সে ডেইজিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। ফরাসীরা এই ফুলকে বলে 'মার্গেরিট', তারা এটাও বলে যে ছোট্ট ডেইজি ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। প্রেমিক-প্রেমিকারা ফুলটার পাপড়ি ছেঁড়ে; তারা একটা করে পাপড়ি ছেঁড়ে, আর একটা করে প্রশ্ন করে তাদের প্রেমিক-প্রেমিকা সম্বন্ধে; এভাবে: 'সে কি আমাকে ভালবাসে? তীব্রভাবে? বিক্ষিপ্তভাবে? খুব? সামান্য? একটুও না?' ইত্যাদি-ইত্যাদি। প্রত্যেকে প্রশ্ন করে নিজের ভাষায়। প্রজাপতিও প্রশ্ন করতে গেল মার্গেরিটের কাছে, কিন্তু সে তার পাপড়ি ছিঁড়ল না; সে চুমু দিল প্রত্যেক পাপড়ির

ওপর, কারণ, সে ভাবে যে দয়া দিয়ে সবসময়ই আরও কিছু করার আছে।

'প্রিয়ে মার্গেরিট ডেইজি,' বলল প্রজাপতি তাকে, 'সব ফুলের মধ্যে তুমিই সবচেয়ে জ্ঞানী মহিলা। দয়া করে বলো ফুলেদের মধ্যে কাকে আমি বেছে নেব আমার বউ হিসেবে। কে হবে আমার কনে? যখন আমি জানব, সোজা উড়ে চলে যাব তার কাছে, আর দেব বিয়ের প্রস্তাব।'

কিন্তু মার্গেরিট তাকে কোনও জবাব দিল না; সে মর্মাহত হয়েছে প্রজাপতি তাকে মহিলা বলে ডাকায় যেখানে সে নিতান্ত এক বালিকা; দুটোর মধ্যে আকাশ আর পাতালের পার্থক্য। সে তাকে প্রশ্ন করল দ্বিতীয়বার, আর তারপর তৃতীয়বার; কিন্তু সে বোবা হয়ে থাকল, একটা কথারও জবাব দিল না। অপেক্ষা করা প্রজাপতির পক্ষে সম্ভব নয়, এক্ষুণি উড়ে গিয়ে সে নতুনভাবে শুরু করবে পাণি-প্রার্থনা। বসন্তকাল সবে শুরু হয়েছে, রাশি-রাশি ফুটেছে ক্রকাস আর গ্লোড্রপ।

'তারা খুব আকর্ষণীয়,' ভাবল প্রজাপতি; 'সুন্দরী ছুঁড়ি সব; কিন্তু বাইরের রূপটুকু ছাড়া তাদের আর কিছু নেই।'

তারপর, ছোকরারা প্রায়ই যা করে, সে খুঁজতে লাগল বেশি বয়সী মেয়ে। এবার উড়ে গেল সে অ্যানেমোনিদের কাছে; তার রুচির পক্ষে এরা খিটখিটে। ভায়োলেট, খুব ভাবপ্রবণ। লেবুর ফুল, খুব ছোট, তা ছাড়া, তাদের আছে এক পেল্লায় পরিবার। আপেলের ফুল, যদিও দেখতে তারা গোলাপের মত, আজকের ফোটা ফুল হয়তো ঝরে যাবে আগামীকালের প্রথম বাতাসেই; প্রজাপতি ভাবল যে এদের কাউকে বিয়ে করলে হয়তো তা টিকবে খুবই অল্প সময়। তার মন সবচেয়ে বেশি ভরিয়ে দিল মটরশুঁটির ফুল; সে সাদা আর লাল, মাধুর্যপূর্ণ আর ছিপছিপে, ধরন সেইসব ঘরকুনো মেয়েদের মত যারা যথেষ্ট সুন্দরী হওয়া সত্ত্বেও রান্নাবান্নায় পাকা। প্রজাপতি কেবল তাকে প্রস্তাব দিতে যাবে, এমন সময় তার চোখ পড়ল মেয়েটির পাশেই পড়ে থাকা মটরশুঁটির একটা খোসার উপর, খোসাটার প্রান্তে ঝুলছে শুকনো একটা ফুল।

'ওটা কে?' জানতে চাইল সে।

'আমার বোন,' জবাব দিল মটরশুঁটির ফুল।

'অ্যাঁ, তাই নাকি!' তা হলে তো একদিন তুমিও হয়ে যাবে তার মত,' বলল প্রজাপতি; আর সোজা উড়ে উঠল, কারণ, মনে তার লেগেছে অত্যন্ত জোর আঘাত।

বেড়া-ঝোপ থেকে ঝুলছে পুরো ফোটা একটা হানিসাকল; কিন্তু অসংখ্য মেয়ে আছে এমন চেহারার, লম্বা মুখ আর ভাসাভাসা গায়ের রঙ। না; এই মেয়ে তার পছন্দ নয়। কিন্তু কোন্ মেয়ে প্রজাপতির পছন্দ?

বসন্ত চলে গেছে কবেই, গ্রীষ্মও শেষ হলো; এল শরৎকাল; কিন্তু সে এখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি। ফুলেরা এখন উপস্থিত হয়েছে সবচেয়ে জাঁকাল পোশাক পরে, কিন্তু এই সাজ সম্পূর্ণ ব্যর্থ; তাদের আর নেই তারুণ্যের তাজা, সুগন্ধী আবেশ। হৃদয় চায় সুগন্ধী, এমনকী সেই হৃদয়ের তারুণ্য চলে গেলেও; ডালিয়া কিংবা শুকনো ক্রিসানথিমামে রয়েছে এখন সুগন্ধীর ছিটেফোঁটা; তাই প্রজাপতি ঘুরল মাটির পুদিনার দিকে। সবাই জানে, পুদিনার কোনও ফুল নেই; কিন্তু মিষ্টতা ছড়িয়ে আছে তার সবখানে, আপাদমস্তক তা সৌরভে ভরা, প্রত্যেক পাতায় ফুলের সুগন্ধী।

'আমি তাকে নেব,' বলল প্রজাপতি; আর সে দিল তাকে বিয়ের প্রস্তাব। কিন্তু তার কথা শুনল পুদিনা নীরব এবং কঠিন হয়ে। অবশেষে সে বলল–

'বন্ধুত্ব হতে পারে, যদি তুমি চাও; তার বেশি কিছু নয়। আমি বুড়ি, তুমিও বুড়ো হয়েছ, কিন্তু আমরা বাঁচতে পারি একে অপরের হয়ে; বিয়ের প্রশ্নে–না; এই বয়েসে সবার কাছে আমাদের আর হাসির খোরাক করে তুলো না।'

এবং ফলে ঘটনা এমন দাঁড়াল যে

প্রজাপতির ভাগ্যে বউই জুটল না আর। কনে পছন্দ করতে অনেক লম্বা সময় ব্যয় করে ফেলেছে সে, সবসময়ের জন্যেই যা একটা বাজে পরিকল্পনা। প্রজাপতিটা হয়ে গেল, যাকে বলে–চিরকুমার বুড়ো।

শরতের শেষের দিকে আবহাওয়া হলো বর্ষণমুখর আর মেঘাচ্ছন্ন। ঠাণ্ডা বাতাস বইল উইলোর নোয়ানো পিঠের ওপর দিয়ে, তাই আবার ক্যাঁচক্যাঁচ করতে লাগল গাছগুলো। এই আবহাওয়ায় গরমের পোশাক পরে উড়ে বেড়ানো চলে না; সৌভাগ্যক্রমে প্রজাপতিকে বেরোতে হলো না এমন আবহাওয়া মাথায় নিয়ে। হঠাৎ সে আশ্রয় পেয়ে গেল একটা রুমে, যেখানে স্টোভের তাপ সৃষ্টি করেছে গ্রীষ্মের আবহাওয়া। এখানে সে টিকে থাকতে পারবে, সে বলেছে, যথেষ্ট ভালভাবেই।

'কিন্তু কেবল টিকে থাকাটাই যথেষ্ট নয়,' বলল সে, 'আমার চাই স্বাধীনতা, সূর্যালোক, আর সঙ্গিনী হিসেবে ছোট একটা ফুল।'

তারপর উড়ে-উড়ে সে গেল জানালার শার্শির কাছে, রুমের ভেতরে যারা ছিল তাকে দেখে প্রশংসা করল তারা, আর তাকে ধরে একটা পিন দিয়ে গেঁথে রাখল একটা কিউরিওসিটির বাক্সে। তার জন্যে এর চেয়ে বেশি কিছু তারা করতে পারত না।

'এখন আমি একটা বৃন্তের ওপর উঠে বসে আছি, ফুলেদের মত,' বলল প্রজাপতি। 'এভাবে থাকা খুব আনন্দদায়ক নয়, অবশ্যই; আমার ভাবা উচিত যে এভাবে থাকা অনেকটা বিয়ে করার মত, কারণ, আমি মোটেই নড়াচড়া করতে পারছি না।' এই ভাবনার সহায়তায় নিজেকে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা দিল সে।

'সান্ত্বনাটাকে অতি তুচ্ছ মনে হচ্ছে,' বলল রুমের ভেতরে টবে বেড়ে ওঠা লতানো গাছগুলোর একটা।

'ইস,' ভাবল প্রজাপতি, 'টবের এই লতানো গাছগুলোকে খুব একটা বিশ্বাস করা যায় না; মানুষের সঙ্গে তাদের আবার বেজায় ওঠাবসা।' ■

প্রকাশিত হয়েছে

ছোট ভয়

নাজমুল হাসান নিরো

প্রতিটি নতুন প্লট নিয়ে লেখা হরর, থ্রিলার এবং গোয়েন্দা গল্পের সংকলন

গল্পের তালিকা:

১. হান্টিং পিওর ব্লাড
২. ভুয়া ফ্রি মেসন
৩. আন্ডারগ্রাউন্ড কাল্ট
৪. দ্য ফেইলড কন্ট্র্যাক্ট কিলার
৫. ফান্টু বোসেন
৬. রামুদিনের সরগম
৭. সাগর দের শান্টু
৮. ভেন্ট্রিলোকুইষ্ট
৯. অরুনিমার হাসিমরণ
১০. কমলা ফেরেল
১১. দ্য নাইন আন-নন ম্যান
১২. মিট-বোন মিল
১৩. নিয়তির হাসি ১
১৪. নিয়তির হাসি ২
১৫. (গোয়েন্দা গল্প) হরতন দ্য গ্রেট
১৬. (গোয়েন্দা গল্প) হ্যাকিং গোল্ডওয়েজ

এবং আরও .....

প্রাপ্তিস্থান:

মানিক লাইব্রেরী, নামাজ ঘর গলি, নীলক্ষেত, ঢাকা। মোবাইল: ০১৭৩৫-৭৪২৯০৮।

মূল্য: ১৫০ টাকা

দেশের যে কোন প্রান্ত থেকে বই পেতে কুরিয়ার চার্জ ৪০ টাকা সহ মোট ১৯০ টাকা অগ্রিম বিকাশ করতে হবে।

ইতিহাসের গল্প

রহস্য

টিপলি দেবী চৈতি

লায়লাকে শুধুমাত্র একটিবার নিজের চোখে দেখবার জন্য খলিফা অনেক ধরনের প্রচেষ্টা চালালেন।

লায়লা নামের এক নারীর প্রেমে দিওয়ানা হয়ে, বেদুঈন কবি নিজের নাম বদল করে রাখল–মজনু। যার অর্থ হলো–পাগল।

এই গল্প শোনার পর, খলিফা হারুন-অর-রশিদ খুব কৌতূহলী হয়ে উঠলেন লায়লার প্রতি, যে কিনা ওই কবির দুর্দশার কারণ।

'লায়লা নিশ্চয়ই অসামান্য রূপসী হবে। সব নারীর চাইতে অনন্যা। এটাও হতে পারে, সে যে কোনও নারীর চেয়ে রূপ ও লাবণ্যে বেশি মোহময়ী!' ভাবলেন তিনি।

এরপর লায়লাকে শুধুমাত্র একটিবার নিজের চোখে দেখবার জন্য খলিফা অনেক ধরনের প্রচেষ্টা চালালেন।

অবশেষে একদিন লায়লাকে খলিফার দরবারে নিয়ে আসা হলো। লায়লা যখন নেকাব খুলল, তখন তাকে দেখে খলিফা যারপর নাই হতাশ হলেন।

লায়লা কুৎসিত, খোঁড়া বা বৃদ্ধা নারী ছিল না। কিন্তু লায়লা তেমন আহামরি কোনও সুন্দরীও ছিল না। সে ছিল অন্য সব সাধারণ নারীর মতই দোষে-গুণে একজন মানুষ।

খলিফা তাঁর অসন্তোষ না লুকিয়েই বললেন, 'তুমিই কি সেই নারী, যার জন্যে মজনু পাগল হয়েছে? কেন? তুমি তো খুবই সাধারণ একজন মহিলা। তোমার মাঝে সে এমন কী দেখল?'

হাসতে-হাসতে লায়লা বলল, 'হ্যাঁ, আমিই সেই লায়লা। কিন্তু আপনি তো মজনু নন। আমাকে মজনুর চোখে দেখতে হবে। তা না হলে আপনি কখনওই সেই রহস্যের সমাধান করতে পারবেন না, যাকে লোকে বলে–ভালবাসা!' ■

(অনলাইন থেকে পাওয়া)

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আপনার স্বাস্থ্য

ডা. মিজানুর রহমান কল্লোল
E-mail: parijat2006@yahoo.com

ভাই, খারাপ বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে দেড় বছর ধরে ঘন ঘন হস্তমৈথুন করে জীবনকে শেষ করে দিয়েছি।

হঠাৎ শিশুর খিঁচুনি

মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে খিঁচুনি হয়। মারাত্মক সংক্রমণ, যেমন–মেনিনজাইটিস, মাথায় আঘাত এবং উচ্চমাত্রার জ্বর পাঁচ বছর বয়সের নিচের শিশুদের মস্তিষ্কে উত্তেজনা ঘটায় এবং এর ফলে খিঁচুনি হতে পারে।

কী জানবেন

আপনার বাচ্চার নিচের কোনও একটি লক্ষণ অথবা সবগুলো লক্ষণই আছে কি না, সেটা পরীক্ষা করে দেখুন।

- জ্ঞান হারানো।
- চোখ পিটপিট করা, একদৃষ্টিতে তাকানো অথবা চোখ উল্টে যাওয়া।
- শরীর, বিশেষ করে হাত ও পা তড়পানো।
- প্রস্রাব এবং পায়খানার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারানো।

কী করবেন

যদি আপনার বাচ্চার খিঁচুনি থাকে:

- শান্ত রাখুন।
- বেশিরভাগ খিঁচুনি পাঁচ মিনিটের কম স্থায়ী হয়।
- বাচ্চাকে এক কাত করে রাখুন কিংবা উপুড় করে রাখুন, যাতে মুখ থেকে লালা বেরিয়ে যেতে পারে।
- বাচ্চাকে এমন নিরাপদ স্থানে রাখুন, যাতে সে পড়ে না যায় কিংবা তার শরীরে অন্য কোনও বস্তুর আঘাত না লাগে।
- বাচ্চার নড়াচড়ার ধরন লক্ষ্য করুন এবং খিঁচুনি কতক্ষণ স্থায়ী থাকে সেটা লক্ষ্য করুন।
- খিঁচুনির সময় বাচ্চার শরীর গরম থাকলে তার কাপড়চোপড় সব খুলে ফেলুন এবং তাকে ঠাণ্ডা রাখুন।
- খিঁচুনির পর বাচ্চাকে বিশ্রামে রাখুন।

কী করবেন না

যখন আপনার বাচ্চার খিঁচুনি হয়:

- বাচ্চার দুই দাঁতের পাটির মাঝখানে জোর করে কোনও বস্তু ঢোকাবেন না।

● বাচ্চাকে ধরার চেষ্টা করবেন না কিংবা তার তড়পানো বন্ধ করার চেষ্টা করবেন না।
● খিঁচুনির সময় বাচ্চাকে কোনও কিছু পান করাবেন না কিংবা কোনও ওষুধ দেবেন না।
● খিঁচুনি থামানোর জন্য বাচ্চাকে গোসল করাবেন না।

কখন ডাক্তারের কাছে যাবেন

যদি আপনার বাচ্চার খিঁচুনি হয় অথবা পূর্বে খিঁচুনি থাকে:
● বাচ্চার শরীর নীল হয়ে গেলে কিংবা তার খিঁচুনি পাঁচ মিনিটের বেশি স্থায়ী হলে বাচ্চাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবেন।
● বাচ্চার খিঁচুনির পর সর্বদা ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

প্রতিরোধ

ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী খিঁচুনির ওষুধ দেবেন। মাথার আঘাত প্রতিরোধ করতে কিছু ব্যবস্থা নেবেন, যেমন:
● খেলাধুলার নিরাপদ সামগ্রী ব্যবহার করবেন।
● মোটর সাইকেল কিংবা বাইসাইকেলে চড়ানোর সময় মাথায় হেলমেট পরিয়ে নেবেন।
● গাড়িতে চড়ানোর সময় সিটবেল্ট বেঁধে দেবেন।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিকস ও ট্রমাটোলজি বিভাগ, ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। **চেম্বার:** পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টার লিঃ, ২ ইংলিশ রোড, ঢাকা। **মোবাইল:** ০১৬৮৬-৭২২৫৭৭।

চিঠিপত্রের জবাব

সমস্যা: আমার বয়স ২৬ বছর। আমি একজন সরকারি চাকরিজীবী, আমার উচ্চতা ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি। আমার সমস্যা হলো মলত্যাগের সময়, তার পরে-আগে হঠাৎ করে ফিনকি দিয়ে টাটকা রক্ত পড়ে। প্রথম পর্যায়ে কম, তারপর কোনও ব্যথা-বেদনা নেই। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেখা যায়, কয়েক দিন ধরে পায়খানা হচ্ছে না। তারপর হঠাৎ একদিন মলত্যাগ করতে গিয়ে খুব জোরে শক্তি প্রয়োগ করতে হলো এবং এর পর-পরই তাজা রক্তপাত। আবার কোনও কোনও সময় সামান্য চাপ দিলেই রক্তপাত হয় এবং নিজে নিজে আবার বন্ধ হয়ে যায়। অনেক সরকারি ডাক্তার

আপনি কি হতাশ?

আর হতাশা নয়। নির্ভুল ভাগ্য গণনার মাধ্যমে নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে হলে স্বনামখ্যাত জ্যোতিষী **কাজী সারওয়ার হোসেন** পরিচালিত
'ভাগ্যচক্র'তে আসুন।
৩৪৫ সেগুনবাগিচা (চতুর্থ তলা)
(ভিশন অ্যাডভারটাইজিং সংলগ্ন)
শনি থেকে বৃহস্পতিবার: বিকেল ৫.৩০–৭.৩০
ফোন: ৮৩২২৭০৬, ৮৩৫২১৬৭ (অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য)

১৭/৪/১৭ তারিখে প্রকাশিত হচ্ছে
অনুবাদ
রাফায়েল সাবাতিনি-র
মিস্ট্রেস ওয়াইল্ডিং
রূপান্তর: শাহেদ জামান

এই গল্পের পটভূমি সপ্তদশ শতকের ইংল্যাণ্ড। ক্যাথলিক রাজা দ্বিতীয় চার্লসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন প্রটেস্ট্যান্ট পক্ষের নেতা, ডিউক অভ মনমাউথ। রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতি, যুদ্ধ শুরু হবে যে-কোন সময়। মনমাউথেরই একনিষ্ঠ সহযোগী, অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিং। সুদর্শন, সাহসী এক যুবক। একই সাথে সুন্দরী রুথ ওয়েস্টমাকটের ব্যর্থ প্রণয়ী। তবে হতাশ হওয়া তার স্বভাবে লেখা নেই। কিন্তু ভালবাসা কি জোর করে পাওয়া যায়? এই সময় বেজে উঠল যুদ্ধের দামামা। শুরু হলো দোটানা–কে জিতবে? ভালবাসা, না দায়িত্ববোধ? অ্যান্থনি কি শেষ পর্যন্ত রুথের ভালবাসা পাবে? প্রিয় পাঠক, চলুন ডুব দিই উত্তাল সময়ে রচিত এক শ্বাসরুদ্ধকর কাহিনির মাঝে!

দাম ■ চুরাশি টাকা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
mail: alochonabibhag@gmail.com
শো-রুম
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

দেখিয়েছি। কোনও ফল পাইনি। দয়া করে আমার সমস্যার সমাধান দিলে কৃতজ্ঞ থাকব।

মোঃ সৃষ্টি নাহিদ
ঢাকা।

সমাধান: বিভিন্ন কারণে মলত্যাগের সময় মলদ্বার দিয়ে রক্তপাত হতে পারে। আপনাকে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। আপনি একজন সার্জারি বিশেষজ্ঞ বা কলোরেক্টাল সার্জনের সঙ্গে দেখা করুন।

সমস্যা: আমি একজন বিবাহিত ও বয়স ২২ বছর। আমার সমস্যা হলো: বিশেষ অঙ্গ (লিঙ্গ) খুবই ছোট ও চিকন এবং তুলার মত নরম।

নাম-ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

সমাধান: লিঙ্গ তুলার মত নরম হলে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা প্রয়োজন। আপনার লিঙ্গে রক্তপ্রবাহ ঠিকমত হচ্ছে কি না সেটা দেখার জন্য আপনি একজন ইউরোলজিস্ট দেখান।

সমস্যা: আমার বয়স ২২। উচ্চতা ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি। ওজন ৫৭ কেজি। নোয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স ২য় বর্ষে পড়ি। ভাই, খারাপ বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে দেড় বছর ধরে ঘন ঘন হস্তমৈথুন করে জীবনকে শেষ করে দিয়েছি। এ নিয়ে দুশ্চিন্তায় লেখাপড়া হচ্ছে না। লজ্জায় বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের পরামর্শ নিতে পারছি না। দয়া করে যদি পরামর্শ দেন, তবে চির কৃতজ্ঞ থাকব।

নিজাম উদ্দিন
নোয়াখালী।

সমাধান: আপনি যেটাকে সমস্যা হিসেবে দেখছেন, সেটা কোনও সমস্যা বলে মনে হচ্ছে না। আপনি নিয়মিত ব্যায়াম করুন এবং পুষ্টিকর খাবার খান। ■

গুপ্তচর

মূল ▮ রাফায়েল সাবাতিনি
রূপান্তর ▮ শাহেদ জামান

হঠাৎ
বুদ্ধিটা এল
তার
মাথায়।
এখনই
সুযোগ!
দোষটা
আরেকজনের
ঘাড়ে
চাপানোর।

প্রফেসর কফম্যান ঘুমিয়ে পড়েছিলেন মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে। হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল। প্রথমে বুঝতে পারলেন না শব্দটা কীসের। তারপর বুঝলেন, দরজা থেকে আসছে শব্দটা। ইলেকট্রিক বেল বাজিয়েছে কেউ।

বিছানায় উঠে বসলেন প্রফেসর। আলো জ্বাললেন। ঘড়িতে বাজে দুটো দশ। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলেন তিনি। ধূসর চোখে সতর্ক দৃষ্টি। কুচকুচে কালো চুল আর কালো দাড়ির মাঝে হালকা রঙের চোখদুটো একেবারেই বেমানান। অবশেষে বিছানা থেকে নামলেন তিনি, পাশের এক চেয়ার থেকে ভারী ড্রেসিং গাউন তুলে নিলেন।

চল্লিশের মত বয়স হবে প্রফেসরের। লম্বা, শক্তসমর্থ দেহ। দেখলেই মনে হয় সহজে ভয় পাওয়ার পাত্র নয় এ লোক। কিন্তু গাউনটা পরার সময় অল্প অল্প কাঁপছেন তিনি। অবশ্য কাঁপার কারণ হতে পারে যে এখন ডিসেম্বর মাস। ১৯১৪ সালের ডিসেম্বর। পাশের ছোট্ট টেবিলের উপর থেকে ছোট্ট পিস্তল তুলে নিয়ে গাউনের পকেটে রাখলেন।

বেলটা তখনও বাজছে। বেডরুম থেকে বেরিয়ে এলেন প্রফেসর, ধীর পায়ে কার্পেট মাড়িয়ে

এগোলেন সদর দরজার দিকে। দরজাটা খুলে যেতেই হলওয়ের হালকা আলোয় দেখা গেল, হালকা-পাতলা, ফ্যাকাসে চেহারার এক যুবক দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। পরনে ফারের লাইনিং দেয়া কোট।

এক মুহূর্তের জন্য স্বস্তি ফুটে উঠল প্রফেসর কফম্যানের চেহারায়। কিন্তু পরক্ষণেই সে জায়গা দখল করল বিরক্তি।

'এলফিনস্টোন!' অবাক হয়ে বলে উঠলেন তিনি। 'তুমি? এত রাতে?'

প্রফেসরের ইংরেজি উচ্চারণ একেবারে চোস্ত ব্রিটিশদের মত। মাঝে মাঝে গলার গভীর থেকে উঠে আসা দুই-একটা শব্দ ছাড়া তার আসল দেশ বোঝার উপায় নেই।

কোনও রকম আমন্ত্রণ ছাড়াই ভেতরে ঢুকে পড়ল যুবক। 'তোমাকে এভাবে বিরক্ত করার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত, কফ। আমি ভেবেছিলাম, অন্য কেউ বোধহয় খুলবে দরজা।'

দরজাটা বন্ধ করে দিলেন প্রফেসর। 'বাড়িতে আমি একাই আছি। আমার চাকরটা অসুস্থ, ছুটি নিয়েছে,' নিরস গলায় বললেন তিনি। 'এসো, স্টাডিতে গিয়ে বসা যাক।'

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলেন তিনি, পেছনে এলফিনস্টোন। একটা দরজা খুলে আলো জ্বাললেন প্রফেসর। বেশ প্রশস্ত একটা কামরায় প্রবেশ করেছেন তাঁরা। বাতাসে সুবাসিত তামাকের গন্ধ ভাসছে। ফায়ারপ্লেসে জ্বলছে নিভু নিভু আগুন। সেটাকে খুঁচিয়ে ভাল করে জ্বালতে গেলেন প্রফেসর। যাওয়ার পথে বিশাল রাইটিং টেবিলটার উপর নামিয়ে রাখলেন পিস্তলটা।

হ্যাট খুলে ফেলল এলফিনস্টোন, ভারী কোটটা খুলে রেখে দিল এক পাশে। হাতগুলো কাঁপছে। একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে আছে চেহারা, হাঁপাচ্ছেও যেন একটু একটু। বোঝা যাচ্ছে দারুণ অস্বস্তিতে আছে। কামরার এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে তার অস্থির দৃষ্টি।

'তোমাকে দারুণ ঝামেলায় ফেলে দিলাম, তাই না, কফ?' ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বলল সে। 'বিশ্বাস করো, খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কথা বলতে হবে বলেই এত রাতে জ্বালাতে এলাম তোমাকে। একটু ঝামেলায় পড়েছি।'

কাজ শেষ করে এগিয়ে এলেন প্রফেসর। 'ড্রিংক নেবে?' শান্ত গলায় প্রশ্ন করলেন তিনি, এক কোণে টেবিলের উপর রাখা গ্লাস আর বোতলের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

'ধন্যবাদ, হ্যাঁ।' টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল এলফিনস্টোন। গ্লাসের অর্ধেক ভরে নিল হুইস্কি দিয়ে, তারপর এক চামচ সোডা মিশিয়ে এক ঢোকে গিলে ফেলল।

তীক্ষ্ণ চোখে তাকে দেখছেন প্রফেসর।

'ব্রিজ খেলতে গিয়েছিলে, তাই না?' বললেন তিনি। 'তোমাকে আগেও বলেছি, এসব ছাড়ো। তোমার কপাল খুব একটা ভাল নয়, তার উপর খেলতেও জানো না। ধৈর্য নেই তোমার।'

'না-না,' তাড়াতাড়ি জবাব দিল যুবক। 'ব্রিজ খেলা নিয়ে সমস্যা বাধেনি।' রাইটিং টেবিলের পাশের এক চেয়ারে বসে পড়ল এলফিনস্টোন। 'সত্যি কথা বলতে,' বলল সে, 'সমস্যাটা আসলে আমার নয়। তোমার।'

'আমার?'

প্রফেসরের শান্ত চেহারা লক্ষ করে ঠাণ্ডা হাসি ফুটে উঠল এলফিনস্টোনের ঠোঁটে। কাঁধ ঝাঁকাল সে।

'তোমার কী মনে হয়? আজকালের দিনে তোমার মত লোককে কারও চোখে পড়বে না, বিশেষ করে যখন পুরো দেশ গুপ্তচরের খোঁজে হন্যে হয়ে আছে?'

আগুন খোঁচানোর লাঠিটা প্রফেসরের হাতেই ছিল। এবার সেটা নামিয়ে রাখলেন তিনি, তারপর এগিয়ে এসে মুখোমুখি হলেন যুবকের।

'তুমি কী বলতে চাচ্ছ বুঝতে পারছি না,' আগের মতই শান্ত গলায় বললেন তিনি।

'খুব ভালভাবেই বুঝতে পারছ। আমি বলতে চাইছি, তোমার উপর হোম অফিসের নজর পড়েছে। ঠিক কী কারণে সেটা আমি জানি না, জানতে চাইও না। এমনিতেই নিজের সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকি। কিন্তু তুমি আমার সাথে সবসময় ভাল ব্যবহার করেছ, কফ... তাই ভাবলাম ব্যাপারটা তোমাকে জানাই। তোমার উপর নজর রাখা হচ্ছে।'

'শুনে খুব খুশি হলাম,' হাসলেন প্রফেসর।

'নজরটা রাখছে কে?'

'সরকারের লোক, আবার কে? স্কট-ড্রামণ্ড বলে কারও নাম শুনেছ?'

দ্রুত একবার পলক পড়ল প্রফেসরের চোখে। 'স্কট-ড্রামণ্ড? ইন্টেলিজেন্সের স্কট-ড্রামণ্ড?' গলার স্বরে খুব সূক্ষ্ম পরিবর্তন, ধরা যায় কি যায় না।

'হ্যাঁ।'

'বুঝলাম,' সোজা হয়ে দাঁড়ালেন প্রফেসর। 'স্কট-ড্রামণ্ডকে আমি চিনি,' সহজ গলায় বললেন তিনি। 'তো কী হয়েছে?'

'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমার কেসটা ও-ই সামলাচ্ছে। তোমার পেছনে ফেউ লাগিয়ে দিয়েছে। সেজন্যই তোমাকে জানাতে এলাম, যাতে তুমি সাবধান হতে পারো।'

হো-হো করে হেসে উঠলেন প্রফেসর, একটু যেন জোরেই বাজল হাসির শব্দ। 'তোমার অনেক দয়া, এলফিনস্টোন। কিন্তু আমি সাবধান হব কেন? স্কট-ড্রামণ্ড যদি আমার পেছনে সময় নষ্ট করতে চায়, তো আমার কোনও আপত্তি নেই। আরেকটা ড্রিংক চলবে?'

কিন্তু প্রস্তাবটা গ্রহণ করল না এলফিনস্টোন। মুখটা ভার হয়ে উঠেছে তার। 'আমার কথা শোনা উচিত তোমার,' অভিযোগের সুরে বলল সে। 'উপযুক্ত কারণ না থাকলে ওরা তোমাকে সন্দেহ করত না। আর আমি নিজেও অনেক ঝুঁকি নিয়ে এসেছি এখানে, শুধু তোমাকে সাবধান করার জন্য।'

মৃদু হাসলেন প্রফেসর, অবুঝ শিশুর দিকে তাকিয়ে যেভাবে হাসে বড়রা।

'ওদের কথা সত্যিই বিশ্বাস করেছ? বেশ!' টেবিলের এক কোনায় বসতে বসতে বললেন তিনি। 'তা এই গুজবটা শুনলে কোত্থেকে?'

'গুজব নয়। আজ সন্ধেয় এক বাচাল আণ্ডার-সেক্রেটারির মুখ থেকে কথাটা শুনেছি আমি। আর লোকটা যা বলছিল, তাতে তোমার জায়গায় আমি হলে খুব তাড়াতাড়ি দেশ ছেড়ে পালাতাম, কফ।'

'ধ্যুৎ! ধাপ্পা দিচ্ছ তুমি।'

'বেশ, তুমি যা ভাল বোঝো,' অভিমান ফুটে উঠল যুবকের গলায়। 'কিন্তু এটা তোমাকে মানতেই হবে যে আমি তোমার বন্ধুর কাজ করেছি, ঝুঁকি নিয়ে এসেছি তোমার সাথে দেখা করতে।'

'এমন কোনও ঝুঁকি নিয়েছ বলে তো মনে হয় না,' হেসে উঠলেন প্রফেসর। 'তবে তোমার বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের জন্য ধন্যবাদ।'

'ঠিক আছে। আমি তা হলে এখন যাই,' বলে উঠে দাঁড়াল এলফিনস্টোন। অস্বস্তির ছাপটা এবার আরও বেশি করে ফুটে উঠল তার চেহারায়। 'ঠিক আছে,' আবার বলল সে। তারপর হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। 'আরেকটা ব্যাপার ছিল,' বলল সে। তারপর হঠাৎ দ্রুত কথা বলতে শুরু করল: 'সত্যি কথা বলতে, আমি নিজেও বেশ ঝামেলায় পড়েছি। কাল সকালের মধ্যে এক শ' পাউণ্ড খুব দরকার আমার। তুমি কি আমাকে... মানে, টাকাটা পেলে আমার বেশ উপকার হত...'

বাক্য শেষ না করেই থেমে গেল সে, আশাবাদী চোখে তাকিয়ে রইল প্রফেসরের দিকে।

পরিষ্কার বিরক্তি ফুটে উঠল প্রফেসরের চোখে। ঠোঁট টিপে হাসলেন তিনি। 'ভাবছিলাম কখন টাকার কথাটা পাড়বে।'

লাল হয়ে উঠল এলফিনস্টোনের মুখ। 'তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ না যে তথ্যটার বিনিময়ে তোমার কাছে টাকা চাইছি আমি?'

'আচ্ছা, তুমি টাকাটা পাওয়ার জন্য কথাগুলো বানিয়ে বলোনি তো?' প্রশ্ন করলেন প্রফেসর।

'কফম্যান!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল যুবক।

কিন্তু সেটা যেন কানেই যায়নি প্রফেসরের। আমুদে গলায় বলে চললেন তিনি, 'তুমি নিশ্চিত যে স্কট-ড্রামণ্ডকে নিয়ে যে গল্পটা আমাকে শোনালে এইমাত্র, সেটা একেবারে ভিত্তিহীন নয়?' স্থির চোখে তাকিয়ে আছেন এলফিনস্টোনের দিকে।

'তুমি কী ভাবো আমাকে?' আহত গলায় প্রশ্ন করল যুবক।

'আমার কাছে তুমি অপরিণামদর্শী ছোকরা ছাড়া কিছুই নও। যে ব্রিজ খেলায় কেবল হারে, এবং সেই হারের টাকা শোধ করার জন্য এর ওর

কাছে দেনা করে বেড়ায়।'

আরও লাল হয়ে গেল এলফিনস্টোনের গালদুটো। কিন্তু তারপরেই ফ্যাকাসে হয়ে গেল আবার। দারুণ আহত হয়েছে এমন ভাব দেখিয়ে কোটটা গায়ে চড়াল সে, হাত বাড়াল হ্যাটের দিকে। 'তোমার সাথে ফালতু তর্ক করে লাভ নেই...'

'কোনও লাভ নেই,' সম্মতি জানালেন প্রফেসর।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে হ্যাট মাথায় চড়াল এলফিনস্টোন, এগিয়ে গেল দরজার দিকে। কিন্তু প্রয়োজনের কাছে হার মানতে বাধ্য হলো গর্ব। দরজার কাছে গিয়ে আবার ফিরে তাকাল সে। 'কফম্যান,' এবার আগের চাইতে শান্ত গলায় বলল সে, 'আমি যে কথাগুলো তোমাকে বললাম, সেগুলো মিথ্যে হলে আমার চাইতে খুশি কেউ হত না। কিন্তু মিথ্যে বলিনি আমি। বাজি ধরে বলতে পারি, কাল রাতেও যদি ইংল্যাণ্ডে থাকো তুমি, তা হলে জেলে যেতে হবে তোমাকে।'

'বোকার মত কথা বোলো না,' তিরস্কার ফুটে উঠল প্রফেসরের গলায়। 'এই দেশে কোনও কারণ ছাঁড়া কাউকে গ্রেফতার করা যায় না। আমার বিরুদ্ধে এমন কিছুই নেই যাতে ইন্টেলিজেন্স আমাকে গ্রেফতার করতে পারে।'

'আমি জানি তুমি ব্রিটিশ নাগরিক। কিন্তু স্কট-ড্রামণ্ড যদি তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে চায় যে তুমি জার্মান গুপ্তচর, তা হলে সে প্রমাণও ঠিক খুঁজে নেবে।'

'প্রমাণ থাকলে তো খুঁজবে, তাই না?' বললেন প্রফেসর। 'জার্মানির হয়ে কাজ করছি না আমি। তুমি যদি মাতাল অবস্থায় না থাকতে, তা হলে তোমার কথায় দারুণ অপমানিত বোধ করতাম। যাই হোক, রাত হয়েছে, এলফিনস্টোন। আমি ঘুমাতে যাব।'

'ঠিক আছে,' ভারী গলায় জবাব দিল এলফিনস্টোন। 'যাচ্ছি।'

কিন্তু যাওয়ার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না তার মাঝে। তার বদলে হঠাৎ একেবারেই ভেঙে পড়ল সে। 'কফ, বন্ধু,' আকুল গলায় বলে উঠল, 'ভয়াবহ বিপদে আছি আমি। কাল সকালের মধ্যে এক শ' পাউণ্ড না পেলে ঈশ্বরই জানেন কী হবে আমার!'

'বাজে কথা। পাওনাদাররা এত কড়া হবে না কখনও।'

'পাওনাদার নয়, অন্য ব্যাপার,' বলল এলফিনস্টোন। মনে আশা জেগেছে, হয়তো প্রফেসরের মন গলাতে পারবে। 'টাকাটা একজনের কাছ থেকে না বলেই নিয়েছিলাম,' বলল সে। 'সময়মত আগের জায়গায় টাকাটা ফেরত দিতে না পারলে কী হবে বুঝতেই পারছ! শেষ হয়ে যাব আমি। প্লিয, কফ...'

কিন্তু চিড়ে ভিজল না। বরং রাগ ও বিরক্তির পরিমাণ আরও বাড়ল প্রফেসরের মুখে। 'তোমার কাছে কত টাকা পাই আমি, জানো?' ঠাণ্ডা গলায় বললেন তিনি। 'প্রায় এক হাজার পাউণ্ড।'

'আমি জানি। খুব তাড়াতাড়ি তোমাকে ফিরিয়ে দেব, দেখো।'

'শুনে খুশি হলাম। কিন্তু এখন তোমাকে আর কোনও টাকা দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'আমার বিপদের কথা শুনেও সাহায্য করবে না?' দারুণ অবাক হয়ে গেল যেন এলফিনস্টোন।'

'অন্য কোথাও দেখো গিয়ে। আমার কাছে এখন এত টাকা নেই।'

'তা হলে দেবেই না?' চেপে বসল এলফিনস্টোনের দুই ঠোঁট।

'না। বললাম না, আমার কাছে টাকা নেই?'

'তাই নাকি? জার্মানদের কাছ থেকে তো ভালই টাকা-পয়সা পাচ্ছ তুমি।'

পাথরের মত হয়ে গেল প্রফেসরের চোখ। 'বাজে কথা বলবে না, এলফিনস্টোন,' বললেন তিনি। 'লাভ হবে না।'

'তাই নাকি?' খেপে উঠছে এলফিনস্টোন। 'কী ভেবেছ, কফম্যান? আমি হাঁদারাম? এতদিন চুপ করে ছিলাম, কারণ আমাকে সাহায্য করেছ তুমি। কিন্তু তাই বলে এটা ভেব না যে আমার চোখও বন্ধ ছিল। অনেক কিছু জানি আমি। স্কট-ড্রামণ্ডের কাছে সব বলে দেব...'

এবার সত্যিই খেপে উঠলেন প্রফেসর কফম্যান। 'বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে,' গর্জে উঠলেন তিনি। 'যদি ভেবে থাকো তোমার ব্ল্যাকমেইলে কাজ হবে, তা হলে ভুল করেছ।

এখনই বেরোও!'

তার থমথমে চেহারা দেখে সত্যিই ভয় পেয়ে গেল এলফিনস্টোন। নিচু স্বরে বলল, 'এক মিনিট দাঁড়াও, কফম্যান। আমি আসলে ওভাবে বলতে চাইনি...'

'কীভাবে বলতে চেয়েছ তাতে আমার কিছু যায়-আসে না। যা খুশি বলো গিয়ে স্কট-ড্রামণ্ডকে। তবে ভুলে যেয়ো না, তোমাকেও এমনি এমনি ছেড়ে দেবে না সে। ঠিকই খোঁজ নেবে, আর জানতে পারবে যে আমার কাছ থেকে এক হাজার পাউণ্ড নিয়েছ তুমি। টাকাটা কী জন্য নিয়েছ তুমি সেটাও তখন জানার ইচ্ছে হবে তার।'

'তার মানে?' অবাক হয়ে গেল এলফিনস্টোন।

'মানেটা তুমি খুব ভাল করেই বুঝতে পারছ,' কর্কশ হয়ে এল প্রফেসরের কণ্ঠ। 'তোমাকে টাকাটা শুধু শুধু দিইনি আমি। শোনো, ছোকরা, যেদিন বুঝতে পারবে যে তুমি আসলেও একটা হাঁদারাম, সেদিন বুঝবে জ্ঞানের পথে প্রথম পা-টা ফেলতে পেরেছ। এখন ভাগো। আমি ঘাড় ধরে বের করে দেয়ার আগেই ভাগো এখান থেকে!'

'ঈশ্বরের দোহাই, কফম্যান...' আবার কিছু একটা বলতে চাইল এলফিনস্টোন, কিন্তু তার আগেই এগিয়ে এলেন প্রফেসর।

'যেতে বললাম না তোমাকে?' বলে উঠলেন তিনি, তারপর যুবকের কাঁধ চেপে ধরে দরজার দিকে টান দিলেন। কিন্তু শরীর মুচড়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল এলফিনস্টোন।

'ছাড়ো আমাকে! ব্যাটা জার্মান টিকটিকি!' চেঁচিয়ে উঠল সে, তারপর সরে গেল টেবিলের অন্যদিকে। একটা গালি দিয়ে উঠে তাকে ধাওয়া করলেন প্রফেসর। তখনই ঘটল ঘটনাটা।

অনেকটা যেন দৈবের বশেই এলফিনস্টোনের হাতটা গিয়ে পড়ল টেবিলে পড়ে থাকা পিস্তলের উপর। কোণঠাসা ইঁদুরের মত অবস্থা এখন তার, খপ করে অস্ত্রটা তুলে নিল সে। ততক্ষণে প্রায় গায়ের উপর উঠে এসেছেন প্রফেসর। পিস্তলের নলটা দড়াম করে নামিয়ে আনল সে প্রফেসরের মাথায়।

গা গুলানো শব্দ হলো। কফম্যানের হাত দুটো আপনা-আপনি লাফ দিয়ে উঠে এল কাঁধের দু'পাশে, তার পরেই হুড়মুড় করে এলফিনস্টোনের পায়ের কাছে পড়ে গেলেন তিনি।

ক্রোধে চেঁচাতে লাগল এলফিনস্টোন। 'এবার উচিত শিক্ষা হয়েছে, ব্যাটা টিকটিকি! আমার গায়ে হাত দেয়ার মজা বুঝিয়ে দিয়েছি!'

হঠাৎ থেমে গেল তার আস্ফালন। প্রফেসরের দেহটা যেভাবে স্থির হয়ে পড়ে আছে, আর টকটকে লাল তরলটা যেভাবে তার মাথার চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে, তার মাঝে ভয়ঙ্কর কিছু আছে।

'কফম্যান!' আর্তস্বরে ডাক দিল এলফিনস্টোন। 'কফম্যান!'

কাঁপতে কাঁপতে প্রফেসরের পাশে বসে পড়ল সে, কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিল।

'কফম্যান!'

কিন্তু আগের মতই স্থির হয়ে পড়ে থাকল দেহটা। কী ঘটেছে বুঝে গেল এলফিনস্টোন। কাঁপতে কাঁপতে পিছিয়ে গেল সে, এখনও হাঁটু গেড়ে বসে আছে। 'হায়, ঈশ্বর!' কম্পিত হাতে সাদা হয়ে যাওয়া মুখটা ঢাকল সে।

পরমুহূর্তে প্রায় চিৎকার করে উঠল সে। এই কামরার মাঝেই, তার পেছনে নড়ে উঠেছে কেউ! চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল এলফিনস্টোন।

ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোগুলোকে ঢেকে রাখা ভারী পর্দাগুলো সরে গেছে। ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে আছে লম্বা, হালকা-পাতলা এক লোক। পরনে টুইডের জীর্ণ স্যুট। গলায় জড়ানো রঙজ্বলা স্কার্ফ, মাথায় পুরনো টুইডের ক্যাপ। সতর্ক, লম্বাটে মুখে তীক্ষ্ণ কালো চোখ। সেগুলো এখন ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে মাপছে এলফিনস্টোনকে।

দীর্ঘ এক মুহূর্ত পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল দু'জন। তারপর কথা বলে উঠল আগন্তুক। 'বেশ বেশ,' ব্যঙ্গের ছোঁয়া তার গলায়। 'এবার কী করবে?'

লাফিয়ে উঠল এলফিনস্টোন। 'কে তুমি?'

প্রশ্ন করল সে।

'একজন চোর,' জবাব দিল আগন্তুক। জানালার পর্দাগুলো আগের জায়গায় টেনে দিল সে, তারপর নিঃশব্দ পায়ে সামনে এগিয়ে এল।

'চোর!' আঁতকে উঠল এলফিনস্টোন।

'তাতে এত অবাক হওয়ার কী আছে?' প্রশ্ন করল আগন্তুক। 'তোমার মত খুনি তো আর নই!'

'খু-খু... কী বলছ এসব? ও তো মরেনি!'

'অবশ্যই মরেছে। ওর মাথাটা যদি ঢালাই লোহার তৈরি না হয়, তো বেঁচে থাকার কথা না।'

লোকটা যেন প্রফেসরের মরে যাওয়ায় মোটেই অবাক হয়নি। মৃতদেহের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল সে, দ্রুত পরীক্ষা করল একবার। তারপর উঠে দাঁড়াল। 'মরে কাঠ,' বলল সে। 'খুলি ফাটিয়ে দিয়েছ, ভায়া।'

ধপ করে টেবিলের উপর বসে পড়ল এলফিনস্টোন। দ্রুত দম নিচ্ছে, যেন হচ্ছে শ্বাসকষ্ট। 'আমি খুন করতে চাইনি,' ফিসফিস করে বলল সে। 'আত্মরক্ষার জন্য করেছি কাজটা... তুমি তো দেখেছ, কী ঘটেছে! দুর্ঘটনা ছিল ব্যাপারটা।'

'হ্যাঁ, তা তো দেখলামই,' জবাব দিল দ্বিতীয়জন। 'তবে আমার সাক্ষ্যে তোমার খুব একটা উপকার হবে বলে মনে হয় না। ভাল বিপদেই পড়েছ তুমি।'

হঠাৎ এলফিনস্টোনের চোখ জ্বলে উঠল। একটা বুদ্ধি এসেছে তার মাথায়। হাতে ধরা পিস্তলটার উপর চেপে বসল মুঠি। কিন্তু চোর মহাশয় তার চাইতেও বেশি বুদ্ধি ধরে মাথায়। এলফিনস্টোনের চোখ দেখেই বিপদ আন্দাজ করেছে সে। পিস্তল ধরা হাতটা উপরে তোলার আগেই এলফিনস্টোন দেখল, আরেকটা পিস্তলের লোলুপ নল চেয়ে আছে তার দিকে।

'ফেলে দাও ওটা!' কঠোর কণ্ঠে নির্দেশ দিল আগন্তুক।

অবশ হয়ে এল এলফিনস্টোনের হাত। পড়ে গেল পিস্তলটা। 'তুমি আমাকে খুন করতে চাও?' ভয়ার্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল সে।

'তেমন কোনও ইচ্ছে নেই আমার। কিন্তু একটু আগেই একটা খুন করেছ তুমি, আরেকটা করতে যে ইচ্ছে হবে না, কে বলতে পারে? সাবধানের মার নেই,' জবাব দিল আগন্তুক, পিস্তলটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখছে। 'তা এবার কী করবে? কিছু ভাবলে?'

'কী করব?' প্রতিধ্বনি করল এলফিনস্টোন। কপালে ফুটে উঠেছে চিকন ঘাম। 'আমাকে ধরিয়ে দিয়ো না, দোহাই লাগে,' বলল সে। তারপর হঠাৎ পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পারল। 'তোমার সাহস হবে না,' আগের চাইতে শক্ত গলায় বলল এবার। 'তাতে তুমিও ধরা পড়বে। এই মুহূর্তে যদি আমাদের কেউ দেখে, তা হলে কি ধারণা হবে তার? কে বলবে যে খুনটা তুমি করোনি?'

'কেউ বলবে না, যদি তুমি না বলো।'

'ঠিক বলেছ,' বলল এলফিনস্টোন, স্বস্তির চোটে প্রায় হেসেই ফেলল। বুঝতে পেরেছে, চোরের আগমনে লাভই হয়েছে তার। এখন সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ তার হাতে। সঙ্গে সঙ্গে আগের সাহস ফিরে পেল সে।

'এখানে আমার বেশিক্ষণ থাকা ঠিক হবে না,' বলল এলফিনস্টোন। 'তুমি তো চুরি করতেই এসেছিলে, তাই না? ঠিক আছে, তোমার যা খুশি নিয়ে নাও। বাড়িতে কেউ নেই।'

'সেটা আমি জানি। আসার আগে খোঁজ খবর নিয়েই এসেছি।'

'বেশ। ওই যে, ওখানে বেশ কিছু মূল্যবান পাথর থাকার কথা,' বুককেসের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা মেহগনি কাঠের আলমারির দিকে ইঙ্গিত করল এলফিনস্টোন।

'জানি,' আবার বলল আগন্তুক। 'ওগুলোর জন্যই এসেছি।'

'তা হলে আমি চলে যাই।'

'যাও না, কে আটকাচ্ছে তোমাকে?' আগের মতই নিস্পৃহ গলায় জবাব দিল চোর। 'তোমার জায়গায় আমি হলে এত কথা বলতাম না, কেটে পড়তাম। তোমাকে নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাচ্ছি না। তুমি আমার কাজে বাধা না দিলেই হলো।'

এই কথা বলে আলমারির দিকে এগিয়ে গেল আগন্তুক। আলমারিটা খুলে ফেলল সে, ভেতরে দেখা গেল একটা সিন্দুক। তালাটা

পরীক্ষা করে দেখল, তারপর পকেট থেকে চামড়ায় মোড়ানো বাণ্ডিল বের করল। মেঝেতে রেখে খুলে ফেলল সেটাকে। ভেতরে বেশ কিছু যন্ত্রপাতি। আরেক পকেট থেকে এক গোছা স্কেলিটন কী বের করল, তারপর উপযুক্ত চাবি বেছে নেয়ার কাজে লেগে পড়ল।

এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে লোকটার দক্ষ হাতের কাজ দেখল এলফিনস্টোন। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। 'আমি যাচ্ছি,' দরজার হাতলে হাত রেখে বলল সে। 'কিন্তু আমাকে যদি কেউ ঢুকতে দেখে থাকে? হয়তো বের হতেও দেখবে।'

'তাতে অসুবিধে নেই,' পেছনে না তাকিয়েই জবাব দিল চোর। 'সকালের আগে এই ঘটনা জানাজানি হবে না,' কাঁধের উপর দিয়ে মৃতদেহটার দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'তখন সবাই এটাকে সাধারণ চুরির ঘটনা বলেই ধরে নেবে। আমার কাজও শেষ হয়ে যাবে তার আগেই। তুমি যে এখানে এসেছিলে, এটা গোপন করার দরকার নেই। ঘটনাটা তুমি চলে যাওয়ার পর ঘটেছে এটা বললে কেউ অভিযোগ তুলতে পারবে না। তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ, ভায়া। এখন যাও। শুভরাত্রি!'

'হুম,' জবাব দিল এলফিনস্টোন, তারপর বেরিয়ে পড়ল।

পথে বেরিয়ে ভয়ার্ত চোখে এদিক ওদিক দেখল সে। মনে হলো, একগাদা অনুসন্ধিৎসু চোখ যেন তাকিয়ে আছে তার দিকে। বাড়ির সদর দরজাটা বন্ধ করার সাহস পেল না, পাছে শব্দটা কারও মনোযোগ আকর্ষণ করে। দরজাটা খোলা রেখেই হাঁটতে শুরু করল। কিন্তু মাথাটা ঠাণ্ডা হচ্ছে না, বারবার মনে হচ্ছে কোনও একটা ভুল করেছে, ওই চোরটা হয়তো ফাঁদে ফেলেছে তাকে। মনের চোখে দেখল, কফম্যানকে খুন করার দায়ে ফাঁসিতে ঝোলানো হচ্ছে তাকে। হঠাৎ করে রাতের নীরবতা খানখান করে দিয়ে বেজে উঠল তীক্ষ্ণ একটা শব্দ। চমকে উঠল এলফিনস্টোন।

শব্দটা কোনও এক পুলিশ ইন্সপেক্টরের। হাতের ব্যাটন দিয়ে রাস্তার পাশের খুঁটিতে বাড়ি দিচ্ছে সে, ডিউটিরত কনস্টেবলকে ডাকছে।

এক মুহূর্তের জন্য এলফিনস্টোনের মনে হল, পুলিশগুলো হয়তো তাকেই খুঁজছে। তারপর হঠাৎ বুদ্ধিটা এল তার মাথায়। এখনই সুযোগ! দোষটা আরেকজনের ঘাড়ে চাপানোর মাধ্যমেই কেবল পরিপূর্ণ নিরাপদ হতে পারে সে। ওই চোরটাকে হাতেনাতে ধরিয়ে দিতে হবে পুলিশের কাছে।

শব্দটা লক্ষ্য করে এক দৌড়ে এগিয়ে গেল এলফিনস্টোন। এক মুহূর্ত পর ইন্সপেক্টরের সামনে দেখা গেল তাকে, হাঁপাতে হাঁপাতে ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছে।

'ওই ওদিকে, পার্ক গার্ডেনে,' বলল সে। 'একটা বাড়িতে চুরি হচ্ছে। এক লোককে জানালা টপকে বাড়ির ভেতর ঢুকতে দেখেছি আমি।'

আরও দুই কনস্টেবল এসে যোগ দিল। এলফিনস্টোনকে কয়েকটা প্রশ্ন করল ইন্সপেক্টর, তারপর চারজন মিলে ফিরে গেল ঘটনাস্থলে। বাড়িটা দেখিয়ে দিল এলফিনস্টোন। দরজাটা খোলা দেখে সত্যিই সন্দিহান হয়ে উঠল ইন্সপেক্টর।

'মনে হচ্ছে অনেক দেরি হয়ে গেছে আমাদের,' বলল সে, তারপর দুই কনস্টেবলকে বলল এলফিনস্টোনকে নিয়ে ভেতরে ঢুকতে। নিজে রয়ে গেল রাস্তায়।

পা টিপে টিপে উপরতলায় উঠে এল এলফিনস্টোন আর দুই কনস্টেবল। হুড়মুড় করে স্টাডিতে ঢুকে পড়ল তারা, চমকে দিল চোরকে। দেখা গেল, সিন্দুকটা খুলে ফেলা হয়েছে। মেঝেতে ছড়িয়ে আছে ভেতরের জিনিসগুলো। সেগুলোর মধ্যে ছয়টা কাঁচের বাক্সও দেখা যাচ্ছে। ভেতরে রয়েছে মহামূল্যবান রত্ন। দুই কনস্টেবল চোরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কোণঠাসা করে ফেলল তাকে। কিন্তু খুব একটা বাধা দিল না চোর। এবার চিৎকার করে ইন্সপেক্টরকে ডাক দিল একজন। ওদিকে টেবিলের পাশ দিয়ে এগোতে গিয়ে প্রফেসরের মৃতদেহের উপর প্রায় হোঁচট খেয়ে পড়ল এলফিনস্টোন। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

তার চিৎকার শুনে এগিয়ে এল দুই কনস্টেবল। কাঁপতে কাঁপতে পিছিয়ে গেল এলফিনস্টোন। অভিনয়টা ভালই হচ্ছে, ভাবল মনে মনে। 'এদিকে দেখুন!' বলে উঠল সে,

মৃতদেহটাকে দেখাল হাত দিয়ে। 'মরে গেছে লোকটা! মরে গেছে!'

'খুনিকে অন্তত ধরতে পারা গেছে,' কড়া গলায় জবাব দিল এক কনস্টেবল, হাতকড়া পরিয়ে দিয়েছে চোরের হাতে। এবার আসামীকে সঙ্গীর জিম্মায় রেখে মৃতদেহটা ভাল করে দেখার জন্য এগিয়ে এল।

এবার চোরের দিকে তাকাল এলফিনস্টোন। চোখাচোখি হলো দু'জনের। এত কিছুর পরেও সম্পূর্ণ শান্ত রয়েছে লোকটা। তবে এলফিনস্টোনের দিকে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে ঘৃণায় মুখটা বেঁকে গেল তার। 'তুমি যে এই কাজটা করবে সেটা আগেই বোঝা উচিত ছিল,' শান্ত গলায় বলল সে।

ঘরে ঢুকল ইন্সপেক্টর। 'কী হচ্ছে এখানে?' জানতে চাইল সে।

'খুন!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল এলফিনস্টোন। 'খুন হয়েছে এখানে, ইন্সপেক্টর, ডাকাতি এবং খুন। আর ওই যে, খুনি। একেবারে হাতেনাতে ধরা পড়েছে।'

'খুন করিনি আমি, চুরি করেছি শুধু,' আগের মতই শান্ত গলায় জবাব দিল আসামী।

মৃতদেহের উপর ঝুঁকে পড়ল ইন্সপেক্টর। যে কনস্টেবল দেহটা পরীক্ষা করছিল, তার সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় করল। মাথা দোলাল কনস্টেবল।

'ঘটনা একেবারেই পরিষ্কার,' বলল ইন্সপেক্টর। 'আসামীকে নিয়ে চলো, আর...'

কথা বলতে বলতে প্রথমবারের মত ভাল করে আসামীর দিকে তাকাল সে, এবং থমকে দাঁড়াল।

'মাফ করবেন, স্যর,' দারুণ সমীহ ফুটে উঠেছে গলায়। 'আপনি যে এখানে আছেন জানতাম না। কী হয়েছে, স্যর?' মৃতদেহটার দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'কোনও দুর্ঘটনা?'

'না। খুনই হয়েছে, ওই লোক যেমন বলছে,' এলফিনস্টোনের দিকে ইঙ্গিত করল আগন্তুক। 'এবং সে-ই আসল খুনি। প্রফেসর কফম্যানকে সে-ই খুন করেছে। পর্দার আড়াল থেকে সব কিছু দেখেছি আমি। পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছিলাম ওকে, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি ভুল হয়েছে। চাইনি যে আমার কাজের কথা জানাজানি হোক। তা ছাড়া,' যোগ করল সে, 'বুঝতে পারছিলাম যে খুব তাড়াতাড়ি পুলিশ নিয়ে ফিরবে সে, আমার কাজ অনেকটা কমিয়ে দেবে। নিশ্চয়ই ভেবেছিল যে একটা চোরের কথা বিশ্বাস করবে না পুলিশ।'

'বুঝলাম, মিস্টার স্কট-ড্রামণ্ড। খুব ভাল করেছেন, স্যর,' গলায় সমীহ ঢেলে জবাব দিল ইন্সপেক্টর। দ্রুত এগিয়ে এসে আসামীর হাত থেকে হাতকড়াটা খুলে দিল সে।

এতক্ষণ হাঁ করে সব দেখছিল এলফিনস্টোন। অবশেষে বোধোদয় হলো তার। কিন্তু মুখে কিছুই বলতে পারল না। বার কয়েক কেবল ফিসফিস করে বলল, 'স্কট-ড্রামণ্ড! স্কট-ড্রামণ্ড!'

নিচু হয়ে মেঝে থেকে একটা টিনের কেস তুলে নিল চোর। কনস্টেবলদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করার সময় হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল টিনের বাক্সটা। ওটার মুখ খুলে ফেলতে ভেতরে দেখা গেল কিছু নীল রঙের কাগজ।

'আমাদের সন্দেহ হয়েছিল যে প্রফেসর কফম্যান জার্মান সরকারের গুপ্তচর হিসেবে কাজ করছেন,' বলল সে। 'আমি এসেছিলাম কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় কি না দেখতে। বলা যায় প্রয়োজনের চাইতে অনেক বেশি কিছু পেয়েছি। এখন যেতে হয় আমাকে।'

দুই কনস্টেবলের মাঝে হতচকিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা এলফিনস্টোনের দিকে তাকাল সে এবার। 'ওকে থানায় নিয়ে যান,' ইন্সপেক্টরকে বলল। 'আমি আমার রিপোর্টটা ওখানে পাঠিয়ে দেব। শুভরাত্রি, ইন্সপেক্টর।' ■

যশোরে সেবা প্রকাশনী ও প্রজাপতি প্রকাশনের যে-কোনও বইয়ের জন্য এখানে আসুন।
মেসার্স আনোয়ার আলম ব্রাদার্স
প্রো: এস এম খুরশীদ আনোয়ার
৭ নং মুজিব সড়ক, যশোর।
ফোন নং: ০৪২১-৬৩৬৩৯ মোবাইল: ০১৭১৫-০৬৭০১৬

রেল কারখানায় একদিন

এস. এম. নওশের

প্রচুর অ্যাংলো খ্রীষ্টান এই কারখানায় কাজ করত।

গত ১ মে-র ছুটিতে ভাবলাম কোথাও ঘুরে আসা যাক। কোথায় যাওয়া যায় ভাবছি। হঠাৎ মনে হলো দিনাজপুরের রামসাগরটা দেখা হয়নি। যেই ভাবা সেই কাজ। আমার এক পরিচিতকে জিজ্ঞেস করলাম যার বাড়ি পার্বতীপুর। সে আমাকে সব তথ্য দিল। তখন হঠাৎ মনে পড়ল এর খুব কাছেই তো সৈয়দপুর, যেখানে বাংলাদেশের একমাত্র রেল ওয়ার্কশপ রয়েছে।

তাকে বললাম, 'ভায়া, দিনাজপুর যাবার আগে সৈয়দপুর রেল কারখানা দেখতে চাই। একটু ব্যবস্থা করে দাও।'

ওর আত্মীয় আছেন রেলওয়েতে। তাঁর মাধ্যমেই ওখানকার স্টেশন মাস্টারকে অনুরোধ করে কারখানায় ঢোকার ব্যবস্থা হয়ে গেল। ঢুকেই তাজ্জব হয়ে গেলাম। কী বিশাল কর্মযজ্ঞ! একদিকে গরম লোহা ঢালাই হচ্ছে। অন্যদিকে সেগুলো পিটিয়ে শক্ত করা হচ্ছে। আবার আরেকদিকে পুরানো লোহা গলিয়ে মণ্ড তৈরি করা হচ্ছে। সেই মণ্ড আবার ছাঁচে ঢেলে তৈরি করা হচ্ছে বিভিন্ন খুচরো যন্ত্রাংশ। কথা হলো ওখানকার একটি অংশের ইনচার্জের সাথে। আমি ঢাকা থেকে এসেছি, আবার ফ্রিল্যান্স লেখালেখির সাথে যুক্ত বলে বেশ খুশি মনেই আমাকে অনেক কিছু ঘুরিয়ে দেখালেন। তাঁর কাছ থেকেই জানতে পারলাম এই কারখানায় ট্রেনের বগি তৈরি, মেরামত, সার্ভিসিং এবং ইঞ্জিন ও বগির খুচরো যন্ত্রাংশ তৈরি করা হয়। রেলওয়ে বিদেশ থেকে যে বগিগুলো আমদানী করে সেগুলো এই কারখানাতেই জোড়া দেয়া হয়। ইন্টারসিটি বা আন্তঃনগর ট্রেনগুলোর বগি প্রতি বছর একবার করে এই কারখানায় সার্ভিসিং-এর জন্য আনা হয়। মেইল ট্রেনগুলোর বগি দু'বছরে একবার আসে সার্ভিসিং-এর জন্য।

১৮৭০ সালে প্রথম এই কারখানার গোড়াপত্তন হয়। তখন মিটার গেজ লাইনের ইঞ্জিন মেরামতের কাজ হত। পরবর্তীতে এখানে মিটার গেজ ও ব্রডগেজ দুই লাইনের ট্রেনের বগি

প্রকাশিত হয়েছে

ওয়েস্টার্ন গল্প-সংকলন

হনন

সম্পাদনা: ইসমাইল আরমান

...তাড়া করছে ওরা আমাকে। যে-খুন আমি করিনি, তার দায় আমার ঘাড়ে চাপিয়ে খুঁজছে ওরা। ধরতে পারলে ঝুলিয়ে দেবে ফাঁসিকাঠে। এই বিপদে ছোট্ট এক কিশোরের ওপর ভরসা করছি আমি। ও কি পারবে আমাকে বাঁচাতে?

...যেভাবেই হোক, আউট-ল জ্যাক বেলকে ইউমা-গামী তিনটার ট্রেনে তুলে দেবে বলে পণ করেছে ডেপুটি মার্শাল পল ইভানস্। কিন্তু চাইলেই কি সব হয়, না হয়েছে কখনও?

...ওয়াটারহোল নিয়ে লড়াইরত দুই র‍্যাঞ্চারের মাঝখানে আচমকা ল্যাণ্ড করল একটা ফ্লাইং সসার! কিন্তু কেন? কী চায় ওটার আরোহী?

...পরিত্যক্ত এক মাইনিং ক্যাম্পে, তুমুল তুষারঝড়ের মাঝে আটকা পড়েছে বৈরী তিন আউটফিটের তিন দল রাইডার ও একটি মেয়ে। খুন হয়েছে একজন। খুনি লুকিয়ে আছে ওদেরই মাঝে। কিন্তু কে সে?

এমনই বিচিত্র স্বাদের দশটি কাহিনি নিয়ে এ-বই। আপনার ভাল লাগবে।

দাম ■ একশ' চার টাকা

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম

৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

সংযোজন, মেরামত ও অন্যান্য কাজ শুরু হয়। ১১০ একরের উপরে জায়গা নিয়ে দাঁড়ানো এই ওয়ার্কশপটিতে মোট আটটি শেড বা ছাউনি আছে। আগে এখানে লোকোমোটিভ্ বা ইঞ্জিন মেরামত ও সার্ভিসিং-এর কাজও চলত। পরবর্তীতে স্থান সঙ্কুলানের অভাবে লোকো-ওয়ার্কশপটি পার্বতীপুরে স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে এই কারখানায় স্থায়ী-অস্থায়ী মিলে ছয় হাজারেরও বেশি শ্রমিক কর্মরত আছে। ইংরেজ আমলে প্রতিষ্ঠিত এই ওয়ার্কশপটি ঘিরেই গড়ে উঠেছে নীলফামারী জেলার মধ্যে সৈয়দপুর শহরটি। তখন প্রচুর অ্যাংলো খ্রীষ্টান এই কারখানায় কাজ করত। পরবর্তীতে দেশ ভাগের পর বিহারীরা এখানে শ্রমিকের কাজ নেয়। ইংরেজ আমলে গড়ে ওঠা লাল ইটের কোয়ার্টার বাংলো, ক্লাব, গির্জা এখনও এ শহরটিতে বিদ্যমান। এখানকার একজন ইনচার্জ আমাকে জানালেন দুর্ঘটনা বা অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত একটি বগি মেরামত করে আবার লাইনে নামাতে চার মাসের বেশি সময় লাগে। কিছুদিন আগে জনরোষে পুড়ে যাওয়া দ্রুতযান এক্সপ্রেস ট্রেনটির পোড়া বগিগুলো একটি শেডের নিচে দেখতে পেলাম। মেরামতের অপেক্ষায় পড়ে আছে ওগুলো। এই রেল ওয়ার্কশপটি সরকারের প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করছে প্রতি বছর। অথচ কালের প্রবাহে জীর্ণতা গ্রাস করেছে একেও। অনেক শেডের উপরেই দেখলাম ছাউনি নেই। বৃষ্টি হলে পানি পড়ে। অত্যন্ত ঝুঁকিতে কাজ করা শ্রমিকদের জন্য নেই পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা। ফলে বহু শ্রমিক এখানকার কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। একদা যেখানে তিন শিফটে কাজ হত, এখন কাজ হয় মাত্র দুই শিফটে। এখানকার রেলওয়ের এক নিরাপত্তা প্রহরী জানালেন তাঁর আক্ষেপের কথা। অন্য প্রতিরক্ষা বাহিনীর তুলনায় তাঁদেরকে সুযোগ-সুবিধা তেমন দেয়া হয় না। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও ভাল নয়। অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব পালন করেন তাঁরা। মেলে না ঝুঁকি ভাতা। আমি মনে করি দেশের গুরুত্বপূর্ণ এই রেল কারখানাটির আধুনিকায়নে সরকারের সুদৃষ্টি প্রয়োজন। ■

যাত্রা সমীকরণ

মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ

'কখন বুঝলে যে জন মিলার মিথ্যা বলছে?' রাইলির কাছে জানতে চাইলেন আঙ্কেল লরেন্স।

এক

'অসাধারণ, সত্যি বলছি, এমন ডোনাট এর আগে আর খাইনি,' মুখ ভর্তি পিঠা নিয়ে বলল ডিটেকটিভ রাইলি। সামনে নাফিস হাসান বসা। ওর বড় ভাই নাসিরকে গ্রেফতারের হাত থেকে বাঁচাবার সময় রাইলি অনেক সাহায্য করেছিল। এ ছাড়াও দাবা গ্র্যাণ্ড মাস্টার জ্যাক শেপার্ডের মৃত্যু-রহস্য একসঙ্গে সমাধান করেছিল ওরা দু'জন। সেই থেকে কেন জানি মিসেস হাসানের সুনজর পড়েছে ডিটেকটিভের ওপর। নিজের পরিবারের একজন হিসেবে গণ্য করতে শুরু করেছেন ওকে। বাসায় স্পেশাল কিছু রান্না হলেই পাঠিয়ে দেন।

'সত্যিই, এই ধরনের ডোনাট আগে কখনও খাইনি। এই জিনিস যে এমন হয়, তা-ও জানতাম না,' আরেকটা কামড় বসাতে-বসাতে বলল রাইলি।

হেসে ফেলল নাফিস। জিনিসটা যে ডোনাট নয়, নারকেলের পিঠা তা এই বিদেশিকে এখন কী করে বোঝায়! পণ্ডশ্রম হবে জেনেও চেষ্টা করল একবার। 'এটা কিন্তু ডোনাট না। আমাদের দেশে হরেক রকম পিঠা বানানো হয়। আপনি যেটা খাচ্ছেন, তার নাম "কুশলী" পিঠা।'

'বল কী! হরেক রকম বলতে?' হাতে ধরা পিঠার অবশিষ্ট অংশটুকু মুখে পুরল রাইলি।

'বলে বোঝাবার চাইতে, খাইয়ে বোঝানো সহজ হবে। আম্মুকে বলব, প্রতি সপ্তাহে যেন আপনাকে আলাদা-আলাদা পিঠা বানিয়ে খাওয়ান।'

'ম্যামের কষ্ট হয়ে যাবে না!' রাইলি মুখে বলল বটে, তবে ভাবে মনে হলো পিঠা খাবার জন্য 'ম্যাম'-কে কষ্ট দিতেও সে রাজি।

'আরে, নাহ! আম্মু বরং খুশিই হবেন।' ডিটেকটিভকে নিশ্চিত করল নাফিস। এই মুহূর্তে হ্যাভেন পিডির অফিসে বসে আছে ওরা দু'জন। হ্যাভেন শহরটি বেশ ছোট, অধিবাসী কম। তাদের প্রায় সবাই শান্তশিষ্ট ও ভদ্র স্বভাবের মানুষ। ঝামেলা বলে যে একটা শব্দ আছে, তা শহরের মানুষ ভুলতে বসেছিল। কিন্তু বিশ্বের অন্যান্য জায়গার মত, হ্যাভেন শহরেও ধীরে-ধীরে বাড়ছে অপরাধ প্রবণতা। আশার কথা হলো, এখনও তা হ্যাভেন সিটি পুলিস প্রধান মিস্টার লরেন্স বার্কার এবং তাঁর সুদক্ষ পুলিস বাহিনীর আয়ত্তে আছে। লরেন্স বার্কার আবার নাফিসের বাবা ডা. রেদওয়ান হাসানের বন্ধু। আর তাঁর মেয়ে, সিনথিয়া লরেন্স লেখাপড়া করে নাফিসের সঙ্গেই।

হ্যাভেন সিটির পুলিসের সংখ্যা যথেষ্ট। তবে মাঝে-মাঝে সংখ্যাটা অপ্রতুল হয়ে পড়ে। তখন স্টেশনের সবাইকে কাজে নেমে পড়তে হয়। এমনিতে রাইলি হোমিসাইড ডিটেকটিভ হলেও মাঝে-মাঝে চুরি-ডাকাতির কেসও তদন্ত করে। ক্যাপ্টেন লরেন্স এই যুবক ডিটেকটিভের দক্ষতার ওপর অনেকটাই নির্ভর করেন। রাইলিও বসের এই আস্থার প্রতিদান দিতে মুখিয়ে থাকে।

ক্রিংক্রিং শব্দে বেজে উঠল রাইলির ডেস্ক ফোন, বন্ধ করে দিল দুই অসমবয়সী বন্ধুর গল্প। ঢোক গিলে মুখের পিঠা পেটে চালান করে দিল রাইলি, হাত বাড়িয়ে তুলে নিল রিসিভার, 'রাইলি বলছি।'

পরবর্তী কিছুক্ষণ কেটে গেল হুঁ-হ্যাঁ-এ। নতুন কোনও কেস হবে, মনে-মনে ভাবল নাফিস। জানে, একটু আগ্রহ দেখালেই রাইলি ওকে সঙ্গে নেয়ার ব্যাপারে অমত করবে না। এ কয়দিন রাইলির সঙ্গে সময় কাটিয়ে নিজেও গোয়েন্দাগিরির ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে পড়েছে ও।

'ঠিক আছে, দেখছি,' বলে রিসিভার রাখল রাইলি, চেহারায় চিন্তার ছাপ স্পষ্ট।

'নতুন কোনও কেস?' জানতে চাইল নাফিস।

'হুম।'

'খুন-টুন না তো আবার?'

'নাহ্!' শ্রাগ করল রাইলি।

শব্দটি স্বস্তির পরশ বুলিয়ে দিল নাফিসের শরীরে।

'কেসটা কী, তা বলা যাবে?' জিজ্ঞেস করতে চাইছিল নাফিস। কিন্তু তার আগেই রাইলি হাসতে-হাসতে বলল, 'বুঝেছি, আগ্রহ জন্মেছে খুদে গোয়েন্দার। চলো, যেতে-যেতে বলছি।'

দুই

গাড়িতে উঠে মুখ খুলল রাইলি, 'ডাউন স্ট্রিটের দ্য প্রিন্স বেক শপটা চেনো? একঘণ্টা আগে ওখানে চুরি হয়েছে। বড়-বড় শহরে স্ট্রিট ক্যামেরা থাকে, এমন কী দোকানেও লাগানো থাকে সিসি ক্যামেরা। অপরাধী অপরাধ করে পার পেয়ে যাবে, এমনটা হতেই পারে না। কিন্তু আমাদের শহরটা এখনও অত বড় হয়ে ওঠেনি। যাক সে কথা, একঘণ্টা আগে দ্য প্রিন্স বেকারি শপের ঘটেছে চুরির ঘটনা। স্যর, মানে তোমার আঙ্কেল লরেন্স আমাকে নিজে ফোন করে ওখানে যেতে বলেছেন।'

'কোনও সূত্র পাওয়া গিয়েছে? বা কোনও প্রত্যক্ষদর্শী?' জানতে চাইল নাফিস।

'সমস্যা তো ওখানেই। আছে একজন প্রত্যক্ষদর্শী, অ্যাশলি ফেরার্স নাম। লোকটাকে আমি চিনি, চশমা পরে। দৃষ্টিশক্তি খারাপ, তার ওপর আজকে নাকি চশমাও আনেনি সাথে। বুঝতেই পারছ, কোনও জুরির কাছেই অ্যাশলির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।'

'সে যাই হোক,' বলল নাফিস, 'লোকটা কী বলেছে, তা অন্তত বলুন।'

'বলেছে যে জন মিলারের মত দেখতে এক লোককে বেকারি থেকে দৌড়ে বেরোতে দেখেছে সে। এই জন মিলার লোকটাকেও চিনি, ছিঁচকে চোর। বছর পাঁচেক আগে চুরির দায়ে জেল খাটতে হয়েছিল ওকে। আরও দু'জনকে আহতও করেছিল বলে বেশ প্রচারণাও পেয়েছিল। তবে নিজেকে বাঁচাতে সঙ্গীকে ধরিয়ে দিয়েছিল সে, বিনিময়ে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি ওর শাস্তি হালকা করে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। দু'বছর আগে ছাড়া পেয়েছে। এরপর আর কোনও ঝামেলায় জড়িয়ে গেছে বলে শুনিনি। মনে হয় অ্যাশলি ভুল করেছে।'

'হতে পারে, যা বুঝলাম, তিনি নিজেও তো নিশ্চিত নন,' বলল নাফিস।

'যেহেতু এটা খুনের কেস না...' আচমকা বলে উঠল রাইলি। 'এক কাজ করলে কেমন হয়? এই কেসে তুমিই লিড ইনভেস্টিগেটর। জন মিলারকে জিজ্ঞাসাবাদ করার দায়িত্ব তোমার ওপরেই রইল। দেখো কিছু বের করতে পার কি না।'

অন্য কোনও ব্যাপার হলে এই ধরনের লোভনীয় অফার লুফে নিত নাফিস। কিন্তু এটা পুলিসি মামলা। ইতস্তত করতে লাগল ছেলেটা।

'আরে, টেনশন কোরো না। আমি তো আর তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি না। পাশেই থাকব। আগে তুমি প্রশ্ন করো, এরপর যদি কিছু বাকি থাকে, তো আমিই জিজ্ঞেস করব'খন।'

মনে-মনে উত্তেজিত হয়ে গেল নাফিস। এর আগে আরও দুটো কেসে ডিটেকটিভ রাইলির সঙ্গে কাজ করেছে ও। কিন্তু 'লিড ইনভেস্টিগেটর' শব্দদুটি কেন যেন বাড়তি উদ্দীপনা সৃষ্টি করছে। তবুও সায় দিতে সাহস পাচ্ছে না।

'আরে, অনেক ভদ্রতা দেখানো হয়েছে,' বলল রাইলি। 'আমি তো ভাবছি বসকে বলে সামার ভ্যাকেশনের সময় তোমাকে আমাদের ভলান্টিয়ার বানিয়ে নেব।'

ডিটেকটিভের ছোঁয়াচে উত্তেজনাটুকু নিজের মাঝেও অনুভব করল নাফিস। হেসে ফেলল, 'অবশ্যই।'

তিন

বেশ কিছুক্ষণ পরের কথা। শহরের প্রায় শেষপ্রান্তের একটা রঙচটা ছোট্ট সাদা বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামাল রাইলি। বাড়িটা দোতলা, সামনে খোয়া বিছানো ড্রাইভওয়ে। একটা পুরাতন হলুদ রঙা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে ড্রাইভওয়ের মাথায়।

'ওটার মালিক আমাদের সন্দেহভাজন, জন মিলারের বড় বোন,' বলল রাইলি। 'জেল থেকে ছাড়া পাবার পর থেকে জন ওর বোনের সাথেই থাকে। আসলে একবার পুলিসের খাতায় নাম উঠলে আর রক্ষা নেই। এই মিলারের কথাই ধরো, শহরে কোনও চুরির ঘটনা ঘটলেই পুলিস আগে মিলারের খোঁজ করে। ওই যে...' ড্রাইভওয়েতে এক লোককে বেরিয়ে আসতে দেখে সেদিকে ইঙ্গিত করল ডিটেকটিভ। 'ওই লোকটাই জন মিলার।'

রাইলির নির্দেশিত দিকে তাকাল নাফিস। মধ্য ত্রিশের লোকটা এক বাচ্চাকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাচ্চাটা একদম ছোট, বছর দেড়েক হবে বয়স। শুধু হাফ প্যান্ট আর গেঞ্জি পরিয়েই ওকে বাইরে নিয়ে এসেছে জন। পায়ে এমন কী জুতো পর্যন্ত নেই!

'মনে রেখ, লিড ডিটেকটিভ, প্রশ্ন যা করার তোমাকেই করতে হবে,' গাড়ি থেকে নামতে-নামতে বলল রাইলি।

নড করল নাফিস, চোখমুখ শক্ত হয়ে গিয়েছে।

'বাচ্চাটাকে কোল থেকে নামিয়ে রাখো,' জনের কাছে গিয়ে বলল রাইলি। 'হাত স্থির, আমার চোখের সামনে যেন থাকে।'

আঁতকে উঠে খোয়া বিছানো ড্রাইভওয়েতেই বাচ্চাটাকে নামিয়ে দিচ্ছিল জন। কিন্তু বাচ্চাটার পায়ে জুতো নেই, মত পাল্টাল সে। একটু এগিয়ে পুরনো গাড়িটার সামনের ফেণ্ডারে বসিয়ে দিল ওকে। কালক্ষেপণ না করে হাত তুলে ফেলল মাথার উপর।

'ব্যাপারটা কী, অফিসার?' জানতে চাইল সে।

'চুরি,' বলল রাইলি। 'এ হচ্ছে নাফিস, আমাদের ভলান্টিয়ার। এর সব প্রশ্নের উত্তর দাও।'

নাফিসের দিকে একবার তাকাল জন মিলার, কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল। শ্রাগ করল শুধু। হয়তো ভাবল, দুঁদে গোয়েন্দার জায়গায় একটা বাচ্চার প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়াই সহজ হবে।

'ঘণ্টাখানেক আগে, ডাউন স্ট্রিটের দ্য প্রিন্স বেকারি শপে চুরি হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীর মতে, আপনাকে সেসময় বেকারির দরজা দিয়ে বেরোতে দেখা গিয়েছে। রেজিস্টার থেকে প্রায় হাজার ডলারের মত নিয়ে গিয়েছে চোর।'

হেসে ফেলল জন মিলার, 'ঘণ্টাখানেক আগে? ভুল দেখেছে আপনাদের প্রত্যক্ষদর্শী। আমি আজ সারাদিন একবারও ডাউন স্ট্রিটের ধারে কাছেও যাইনি। আসলে হয়েছে কী, আজ সারাদিন...'

'সাবধান!' চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে নাফিস আর মিলারের কথা শুনছিল রাইলি। আচমকা চিৎকার করে উঠে লাফ দিয়ে এগোল গাড়িটার দিকে।

বাচ্চাটা সবার অলক্ষে ফেন্ডার বেয়ে হুডে উঠে এসেছে। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাসছিল আর অন্য সব বাচ্চাদের মত মুখ দিয়ে অর্থহীন সব শব্দ উচ্চারণ করছিল। হঠাৎ টাল-মাটাল পায়ে হুডের প্রান্তের দিকে এগিয়ে আসে, পড়েই যাচ্ছিল আরেকটু হলে, কিন্তু কপাল ভাল, রাইলির নজরে পড়ে গেছে ব্যাপারটা। এগিয়ে গিয়ে বাচ্চাটাকে ধরে ফেলেছে সে, নইলে বড় ধরনের কোনও দুর্ঘটনা ঘটতে পারত।

'অনেক ধন্যবাদ, অফিসার,' বাচ্চাটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল জন মিলার। 'আমার ভাগ্নে। আপনার আপত্তি না থাকলে, হাত নামাই? বাচ্চাটা চঞ্চল, কোলছাড়া করার সাহস পাচ্ছি না।'

'থাক, আমার কোলেই থাক,' বলল রাইলি। 'তুমি বরং নাফিসের প্রশ্নের উত্তর দাও।'

নড়ে উঠল নাফিস, 'আপনি কিছু একটা বলতে চাচ্ছিলেন, সারাদিন...'

'আপনাদের প্রত্যক্ষদর্শী হয় ভুল দেখেছে,' রাগতস্বরে বলল জন মিলার, 'নয়তো ভুল বকছে। আমি ওই শপের ধারে কাছেও যাইনি।'

'তা হলে ছিলেন কোথায়?'

'হ্যাভেন সিটিতেই ছিলাম না, সানডেলে গিয়েছিলাম। সকাল আটটা থেকে একটানা গাড়ি চালিয়েছি। সানডেল থেকে ফিরছিলাম। আপনারা আসার মাত্র পাঁচ মিনিট আগে ফিরেছি। সানডেল কোথায়, তা নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না?'

হাতঘড়ির দিকে তাকাল নাফিস। স্কুলের পর বাড়িতে ফিরে শুধু হাতমুখ ধোয়ার সময় পেয়েছিল ও। এরপরই স্টেশনে আসতে হয়েছে পিঠা নিয়ে। 'না, সানডেল কোথায় তা বলে দিতে হবে না, চিনি আমি। তা হলে দাঁড়াচ্ছে, আপনি বারো ঘণ্টায় প্রায় পাঁচ শ' মাইল গাড়ি চালিয়ে এসেছেন।'

নড করল জন মিলার।

'চুরি হয়েছে ছয়টার কিছুক্ষণ পর। তখন আপনি কোথায় ছিলেন? কোনও অ্যালিবাই আছে? বা আপনাকে দেখেছে, আপনার সাথে কথা বলেছে এমন কেউ?' জানতে চাইল নাফিস।

'ছয়টার দিকে?' কিছুক্ষণ ভাবল জন, 'নাহ, ওসময়ে তো রাস্তায় ছিলাম। চারটার দিকে গ্যাস নেবার জন্য একটা স্টেশনে থেমেছিলাম বটে, কিন্তু ব্যস্ত ছিল স্টেশনটা, কেউ আমাকে মনে রেখেছে বলেও মনে হয় না। এরপর আর কোথাও থামিনি। একটানা গাড়ি চালিয়েছি,' আড়চোখে একবার রাইলির দিকে তাকাল, 'তবে স্পিড লিমিট ভঙ্গ করিনি। আচ্ছা, এই প্রত্যক্ষদর্শীটা কে, জানতে পারি?'

'মিস্টার অ্যাশলি ফেরার্স সম্ভবত। তাই না?' রাইলির দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল নাফিস।

রাইলি নড করে জানাল, ও ভুল করেনি।

'অ্যাশলি?' হাসিতে যেন ফেটে পড়ল জন। 'ওকে তো আমি চিনি। চশমা পরে, তারপরও দুই হাত দূরের জিনিসও ঠিকমত দেখতে পায় না। ও কি নিশ্চিত করে বলেছে যে আমাকেই দেখেছে?'

মুখ কুঁচকে ফেলল নাফিস ও রাইলি।

রাইলির কাছ থেকে উত্তরটা এল, 'না।'

'তা হলে বুঝতেই পারছেন।' আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে জবাব দিল জন মিলার।

শ্রাগ করল নাফিস। লোকটার গল্পের ফাঁক-ফোকর ওর নজর এড়ায়নি। কিন্তু প্রমাণ যে নেই! কোর্টে কোনও কিছু প্রমাণ করতে চাই নিরেট প্রমাণ, অন্তরাত্মার কথা ধোপে টিকবে না। রাইলি ভাইকে লোকটার ব্যাপারে আরও খোঁজ নিতে বলতে হবে, মনে-মনে ভাবল নাফিস।

'মিলার, তোমার স্টেটমেন্ট দরকার হবে,' বলল রাইলি, 'বাচ্চাটাকে ভেতরে রেখে এখনি চলে এসো। আমাদেরও সুবিধা, তোমারও।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলো জন মিলার। জেল খাটা আসামী সে, তা-ও কি না ছিঁচকে চুরির দায়ে। পুলিসের বিরাগভাজন হবার বিপদটা সে ভাল করেই জানে।

জন মিলার চলে যেতে, নাফিসের দিকে ফিরল রাইলি। জিজ্ঞেস করল, 'কী বুঝলে?'

'প্রমাণ তো নেই হাতে। নিরপেক্ষভাবে দেখলে তো লোকটাকে নির্দোষ বলেই মনে হয়।'

'তাই নাকি?' হাসতে-হাসতে বলল রাইলি। 'বুড়ো খোকাও তা হলে ভুল করে!'

'বুড়ো খোকা! কে এই বুড়ো?' অবাক স্বরে জানতে চাইল নাফিস, 'আর ভুলটাই বা হলো কোথায়?'

'তোমাকে এখন থেকে বুড়ো খোকা বলেই ডাকব ভাবছি,' উত্তরে রাইলি বলল। 'আর যে ভুল করেছ, তা হলো, মিলারের বিরুদ্ধে প্রমাণ আছে। অবশ্য, আছে না বলে ছিল বলাই ভাল। তোমার চোখের সামনেই ছিল। এইমাত্র বাড়িটায় ঢুকে পড়ল।'

'বাড়িটায় ঢুকে পড়ল!' বিস্ময় যেন কাটছে না নাফিসের। 'কিন্তু তার মানে...' আচমকা উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর কালো চোখজোড়া।

এদিকে জন মিলার এরই মাঝে ওদের কাছে ফিরে এসেছে। কাছে আসা মাত্র রাইলি পকেট থেকে হাতকড়া বের করে পরিয়ে দিল ওর হাতে। এরপর নাফিসের দিকে ফিরে হাসল, 'বাচ্চাটা হাসছিল।'

নড করল নাফিস, বুঝতে পেরেছে।

চার

জন মিলারকে পাকড়াও করে হ্যাভেন সিটির পুলিস স্টেশনে নিয়ে এল ওরা দু'জন। হালকা জিজ্ঞাসাবাদ করতেই সব স্বীকার করে নিল লোকটা। অবশ্য আগেরবারের মত এবারও ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির দেয়া প্রস্তাবটা ওর পক্ষেই গেল। চুরির টাকা ফিরিয়ে দিলে ওকে হালকা সাজা আর মিনিমাম সিকিউরিটি প্রিযনে রাখা হবে, ডিএ-এর দেয়া এই শর্ত মেনে নিল সে।

নাফিস আর রাইলি এ মুহূর্তে চিফের অফিসে বসে আছে। তিনজনের হাতেই এখন মিসেস হাসানের পাঠানো কুশলী পিঠা।

'তা হলে আমাদের খুদে গোয়েন্দা রাইলির কাছে হার মেনেছে?' হাসতে-হাসতে বললেন লরেন্স বার্কার। তাঁর চেহারায় ফুটে ওঠা আমুদে ভাবখানা দেখে অন্য দু'জনও না হেসে পারল না।

'হার মানছি, আসলেই বুঝতে পারিনি,' বলল নাফিস।

'নিজেকে এত দোষ দিয়ো না। তোমার শখ যদি আমার মত হত, তা হলে ঠিকই ধরতে পারতে,' সান্ত্বনা দিল রাইলি।

'কখন বুঝলে যে জন মিলার মিথ্যা বলছে?' রাইলির কাছে জানতে চাইলেন আঙ্কেল লরেন্স।

'বাচ্চাটাকে ধরলাম যখন, তখনও বুঝতে পারিনি,' বলল রাইলি। 'মিলারের ভাষ্যমতে আমরা উপস্থিত হবার মাত্র পাঁচ মিনিট আগে বোনের বাড়িতে পৌঁছেছে সে। এর আগে প্রায় আড়াই-তিন ঘণ্টা টানা গাড়ি চালিয়েছে। যদি ওর

পুনঃপ্রকাশিত হচ্ছে
কিশোর থ্রিলার
তিন গোয়েন্দা
ভলিউম-২১
রকিব হাসান

হ্যালো, কিশোর বন্ধুরা–আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বীচ থেকে। জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলিসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে, হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।যারা এখনও আমাদের পরিচয় জান না, তাদের বলছি, আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি, নাম তিন গোয়েন্দা। আমি বাঙালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে। দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর, আমেরিকান নিগ্রো; অন্যজন আইরিশ আমেরিকান, রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা। একই ক্লাসে পড়ি আমরা। পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নীচে পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার। তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি–এসো না, চলে এসো আমাদের দলে।

দাম ■ একশ' টাকা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

কথা সত্য হত, তা হলে গাড়িটার হুড আগুনের মত গরম থাকত। অথচ বাচ্চাটার পা ছিল খালি। সেই খালি পা নিয়েই হুডের উপর দাঁড়িয়ে হাসছিল! তাই সন্দেহ হয়েছিল আমার।'

'হুম,' নড করলেন লরেন্স বার্কার। রাইলি আরেকবার তাঁর আস্থার প্রতিদান দিয়েছে। নাফিসের দিকে ফিরে বললেন, 'তা, নাফিস, পুলিস ডিটেকটিভ কীভাবে ভাবে, কীভাবে কাজ করে তা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ?'

'জী, স্যর,' জবাব দিল নাফিস।

'স্যর,' বসের দৃষ্টি আকর্ষণ করল রাইলি। 'বলছিলাম কী, সামনে তো সামার ব্রেক আসছে। আমি চাই এই সময়টা নাফিস ভলাণ্টিয়ার হিসেবে স্টেশনে কাজ করুক। অবশ্যই যদি আপনি অনুমতি দেন তবে।'

'হুম।' শক্ত হয়ে এল চিফের চেহারা। নাফিসের মনে হচ্ছিল, বুঝি তিনি সাফ মানা করে দেবেন!

'তুমি কি আগ্রহী?' নীরবতা স্নায়ুর ওপর খুব বেশি চাপ ফেলার আগেই জিজ্ঞেস করলেন লরেন্স বার্কার।

'জী।' তীব্র উত্তেজনা আর আগ্রহ নাফিসকে শুধু এই একটা শব্দ উচ্চারণ করার অনুমতি দিল।

'বেশ কিছু নিয়ম ভাঙতে হবে। আবার কিছু নিয়ম বানাতেও হবে। তোমার আব্বু-আম্মুর অনুমতিও নিতে হবে, নিরাপত্তার ব্যাপারটাও আছে। তবে ওসব রাইলি সামলাতে পারবে। পারবে না, রাইলি?'

'পারব, স্যর,' হাসিমুখে জানাল রাইলি।

'তবে,' নাফিসের দিকে তাকিয়ে বললেন চিফ। 'আমার একটা শর্ত আছে। একেবারে অলঙ্ঘনীয়।'

চুপসে গেল নাফিসের মুখ। ভাবছে, না জানি কী শর্ত দিয়ে বসেন। 'বলুন, আঙ্কেল।'

'আমাদেরকে নিত্য নতুন পিঠা খাওয়াতে হবে,' হাসতে-হাসতে বললেন আঙ্কেল লরেন্স। 'পারবে না?'

হেসে ফেলল নাফিসও। 'তথাস্তু।' ■

(বিদেশি গল্প অনুকরণে)

জিন দেখা

নাজমা সুলতানা

সেই খোকন যখন জিন নামাবে বলছে, তখন তার কথায় বিশ্বাস রাখতেই পারেন মহিলারা।

'ও, দীপালীর মা, খবর হুনসনি? অলি মিয়ার বাড়িত বলে আইজ সন্ধ্যায় জিন নামাইব।'

রতনের বউয়ের চিৎকারে দীপালীর মা সহ আর বউ-ঝিরা ছুটে আসেন। সবার মুখে প্রশ্ন: 'কেমনে জিন নামাইব? জিন কি চোখে দেহা যায়? কেডা নামাইব?'

'আরে, মুসলমান ধর্মে আছে না, কেমনে সুরা কালাম পইড়া জিন নামাইয়া আনে,' উত্তর দেয় রতনের বউ।

'তয়, কাকী, তুমি হুনলা কার কাছে?' প্রশ্ন করে দীপালী।

'খাওয়ার পানি আনবার লাগি অলি মিয়ার বাড়িত গেলে হের বড় পোলার বউ কইল: কাকী, সইন্ধ্যায় আইসো, আমাগো বাড়িত মজার ঘটনা হইব। জিন নামাইব আমাগো বাড়ির উঠানে।'

মহিলাদের মধ্যে জিন নিয়ে নানা গুঞ্জন শুরু হলো।

কেউ বললেন, 'আরে ওইবার ওমর আলীর বউয়েরে জিনে ধইরা কী ঘটনাই না অইল! একটুখানি ছোড বউ অথচ শক্ত সামর্থ্য চার-পাঁচজন জোয়ান লোকেও তারে ধইরা রাখবার পারে না।'

'আর ধান খেতের কামলারা না দেখলে ওই দিন বদজিনটা হামিদার ভাইয়েরে খালের পানিতে চুবাইয়াই মারত! তয়, ও, রতনের বউ, জিন নামাইব কেডায়?' প্রশ্ন করেন শিখার মা।

'আরে, মাস্টারের পোলা খোকন আছে না, হে বলে নামাইব,' উত্তর দেয় রতনের বউ। 'শুধু মহিলাগোরে যাইবার কইছে, কোনও পুরুষ পোলাপাইন যাইতে পারব না।'

খোকনের নাম শুনে প্রায় সবাই বলে ওঠে: 'হ, পোলাডা বালা। মিছা কথা কইব না। ছোট-বড় সবার লগে কত সুন্দর কইরা কথা কয়।'

এই গ্রামেরই নামকরা স্কুল-মাস্টার লতিফ মাস্টার। সাচার বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী হেডমাস্টার হিসাবে আছেন। অঙ্কের

শিক্ষক হিসাবে খুব নাম তাঁর। সেই শিক্ষকেরই বড় ছেলে খোকন। বাড়িতে মায়ের কাছে থাকলে ছেলে বখে যাবে, তাই নিজের কাছে রেখেই তাকে পড়াশোনা করান লতিফ মাস্টার।

সাচার কলেজের ইন্টারের ছাত্র খোকন। পনেরো দিন পর বা মাসে একবার বাড়িতে মায়ের কাছে আসে। বাড়িতে এলেই আশপাশের দুই-তিন বাড়ির চাচী-দাদীদের খোঁজ-খবর নেয়। ভাবী সম্পর্কিতদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করে। মাঝে-মাঝে নিজের হাতখরচের টাকা বাঁচিয়ে গরিব মহিলাদের সাহায্য করে। মোট কথা, গ্রামের সবাই খুব পছন্দ করে তাকে। সেই খোকন যখন জিন নামাবে বলছে, তখন তার কথায় বিশ্বাস রাখতেই পারেন মহিলারা।

সন্ধ্যার পর। অলি মিয়ার উঠানে গম-গম করছে মহিলারা। দিনের আলো মেলানোর সঙ্গে-সঙ্গে স্বামী-সন্তানদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা শেষ করেছে তারা। কোলের বাচ্চাদের আজ কয়েক ঘণ্টার জন্য দিয়ে এসেছে তাদের বাবাদের কোলে।

সারাদিন নানা কাজ করে গ্রামের এই মহিলারা সাধারণত কোনও আনন্দ-উৎসবে ভাগী হতে পারে না। তাই আজ এই মজার ঘটনা দেখার জন্য সবাই খুব উৎসাহিত হয়ে আছে।

এশার নামাজের পর খোকন এসে হাজির হলো অলি মিয়ার উঠানে। বার-বার বলল, 'বৃদ্ধা দাদীরা-জেঠিরা সরে যান, নতুবা আপনারা ভয় পাবেন।'

কেউ কেউ সরে গেলেও ভয় পাবে না বলে সাহস করে অনেকেই রয়ে গেল।

শুরু হলো খোকনের জিন আনার কার্যক্রম। মুখে বিড়বিড় করে দোয়া পড়ছে আর উঠানের এমাথা থেকে ওমাথা ছুটে যাচ্ছে। জোরে-জোরে হাততালি দিল আর চিৎকার করে বলল, 'ডানে নয়, বামে আয়! উত্তরে যাবি না! সোজা এই বাড়ির উঠানে আয়!' ইত্যাদি ইত্যাদি।

মেয়েরা কিছুটা ভয়ে-ভয়ে আছে।

কিছুক্ষণ হৈ-হুল্লোড় করার পর হঠাৎ খোকন বলে উঠল, 'কুপি, হারিকেন নিভিয়ে ফেলেন! ওদের আসার সময় হইছে! আলো দেখলে ওরা আসতে চাইবে না! আর নেন, আমি যখন বলব, তখন দোয়া পড়ে এই কৌটাগুলো থেকে সরিষার তেল চোখে-মুখে মাখবেন! তা হলে ভয় কম পাবেন!' এই বলে কতগুলো তেলের কৌটা মহিলাদের সামনে এনে দিল খোকন।

নিভিয়ে দেয়া হলো সব বাতি। পুরো উঠানে অন্ধকার। আকাশে চাঁদ নেই। পরিষ্কার আকাশে তারাদের ঝিলমিল। পাশাপাশি দু'জন মহিলাও আরেকজনকে দেখতে পাচ্ছে না। সবার মুখ বন্ধ।

এক শিহরিত সুনসান নীরবতা চারদিকে।

সমানে শুধু ঝিঁঝিঁ পোকাদের ডাক শোনা যাচ্ছে।

মহিলারা যেন নড়াচড়া করতেও ভুলে গেছে।

এক ভুতুড়ে পরিবেশের মধ্যে হঠাৎ উঠানের বড় মেহগনি ডালগুলো সজোরে ঝুপ-ঝুপ শব্দে নড়তে লাগল।

ভয়ে মহিলারা একে অন্যকে জড়িয়ে ধরল।

খোকন আরও উচ্চস্বরে বলতে লাগল: 'ওরা এসে পড়েছে! আপনারা তাড়াতাড়ি যে যা পারেন দোয়া-দরূদ পড়ে চোখে-মুখে তেল মাখুন! ভালভাবে মাখুন!'

সবাই সমানে দোয়া পড়ছে আর মুখে তেল মাখছে।

হঠাৎ টিনের চালে ধুড়ুম-ধুড়ুম ঢিল পড়তে

আলহাজ্ব মোঃ ইসহাক
চট্টগ্রাম
এখানে মাসিক রহস্যপত্রিকা বিক্রি করা হয়
মোবাইল: ০১৮২৩-২২৭২৫৬, ০১৭১৯-২২৮৮১০
ফোন: ২৫৫৪৭৭

লাগল।

উঠানে চারপাশে থপ-থপ পায়ের শব্দ!

উঠানের দিকে এগিয়ে আসছে যেন কেউ!

খোকন সমানে চেঁচিয়ে বলছে: 'আপনারা ভালভাবে তেল মাখতে থাকেন, ভয় পাবেন না। ওরা এসে পড়েছে! কিছুক্ষণ পরই ওদেরকে আপনাদের সামনে বসাব!'

আরও দশ-পনেরো মিনিট চেঁচামেচির পর খোকন বলে উঠল, 'এবার আলো জ্বালান! চোখ খুললেই দেখবেন ওরা আপনাদের সামনে বসে আছে!'

সঙ্গে থাকা দিয়াশলাই কাঠি দিয়ে সবাই কুপি জ্বেলে নিল।

আর সবাই একসঙ্গে 'ভূত' 'ভূত' বলে চিৎকার করতে লাগল।

প্রত্যেকেই পাশের মহিলাদের চেহারায় ভূতের ছবি দেখছে!

হই-চই শুনে এগিয়ে এল পুরুষেরা। বাড়ির মহিলাদের চেহারা দেখেই ওরা বুঝে ফেলে জিন দেখার ফাঁকিবাজি।

আলো ফেলে তেলের কৌটাগুলো দেখল তারা। আসলে ওসব কৌটাতে সরিষার তেলের সঙ্গে মাটির চুলায় রান্না করার কড়াই ও পাতিলের কালি গুলে রাখা হয়েছে।

মহিলারা যখন নিজ-নিজ চোখে-মুখে ওই কালি মেখেছে, তখন তাদের চেহারা সত্যিই হয়ে উঠেছে ভূতের মত!

আর জিন নামাবার পরিকল্পনা হিসাবে খোকন তার ছোট ভাই ও তার বন্ধুদের কাউকে বাড়ির মেহগনি গাছে তুলে চারপাশের ঘরের চালে ঢিল ছুঁড়তে বলেছে! সেই সঙ্গে ছিল জোরে-জোরে পদশব্দ তৈরি করা! সব বুদ্ধি আগেই এঁটে রেখেছিল খোকনের দল!

কাজ শেষ করেই ছোট ভাই ও বন্ধুদের নিয়ে ভেগে গেছে নিরীহ খোকন!

মহিলারা ঘটনা বুঝতে পেরে রেগে আগুন হয়ে গেল।

সবাই খুঁজতে লাগল খোকনকে!

কিন্তু কোথায় খোকন?

সে অলি মিয়ার উঠান থেকে দৌড়ে সোজা বাস স্টেশন, তারপর সোজা সাচার। সাত মাসেও সে আর বাড়িমুখো হয়নি! ■

প্রকাশিত হয়েছে
অনুবাদ
রাফায়েল সাবাতিনি-র
দ্য সোর্ড অভ ইসলাম
রূপান্তর: সাইফুল আরেফিন অপু

পনেরো শতকের জেনোয়া। ক্ষমতা দখলের আন্তর্জাতিক রাজনীতি চলছে সেখানে। অস্থির রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের বলি হলো প্রসপেরোর বাবা অ্যান্টোনিওট্টো। এজন্য দায়ী অ্যাডমিরাল আন্দ্রে ডোরিয়া। পিতৃহত্যার প্রতিশোধের শপথ নিল পুত্র... এদিকে স্প্যানিশ সম্রাটের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তুর্কি নৌবাহিনীর কমাণ্ডার দ্রাগুত রেইজ। ডোরিয়ার উপরে দায়িত্ব: যে-কোনও মূল্যে দমন করতে হবে দ্রাগুতকে। পাকেচক্রে প্রেমিকা জিয়ান্না সহ দ্রাগুতের হাতে বন্দি হলো প্রসপেরো। এ অবস্থায় পারবে কি সে শপথ রক্ষা করতে?

দাম ■ একশ' উনষাট টাকা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
mail: alochonabibhag@gmail.com
শো-রুম
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

কন্ট্রোলার

প্রান্ত ঘোষ দস্তিদার

'কী সুন্দর হ্যাক করে দুনিয়াদারির গোপন তথ্য ফাঁস করে দেয়। এতে করে তো সমাজের উপকার।'

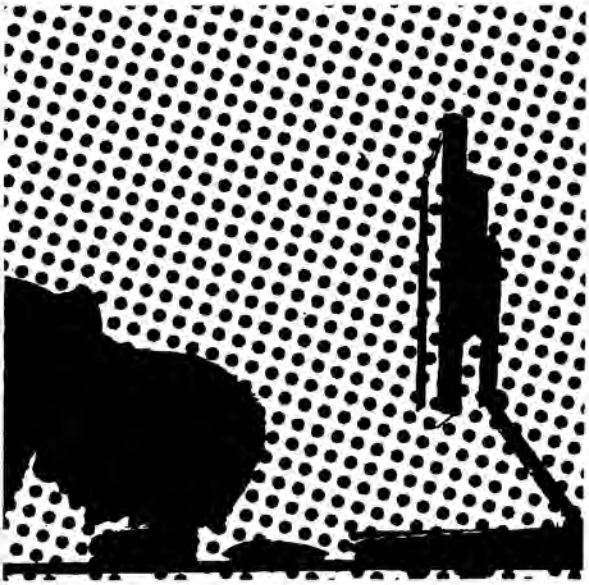

অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ক্লাস নিচ্ছেন রওশন সাহেব। ভদ্রলোকের জোড়া ভুরু কাঁচাপাকা, ইয়া মোটা গোঁফটা পুরো সাদা। চুলের রঙ প্রান্তদেশে আকাশী নীল। পুরোপুরি কালার করেননি, একটা শেড আনার চেষ্টা করেছেন কেবল।

'তোমরা জানো?' বললেন তিনি, 'বর্তমানে একদল লোক আছে যারা নিজেদের হ্যাকার বলে। তারা কিন্তু সমাজের শত্রু।'

পেছন থেকে হাত তুলল রোগা-পাতলা এক ছেলে। সব বিষয়ে পাশ করা ওর ধাতে নেই, তবে পরীক্ষায় বসে প্রতি সেমিস্টারে। রফিক নাম ওর।

রওশন সাহেব অনুমতি দিতেই রফিক প্রশ্ন করল, 'স্যর, সমাজের শত্রু কেন হবে? আমার তো মনে হয় বন্ধু।'

'কীভাবে বন্ধু?' জানতে চাইলেন রওশন সাহেব। কপাল কুঁচকে গেছে তাঁর বিরক্তিতে।

'কী সুন্দর হ্যাক করে দুনিয়াদারির গোপন তথ্য ফাঁস করে দেয়। এতে করে তো সমাজের উপকার। এই যেমন ধরুন, যুক্তরাষ্ট্র কোনও ষড়যন্ত্র করল। ব্যস, ওদের সাইট হ্যাক করে দিল সব বিশ্ববাসীকে জানিয়ে। কিংবা ধরুন, একটা সাইটে অ্যাক্সেস সম্ভব হচ্ছে না, হ্যাক করে ঢুকে গেলেন সেখানে। তথ্য উন্মুক্ত হলো। এটা তো ভাল, তাই না?'

'উঁহুঁ,' অসম্মত হলেন কম্পিউটার শিক্ষক। 'মোটেই ভাল না। মনে করো তোমার ব্যাংকে তিন কোটি টাকা আছে,' বলে চললেন তিনি। চোখ বড়-বড় করল রফিক। তিন কোটি টাকা! তা-ও আবার ওর ব্যাংকে? মনে করতেও কষ্ট হচ্ছে। ওর অবস্থা নুন আনতে পান্তা ফুরায় ধরনের। 'এবারে এক হ্যাকার বন্ধু এসে তোমার অ্যাকাউন্ট থেকে এক কোটি বের করে নিয়ে গেল। তা হলে কি কাজটা ভাল হলো?'

খুশি হয়ে গেল রফিক, 'স্যর, আমার দুই কোটির বেশি লাগবে না! বাকিটা নিয়ে নিক সমস্যা নাই।'

হাসির রোল পড়ল ক্লাসে। মেজাজ খিঁচড়ে গেল রওশন সাহেবের। 'তোমাদের কিছুই বোঝানো সম্ভব নয়। এক কাজ কর, আজকে থেকে তোমাদের ক্লাস তোমরাই নাও। আমি তোমাদের ক্লাস আর নেব না।'

সবাই প্রতিবাদ করল।

আর এমন হবে না!

কেন, ক্ষমা করে দিন!

এসবে কান দিলেন না রওশন সাহেব। হোয়াইট বোর্ড মার্কারটা টেবিলে শুইয়ে রেখে গটগট করে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। রাগে মাথা ভোঁ-ভোঁ করছে তাঁর। ইচ্ছা হচ্ছে এক চড়ে শুইয়ে দেন স্টুপিড রফিকটাকে। কিন্তু সে উপায় নেই। শিক্ষক হিসাবে বহু নীতি মেনে চলতে হয় তাঁকে। ছাত্র বেয়াদবি করলেও গায়ে হাত তোলার নিয়ম নেই অ্যাণ্ডারগ্র্যাজুয়েট লেভেলে।

একটা রিকশা থামিয়ে চড়ে বসলেন রওশন সাহেব। রিকশাওয়ালা গুনগুন করে গান গাইছে। 'ও রে, সাম্পানওয়ালা, তুই আমারে করলি দেওয়ানা...'

মিষ্টি সুর গানের। কিন্তু রিকশাওয়ালা সাম্পানের গান গাইবে এটা কেমন কথা! ঘাড় ঘুরিয়ে অন্যদিকে মনোযোগ দেবার চেষ্টা করলেন তিনি। দূর আকাশে মেঘের ঘনঘটা, বৃষ্টি আসতে পারে। ছাতা আনেননি তাড়াহুড়োয়। ওটা পড়ে আছে পার্সোনাল কেবিনের ডেস্কে। প্রফেসর লেভেলে পৌঁছার পর আলাদা ঘর হয়েছে তাঁর। এখন ঝামেলা কম। আগে ভার্সিটিতে অন্য টিচারের সঙ্গে রুম শেয়ার করতে হত। প্রাইভেসি ছিল না। তা ছাড়া, সময়ে অসময়ে স্টুডেন্টরা এসে ঘ্যানর-ঘ্যানর করত, কিছু বলাও যেত না, সহ্যও করা যেত না। এখন অনেকটা শান্তি।

কিছু দূর যেতেই রাস্তার মাঝে নষ্ট এক ট্রাক দেখলেন। সরু রাস্তা, ওটাকে পাশ কাটিয়ে রিকশা যাবার জায়গা নেই। রিকশাওয়ালা ঘাড় ঘুরিয়ে রওশন সাহেবের দিকে করুণ চোখে চাইল, অনুরোধ স্পষ্ট, নেমে হেঁটে গেলে খুশি হব।

পাত্তাই দিলেন না রওশন সাহেব। বসে রইলেন ঠায়। নগদ ভাড়া করে উঠেছেন রিকশায়, এত সহজে ছেড়ে দেবেন না। কিছুতেই না। গন্তব্যে পৌঁছেই নামবেন।

রওশন সাহেবের মনোযোগ ঘুরে গেল সহসাই। মোবাইলে কল এসেছে। যন্ত্রটা তুলে নিলেন তিনি। আননোন নম্বর। সাধারণত আননোন নম্বরের ফোন তিনি ধরেন না। কিন্তু আজ ধরে ফেললেন কী মনে করে।

'হ্যালো,' বললেন তিনি।

'হ্যালো, স্যর, আমি রফিক। চিনতে পারছেন?'

'হুম,' দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল মাথায়। বদমাশটা নম্বর কোত্থেকে জোটাল ভেবে পেলেন না তিনি। 'কী ব্যাপার?'

'ব্যাপারটা হলো, হ্যাকাররা যে মানুষের বন্ধু সেটা আমি প্রমাণ করে দেব।'

'তাই নাকি?' কোনওমতে রাগটা চেপে বললেন তিনি। 'কীভাবে?'

'স্যর, আপনি এখন একটা সমস্যায় আছেন, সামনে একটা ট্রাক বিকল হয়ে পথ বন্ধ করে রেখেছে। কী, তাই তো?'

সচকিত হয়ে এদিক-ওদিক দেখলেন তিনি।

না, ছোকরাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। 'তুমি কি স্পাইং করছ আমার উপর?' এবার আর রাগটা চেপে রাখার চেষ্টাই করলেন না রওশন সাহেব। চেঁচিয়ে বললেন, 'ইউ স্কাউণ্ড্রেল, রাস্কেল। কাল তোমাকে দেখাচ্ছি। হয় তুমি ভার্সিটি থেকে বহিষ্কার হবে, না হলে আমি ইস্তফা দেব।'

'স্যর, কুল! কুল! এত উত্তেজিত হওয়ার কিছু হয়নি। দেখেন না কী হয়। আপনার সমস্যার সমাধান কীভাবে করি,' বলল মোবাইলের কণ্ঠস্বর। 'ও-কে, এবার দেখুন...'

'কী দেখব? তোমার মুণ্ড, বেয়াদব ছেলে কোথাকার!'

'আহা, মুণ্ড না, স্যর, সামনে দেখুন সামনে। ট্রাকটা। ওটা কী আছে এখনও? দেখুন তো!'

রেগেমেগে সামনে তাকালেন প্রফেসর রওশন।

এ কী কাণ্ড!

ট্রাকটা নেই!

পুরো রাস্তা ফাঁকা!

চোখ ডললেন তিনি, আবার দেখলেন ভাল করে। স্বপ্ন, না ভোজবাজি? কোথায় উধাও হলো ট্রাক?

'কী, স্যর? কেমন?'

'টা..ট্রাকটা গে...ল কোথায়?' নিজেকে রক্তশূন্য মনে হলো রওশন সাহেবের। মনে হচ্ছে তিনি আর পৃথিবীতে নেই, মহাকাশে পাড়ি দিয়েছেন, চারদিকে অবিরাম শূন্যতা। তিনি ভাসছেন তার মাঝে।

'হ্যাক হয়ে গেল, স্যর, হ্যাক। কী, বলেছিলাম না? হ্যাকাররা মানুষের বন্ধু। মিলল তো?'

'অসম্ভব। একটা আস্ত ট্রাক, কীভাবে? এ তো কম্পিউটার প্রোগ্রাম নয়, ইচ্ছা হলেই মুছে দিলে কোড! বাস্তব পৃথিবী এটা। কী করেছ বলো! নিশ্চয়ই ওই ট্রাক তোমরা কোথাও সরিয়ে নিয়েছ। আমার সাথে মজা করছ!'

'উফ! স্যর, , আপনার অবিশ্বাস বড্ড গোঁড়া!' হতাশ শোনাল ফোনের কণ্ঠস্বর।

রিকশাওয়ালা এর মধ্যে রিকশা ফেলে দৌড়ে পালিয়ে গেছে।

একা-একা বসে অসহায় হয়ে কথা শুনছেন রওশন সাহেব। 'শুনুন। সব কিছুরই সাইন্টিফিক ব্যাখ্যা আছে। বেসিক আছে এই যে পৃথিবী, এটা এক ধরনের অরগানিক লাইফ ফর্ম। পৃথিবীর উপর যা আছে, এর বাতাসে যা চলছে, যা হচ্ছে, সবই এই লাইফ ফর্মের সাথে কানেক্টেড। আমি কেবল এই লাইফ ফর্মে প্লাগইন করে ট্রাকটা হ্যাক করেছি। কিংবা বলতে পারেন ডিলিট করেছি। ব্যস, এই তো!'

'ব্যস, এই তো? এটাকে এত লাইটলি বলছ?' শিউরে উঠলেন রওশন সাহেব। 'কীভাবে করেছ? তুমি যা করছ, তাতে পৃথিবীতে আলোড়ন পড়ে যাবার কথা। হুড়োহুড়ি লেগে যাবার কথা। কীভাবে সম্ভব এটা! না! তুমি মিথ্যা বলছ, ভুল বলছ! এ অসম্ভব! অসম্ভব!'

'আমি অরগ্যানিক লাইফ ফর্ম আর ফিজিক্যাল লাইফ ফর্মের মধ্যকার কানেকশনটা খুঁজে বের করেছি। সেটাকেই কাজে লাগিয়ে নিজে কন্ট্রোলটা নিয়েছি। এখন ইচ্ছে করলেই আমি অরগানিক লাইফ ফর্মে পরিবর্তন আনতে পারি। এই যেমন ধরুন আপনার রিকশা, চলছে না। আমি চাইলে চালক ছাড়াই এটাকে চালাতে পারি।'

'অসম্ভব!' প্রতিবাদ করলেন রওশন সাহেব।

'উঁহুঁ! দেখুন তবে!'

সঙ্গে-সঙ্গে চলতে লাগল চালকবিহীন রিকশা। এগিয়ে-এগিয়ে একটা অন্ধকার গলির শেষ মাথায় গিয়ে ঠেকল। মেঘে ছেয়ে গেছে উপরের আকাশ, সূর্য ঢাকা পড়েছে মেঘের আড়ালে। ভরদুপুরে ভৌতিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবীর বুকে।

'থামো, থামো,' চিৎকার দিলেন প্রফেসর।

থেমে গেল রিকশা।

'কী, এবার বিশ্বাস হলো?'

'হ্যাঁ। কিন্তু, তোমার এই আবিষ্কার মানুষের কাজে লাগানো উচিত, সবাইকে জানানো উচিত,' হাঁপাতে-হাঁপাতে বললেন তিনি।

'না, তা হচ্ছে না,' থমথমে শোনাল মোবাইলের কণ্ঠস্বর। 'সব জিনিস সবাইকে জানাতে নেই, স্যর।'

'তুমি না জানালেও আমি বলে দেব। এত বড় আবিষ্কার কিছুতেই চাপা থাকতে দেব না।'

'সে সুযোগ আপনি পাবেন না, স্যর। আসলে ব্যাপারটা কী, আপনাকেও এত কিছু বলতাম না। কিন্তু আপনি যখন ক্লাসে আমাদের সাথে ওরকম করলেন, বিশেষ করে আমার সাথে

কথা বলার পর, সিদ্ধান্ত নিলাম এসব বলব। কারণ আপনি তো আর থাকছেন না। যাবার আগে যেটুকু জানার জেনে নিলেন। এই আর কী!'

'থাকছি না মানে? কো...কোথায় যাব আমি?'

'আপনি না, স্যর, বড্ড বোকা! শুধু-শুধু খারাপ ব্যবহার করলেন। তা-ও আবার এমন একজনের সাথে, যে কিনা অরগানিক হ্যাকার। ওয়ার্ল্ডস কন্ট্রোলার। আমি ঠিক করেছি আপনার লাইফ ফর্মটা ফ্ল্যাট করে দেব। মানে, ধরুন, আপনাকে দিয়ে কোনও দালানের ছাদ রিপ্লেস করে দেব। ব্যাপারটা খুব সহজ, আপনার জেনেটিক সিগনেচারটা বদলে দিতে হবে, ব্যস, তা হলেই অর্ধেক কাজ শেষ। আর বাকি অর্ধেকটা কীভাবে হবে সেটা আপনার জেনে কাজ নেই। ছাদ হয়ে বসে বছরের পর বছর ভাবতে পারবেন।'

'না...নাআআআ...এ হতে পারে না! না... না!'

'হচ্ছে, স্যর, হচ্ছে। আপনিই হতে যাচ্ছেন পৃথিবীর সর্বপ্রথম চিন্তাশীল ছাদ। রহমান টাওয়ারের মাথায় বসানো হবে আপনাকে। রোদ পোহাবেন, বৃষ্টিতে ভিজবেন, শীতে জমবেন। শ্যাওলা কাঁধে নেবেন, আপনার উপর দিয়ে বেড়াল হাঁটবে, পাখি বসবে আপনার গায়ে। বেশ মজা, তাই না?'

'অসম্ভব! অসম্ভব!'

'ধুর! আপনার ওই একই কথা,' বিরক্ত হলো কণ্ঠস্বর, 'গুডবাই!'

ঠক করে শূন্য থেকে খসে পড়ল একটা মোবাইল। রিকশার পা-দানিতে এসে ঠেকল ওটা। প্রফেসর রওশন আর নেই সেখানে। মাত্র উধাও হয়েছেন।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রফিক। ট্রায়াল ওঅর্ক সফল, থিয়োরি টেস্ট হয়েছে। টেস্ট সাবজেক্ট রওশন স্যর এখন রহমান টাওয়ারের ছাদ, দখিনা হাওয়া খাচ্ছেন। গ্লোবাল কন্ট্রোলার হবার অনুভূতিটা নেহাত মন্দ নয়। রফিকের বেশ লাগছে। আত্মতৃপ্তির হাসি ফুটে উঠেছে ওর ঠোঁটে। হাসছে রফিক। ■

প্রকাশিত হয়েছে
আগাথা ক্রিস্টির
গুপ্তচর
রূপান্তর: সায়েম সোলায়মান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। ইংল্যাণ্ডে নিজেদের জাল বিছিয়েছে নাৎসি মদদপুষ্ট দুর্ধর্ষ সিক্রেট সার্ভিস, 'ফিফ্‌থ্ কলাম'। সংগঠনের দুই 'মাথার' খোঁজ পেয়ে গিয়েছিল লোকটা। একটা ট্রাক তাকে চাপা দিয়ে চলে গেল। মরার আগে শুধু দুটো শব্দ উচ্চারণ করতে পারল সে: সং সুসি।
মনের মতো কাজ পেয়ে গেল ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টের দুই প্রাক্তন এজেন্ট টমি আর ওর স্ত্রী টাপেন্স।
কিন্তু কোথাও কোনও ক্লু নেই।
অথচ অপহরণ থেকে শুরু করে প্রকাশ্য খুন ঘটে গেল ফিফ্‌থ্ কলামের তথাকথিত সদর-দপ্তর লিয়াহ্যাম্পটনে। টমি-টাপেন্স ভুলে গিয়েছিল, গুপ্তচরবৃত্তিতে সন্দেহ করতে হয় সবাইকেই। তাই টের পেল না, কোন্ ফাঁকে পা দিয়ে ফেলেছে শত্রুপক্ষের নিশ্ছিদ্র ফাঁদে।

দাম ■ ছিয়াশি টাকা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

সাগর তলদেশ থেকে সোনা বা অন্য খনিজ তুলে আনার বিষয়টা ভাবিয়ে তুলেছে পরিবেশবিদদের।

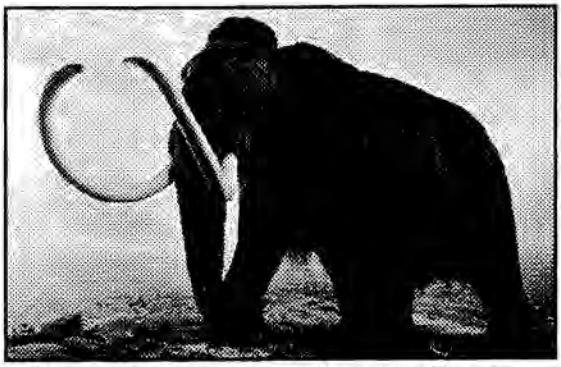

হাতি+ম্যামথ = হামথ না ম্যামতি!

হাতির পূর্বপুরুষ হিসেবে পরিচিত পশমে ঢাকা বিশালদেহী ম্যামথ পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে ৪০০০ বছর আগে। তাদের আবার ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। জিন প্রকৌশলের মাধ্যমেই ম্যামথকে ফিরিয়ে আনা হবে। প্রথম দফায় প্রাচীনকালের বিশুদ্ধ ম্যামথ ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না। বরং হাতির সঙ্গে সঙ্কর ঘটিয়ে বিলুপ্ত এ প্রাণীকে ফিরিয়ে আনা হবে। এমনই আশ্বাস দিয়েছেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা। ফেব্রুয়ারি মাসে বোস্টনে অনুষ্ঠিত আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অভ সায়েন্সের বার্ষিক বৈঠকে এ কথা জানান তাঁরা। এজন্য এশীয় হাতির গর্ভস্থ ভ্রূণে প্রাথমিকভাবে ম্যামথের জিন পুরে দেয়া হবে। ফলে ম্যামথের মতই পশমওয়ালা হাতি জন্মাবে। আকারে বড় হবে এটি। তবে একে হাতি না বলে হামথ কিংবা ম্যামতি বলা যেতে পারে। আগামী দু'বছরের মধ্যেই এমনটা সম্ভব হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

অন্ধকারেও রঙ!

মানুষসহ বেশিরভাগ মেরুদণ্ডী প্রাণীর চোখে দু'ধরনের দৃষ্টি কোষ থাকে। এর একটির নাম কোন এবং

এ দিয়ে রঙ দেখা যায়। তবে এজন্য পর্যাপ্ত আলোর উপস্থিতির প্রয়োজন রয়েছে। অল্প আলোয় এটা কোনও কাজ করতে পারে না। কম আলোয় দেখতে হলে চোখের রড নামের দৃষ্টি কোষের সহায়তা নিতে হয়। এতে কেবলমাত্র সাদা-কালোই দেখা সম্ভব। কিন্তু ব্যাঙের চোখে দু'ধরনের রড আছে। আলোর প্রতি এর সংবেদনশীলতাও ভিন্ন। অন্য কোনও মেরুদণ্ডী প্রাণীর চোখে এ রকম কিছু দেখা যায়নি। আর এ কারণেই গবেষকরা দীর্ঘ দিন ধরে সন্দেহ করছেন, কম আলোয়ও ভালভাবে রঙ দেখতে পায় ব্যাঙ।

চিন্তার জোরে!

পক্ষাঘাতগ্রস্ত তিন ব্যক্তি কেবলমাত্র চিন্তার জোরেই টাইপ করতে পেরেছেন। অবশ্য তাঁদের মস্তিষ্কে একটা ইমপ্ল্যান্ট বসানো ছিল। মানুষের মস্তিষ্কের যে অংশ অঙ্গ সঞ্চালনা সংক্রান্ত কাজ করে, এটি সে অংশে বসানো ছিল। এর সঙ্গে দেয়া ছিল কম্পিউটারের সংযোগ। পরীক্ষাটা করা হয়েছে ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারে। নিউরোসার্জন জেমি হেণ্ডারসটোন চালিয়েছেন

এ পরীক্ষা। মানুষ হাত দিয়ে যত দ্রুত টাইপ করতে পারে, এভাবে টাইপ করতে গিয়ে সময় লেগেছে প্রায় তার দ্বিগুণ। ইমপ্ল্যান্ট এখনও ধীর গতির রয়ে গেছে। হেণ্ডারস্টোন এবং তাঁর সহ-গবেষকরা মনে করছেন, ভবিষ্যতে এর গতি আরও বাড়ানো যাবে।

গড় আয়ু ৯০!

হ্যাঁ, নতুন এক সমীক্ষায় দাবি করা হয়েছে ২০৩০ সালের মধ্যেই এমনটা ঘটবে। আন্তর্জাতিক সমীক্ষার মাধ্যমে এ তথ্য উঠে এসেছে। বিশ্বের ৩৫টি দেশে এ সমীক্ষা চালানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, অনেক দেশেরই গড় আয়ু এ পর্যায়ে যাবে। তবে এ ক্ষেত্রে শীর্ষে থাকবে দক্ষিণ কোরিয়া। উন্নত দেশগুলোর মধ্যে তালিকার সবচেয়ে নিচে থাকবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। গড় আয়ু ৯০ বছর অতিক্রম করা সম্ভব নয় বলে একটা ধারণা গবেষক মহলে প্রচলিত ছিল, তা-ও হয়তো মিথ্যা প্রমাণিত হবে। বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থা এবং লণ্ডনের ইমপেরিয়াল কলেজের গণস্বাস্থ্য বিভাগ যৌথভাবে এ সমীক্ষা চালিয়েছে। সমীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেছে চিকিৎসা বিষয়ক বিখ্যাত গবেষণা সাময়িকী ল্যানসেট।

চাই অ্যান্টিবায়োটিক!

জরুরি ভিত্তিতে লাগবে নতুন অ্যান্টিবায়োটিক, জানিয়ে দিয়েছে বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থা বা হু। পরিচিত বারো রোগের ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য এ অ্যান্টিবায়োটিক অনিবার্য হয়ে উঠেছে। হু বলছে, এসব ব্যাকটেরিয়া সম্প্রতি মানুষের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে উঠেছে। এ ছাড়া, এরই মধ্যে কয়েকটি ব্যাকটেরিয়া অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধকারী সুপারবাগও হয়ে উঠেছে। এসব ব্যাকটেরিয়ার ওষুধ ঠেকানোর জন্মগত ক্ষমতা আছে। এ ক্ষমতা পরবর্তী প্রজন্মের ব্যাকটেরিয়ার ভেতর দিয়েও যেতে পারে। এসব ব্যাকটেরিয়ার কারণে নিউমোনিয়া, গনোরিয়া বা রক্তদূষণের মত রোগ দেখা দিতে পারে, বা ঘটতে পারে খাদ্যে বিষক্রিয়া।

সাগর সেঁচে মানিক!

বাংলা ভাষায় এ বাক্য অনেক দিন ধরেই ব্যবহার হচ্ছে। তবে তা কথার কথা হিসেবেই ব্যবহার হত। কিন্তু এবার প্রায় এমনটা ঘটতে চলেছে। ২০১৯ সাল থেকে পাপুয়া নিউ গিনির নিকটবর্তী সাগরতল থেকে খনিজ তোলার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে চলেছে একটি কোম্পানি। এজন্য সাগরের গভীরে নামানো হবে দানবাকৃতির রোবট। এ পর্যন্ত পঁচিশ দেশকে গভীর সাগর থেকে খনিজ তুলে আনার অনুমতি দিয়েছে আন্তর্জাতিক সাগরপৃষ্ঠ কর্তৃপক্ষ। বিশ্বের সাগরতলের তৎপরতা নিয়ন্ত্রণ করে এ সংস্থা। তবে এভাবে সাগর তলদেশ থেকে সোনা বা অন্য খনিজ তুলে আনার বিষয়টা ভাবিয়ে তুলেছে

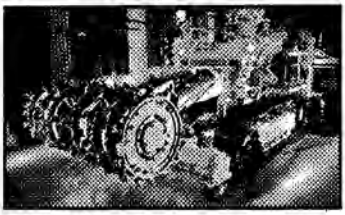

পরিবেশবিদদের। কারণ এতে স্বাভাবিকভাবেই তছনছ হবে সাগরতলের স্পর্শকাতর প্রাণীকুলের আবাসন। তার প্রতিক্রিয়া কী পড়বে কেউ জানেন না! ■

আমিল বতুল

ভেনেজুয়েলান সৌন্দর্যের গোপন রহস্য

অন্বেষা বড়ুয়া

ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ সংখ্যায় ডিউক জন সাহেবের *নেমেসিস* পড়লাম। গল্পের এক জায়গায় প্রশ্ন রেখেছেন তিনি: ভেনেজুয়েলার মেয়েরা এত সুন্দরী হয় কেন। ব্যাপারটা ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব বলে তাঁর ধারণা। ঠাট্টা করেছেন, বোঝা যায়।

আসলেই তো! সৌন্দর্যে দক্ষিণ আমেরিকার ষষ্ঠ-বৃহত্তম এই দেশটির মেয়েরা যেন অপ্সরা। এর প্রমাণ মিলবে বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতা-গুলোতে। ব্যাপারটা কি নিছকই প্রকৃতির খেয়াল, নাকি এর পিছনে গূঢ় কোনও কারণ রয়েছে, কৌতূহল জাগল। কাজেই, সাহায্য চাইলাম *গুগল মামার* কাছে।

বিস্ময় অপেক্ষা করছিল আমার জন্য। রীতিমত 'বৈজ্ঞানিক' কারণ নাকি রয়েছে ভেনেজুয়েলান সৌন্দর্যের পিছনে!

দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী মানুষগুলোর বেশির ভাগেরই ঠিকানা হচ্ছে ভেনেজুয়েলা। দেশটির শতকরা পঞ্চান্ন ভাগ নাগরিক খুবই পরিতৃপ্ত তাদের জীবন নিয়ে।

কী সেই কারণ? বলছি এক-এক করে...

সুখ

এক আন্তর্জাতিক জরিপের হিসাব অনুযায়ী, দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী মানুষগুলোর বেশির ভাগেরই ঠিকানা হচ্ছে ভেনেজুয়েলা। দেশটির শতকরা পঞ্চান্ন ভাগ নাগরিক খুবই পরিতৃপ্ত তাদের জীবন নিয়ে।

মিশ্র জাত

হরেক জাতের আধার এই দেশটি। স্প্যানিশ, ইতালিয়ান, পর্তুগিজ, আরব, জার্মান, আফ্রিকান, আদিবাসী এবং জনসংখ্যার ষাট ভাগ মানুষ পরিচিত 'মেসতিজো' নামে।

মেসতিজো মানে, ইউরোপীয় এবং আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের সংমিশ্রণ। মিশ্র সম্পর্কের ফলে ভিন্ন ধরনের সৌন্দর্য পরিলক্ষিত হয় তাদের সন্তান-সন্ততিদের চেহারায়।

পরিবেশের বৈচিত্র্য

দক্ষিণ আমেরিকার একেবারে উত্তরে অবস্থিত ভেনেজুয়েলার পশ্চিমে রয়েছে কলম্বিয়া, দক্ষিণে ব্রাজিল, পূর্বে গায়ানা, আর উত্তরে ক্যারিবিয়ান সাগর। নয়ন জুড়ানো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি দেশটি। বরফঢাকা আন্দিজ পর্বতমালা দাঁড়িয়ে এর উত্তরে, দক্ষিণে আমাজনের জঙ্গল, আর উত্তর জুড়ে রয়েছে সাগরসৈকত।

জীববৈচিত্র্যের দিক থেকে ভেনেজুয়েলার স্থান ধরা হয় আঠারোয়ে। একুশ হাজার প্রজাতির বৃক্ষরাজি; সরীসৃপ আর উভচরদের জন্য ভেনেজুয়েলা রীতিমত স্বর্গ যেন।

প্রকৃতিপ্রেম

উদ্ভিদ আর প্রাণিবৈচিত্র্যের এ স্বর্গের বাসিন্দারা যে প্রকৃতির প্রতি অনুরাগী হবে, সে তো বলাই বাহুল্য।

সাগরপ্রিয়তা

শতকরা তিয়াত্তর ভাগ ভেনেজুয়েলানের বসবাস সৈকতের একশো কিলোমিটারের মধ্যে। গোটা ভেনেজুয়েলা জুড়ে সাগরসৈকত রয়েছে ১৭৪০ মাইলের মত।

ধর্মভীরুতা

ছিয়ানব্বই ভাগ ভেনেজুয়েলানই হচ্ছে রোমান ক্যাথলিক। আর গোঁড়া এ ধার্মিকতা কোনও ধরনের কৃত্রিমতাকে সমর্থন করে না।

চমৎকার আবহাওয়া

বিষুবরেখার কাছাকাছি হওয়ায় চমৎকার আবহাওয়া বিরাজ করে সেখানে। ঋতুর রকমফের বলতে, স্রেফ রোদ আর বৃষ্টি। সাতাশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশেই ঘোরাফেরা করে তাপমাত্রা। এমন আবহাওয়ায় দলে-দলে মেয়েরা ছোটে সমুদ্রস্নান নিতে।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

বিশ্বের বড়-বড় তেলের-মজুতগুলোর কয়েকটিই রয়েছে ভেনেজুয়েলায়। পাশাপাশি শিল্প-সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের পিছনেও বিনিয়োগ করে তারা। দক্ষিণ আমেরিকার অন্য দেশগুলোতে এই চর্চা অতটা দেখা যায় না। ক্যারিবিয়ান সংস্কৃতির দারুণ প্রভাব রয়েছে ভেনেজুয়েলানদের মধ্যে।

'ভেনেজুয়েলা' নামটা এসেছে ফ্লোরেন্টাইন অভিযাত্রী আমেরিগো ভেসপুচির কাছ থেকে। ১৪৯৯ সালে দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর উপকূল ধরে ভাসতে-ভাসতে মারাকাইবো হ্রদে এসে পৌছন ভেসপুচি। সাগরপারে আদিবাসীদের কুঁড়েগুলো দেখে মাতৃভূমি ভেনিসের কথা মনে পড়ে যায় তাঁর। 'ছোট্ট ভেনিস' নাম দেন তিনি জায়গাটির। সেখান থেকেই এসেছে 'ভেনেজুয়েলা' শব্দটি। ভেনিস, জানেন আপনারা, পৃথিবীর সুন্দরতম ও রোমান্টিক স্থানগুলোর একটি। ■

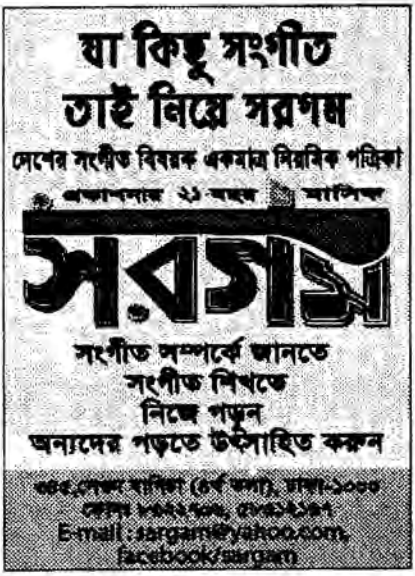

দ্য বডিগার্ড

মূল ▮ লী চাইল্ড
রূপান্তর ▮ ডা. রাফসান রেজা রিয়াদ

'গুলি কোরো না, ওকে জীবিত দরকার!' পিস্তল নামিয়ে ফেলল দলের সবাই।

অন্য সবকিছুর মত বডিগার্ডও আসলে দুই ধরনের–আসল আর নকল। নকল বডিগার্ড হলো ড্রাইভারের পরিমার্জিত রূপ, ফ্যাশনের অনুষঙ্গ ছাড়া কিছুই নয়। সুট পরা এসব বিশালদেহী মানুষদের নিয়োগ দেয়া হয় আকার-আকৃতি ও চেহারা দেখে। বেতনও খুব একটা বেশি হয় না। বডিগার্ড হিসেবেও এরা তুলনামূলকভাবে কম দক্ষ। আসল বডিগার্ড কৌশলী, তার থাকে দ্রুত চিন্তা করার ক্ষমতা, হয় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আর দক্ষতায় প্রশ্নাতীত। বুদ্ধি আর অধ্যবসায় থাকলে, আকার কোনও ব্যাপার নয়, ছোট হলেও সমস্যা নেই। সেই সঙ্গে দরকার সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে জানা।

আমি একজন আসল বডিগার্ড। নিদেনপক্ষে ছিলাম, তা বলাই যায়।

প্রশিক্ষণ নিয়েছি গোপন এক আর্মি ইউনিটে। ব্যক্তি-নিরাপত্তা আমার প্রশিক্ষণের অংশ। পরবর্তী সময়ে অনেককেই সেই একই প্রশিক্ষণ দিয়েছি। আমার গড়ন মাঝারি, হালকা-পাতলা, দ্রুত ও প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর। ঠিক ম্যারাথন দৌড়বিদদের মত নয়, আবার ভারোত্তোলনকারীদের মতও নয়। বছর পনেরো আগে আর্মি ছেড়ে এক বন্ধুর এজেন্সির মাধ্যমে বিভিন্ন চুক্তিভিত্তিক কাজ নেয়া শুরু করি। অধিকাংশ কাজই ছিল দক্ষিণ আমেরিকায় এবং খুব অল্প সময়ের জন্য।

যখন বডিগার্ড হিসেবে কাজ শুরু করি, তখন এ ব্যবসা বেশ ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। মুক্তিপণের লোভে, অপহরণ পরিণত হয়েছিল দক্ষিণ আমেরিকার জাতীয় খেলায়। ধনী কিংবা রাজনীতিবিদরা ছিল টার্গেট। আমেরিকার বিভিন্ন কর্পোরেট ক্লায়েন্টদের হয়ে কাজ করতাম। তাদের ম্যানেজার ও এক্সিকিউটিভরা নিয়োজিত ছিল পানামা, ব্রাজিল ও কলম্বিয়ার মত জায়গায়। তারা বেশ ধনী এবং উপরমহলেও যোগাযোগ ভাল রাখত।

কখনও কোনও ক্লায়েন্ট হারাইনি। কারণ ছিলাম কৌশলী আর আমার ক্লায়েন্টরাও ছিল বেশ ভাল। সবাই পরিস্থিতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিল। তারা আমার কথামত কাজ করত। ওই তপ্ত পরিস্থিতির মাঝে তারা দু'বছর কাজ করে জীবিত অবস্থায় প্রমোশনসহ হেড অফিসে ফিরতে চাইত। সঙ্গোপনে থাকত, রাতে বেরোত না, অফিস ও কারখানা ছাড়া অন্য কোথাও যেত না। সুরক্ষিত বিভিন্ন গাড়িতে করে একেকবার একেক রাস্তা দিয়ে আসা-যাওয়া করতাম। তা নিয়েও তাদের কোনও অভিযোগ ছিল না। কারণ তারাও কাজেই এসেছিল, সামরিক বাহিনীর মত এ নিরাপত্তা ব্যবস্থা তাদের ভালর জন্যই, তা মেনে নিত তারা। সবকিছু বেশ সহজভাবেই চলছিল।

এরপর একদিন আমার বন্ধুর এজেন্সি ছেড়ে নিজেই জোগাড় করতে শুরু করলাম কাজ।

আয় বাড়ল, কিন্তু সেই সঙ্গে বাড়ল খাটুনি। এক বছর শিখতে শিখতেই কেটে গেল। আমি তাদের থেকে দূরে থাকা শিখলাম, যারা কেবল সমাজে মর্যাদার প্রতীক হিসেবে বডিগার্ড চায়। এ ধরনের অনেকেই ছিল, যাদের সঙ্গে থাকলে নিজেকে আমার অসহায় মনে হবে, কারণ আসলে আমার করার মত কিছুই থাকবে না। বসে থাকতে-থাকতে দক্ষতায় জং ধরে যেত। যাদের সত্যি-সত্যি বডিগার্ড দরকার নেই, তাদের থেকে দূরে থাকলাম। শহর হিসেবে বেশ বিপজ্জনক ছিল লণ্ডন, আর নিউ ইয়র্ক তার চেয়েও খারাপ। তবে কারোরই সত্যিকার অর্থে এই দুই শহরে বডিগার্ডের প্রয়োজন পড়ে না। তেমন কিছুই করার থাকে না আমার, তা একাধারে বিরক্তিকর ও যন্ত্রণাদায়ক। আসলে বিপদের প্রতি আমার সহজাত আকর্ষণ, যা আমার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করল।

অ্যানার জন্য কাজ করার সিদ্ধান্তটিও ছিল তেমন।

ওর পারিবারিক নাম উল্লেখ করব না। এটা আমার চুক্তির অংশ, মৃত্যুর আগপর্যন্ত মানতে আমি বাধ্য। এক বন্ধুর মাধ্যমে এ চাকরির খবর পাই। ইন্টারভিউ দিতে উড়ে যাই প্যারিসে।

অ্যানা অবিশ্বাস্য সুন্দরী। কোমল, ছিমছাম, বাইশ বছর বয়সী রহস্যময়ী এক তরুণী। আমাকে অবাক করে নিজেই ইন্টারভিউ নিল সে। এ ব্যাপারগুলো সাধারণত বাবারাই দেখভাল করে। বডিগার্ড নিয়োগের ব্যাপারটা তাদের কাছে অনেকটা সন্তানের জন্মদিনে মার্সিডিজ গাড়ি উপহার দেবার মত।

কিন্তু অ্যানা একদম ব্যতিক্রম।

নিজেই বিশাল অর্থ-বিত্তের মালিক। উত্তরাধিকার সূত্রে যে সম্পত্তি পেয়েছে, তা পরিবারের ভিন্ন এক শাখা থেকে এসেছে। আমার মনে হয় তার বাবার চেয়েও ধনী সে। ওই ভদ্রলোক নিজেও বিরাট ধনী। অ্যানার মা-ও ধনী, তাঁর আয়ের উৎসও আলাদা। তাঁরা ব্রাজিলীয় নাগরিক। অ্যানার বাবা ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ, মা টিভি তারকা। ফাঁড়া তিন দিক থেকে–কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা, রাজনৈতিক প্রভাব আর বিপজ্জনক ব্রাজিল!

আমার মানা করে দেয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা করিনি। কারণ মনে-মনে এমন চ্যালেঞ্জই চেয়েছি। আর অ্যানাও মনোমুগ্ধকর। কোনও ধরনের ব্যক্তিগত সম্পর্ক চাই না, কারণ সে আমার ক্লায়েন্ট আর আমার বয়সও প্রায় তার দ্বিগুণ। তবে আমার মনে হয়েছে, বেশ উপভোগ্য হবে তার সঙ্গ। ইন্টারভিউ ভালই হলো। আমার যোগ্যতার চেয়ে আমার চিন্তাভাবনা, রুচি, পছন্দ ইত্যাদি প্রাধান্য পেল। স্পষ্টই বুঝলাম, এবারই প্রথম বডিগার্ড নিয়োগ দিচ্ছে না সে।

অ্যানা জানতে চাইল, ঠিক কতটুকু স্বাধীনতা তাকে দিতে পারব।

ব্রাজিলে অ্যানার কাজ দাতব্য: মানবাধিকার বিষয়ক ও দারিদ্র্য বিমোচন। টাকাপয়সা হাতে থাকলে সচরাচর সবাই যা করে, তেমনি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভ্রমণ করে যেতে হবে বিভিন্ন দুর্গম বস্তি

ও জঙ্গলে। তাকে আমার দক্ষিণ আমেরিকার আগের ক্লায়েন্টদের ব্যাপারে ধারণা দিলাম। যত কম ঘোরাঘুরি করত তারা, ততই থাকত নিরাপদ। তাদের দৈনিক রুটিন সম্বন্ধে বললাম। বাসা, গাড়ি, অফিস, গাড়ি, বাসা।

সে সাফ মানা করে দিল। বলল, 'আমাদের ব্যালেন্স করে চলতে হবে।'

অ্যানার মাতৃভাষা পর্তুগিজ, তবে ইংরেজিও বেশ ভাল বলতে পারে। তাতে হালকা আঞ্চলিকতার ছোঁয়া। গলার স্বর তার চেহারার চেয়েও আকর্ষণীয়। অন্যান্য ধনী মেয়ের মত ছোট-ছোট কাপড় পরে না। ছেঁড়া-ফাটা জিন্সও পরেনি। ইন্টারভিউ নিল কালো প্যান্ট আর সাদা শার্ট পরে। নতুন মনে হলো কাপড়গুলো। আমি নিশ্চিত ওগুলো প্যারিসের কোনও নামকরা বুটিক থেকে এসেছে।

আমি বললাম, 'তোমার ইচ্ছে। দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা বাসায় আটকে রেখে শতভাগ নিরাপদে রাখতে পারি। আবার প্রতিদিন রিও'র রাস্তায় ঘোরাঘুরি করে শতভাগ বিপদেও রাখতে পারো নিজেকে।'

'আমি পঁচাত্তর ভাগ নিরাপদে থাকতে চাই।' একটু মাথা নেড়ে বলল, 'না, আশি ভাগ।'

বুঝলাম কী বলতে চাইছে। জীবনকে উপভোগ করতে চাইলেও ভয় কাজ করছে তার মধ্যে। ধারণা নেই কঠিন বাস্তবতা সম্পর্কে।

আমি বললাম, 'আশি ভাগ মানে তুমি সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বেঁচে গেলেও শুক্রবার মারা পড়তে পারো।'

চুপ হয়ে গেল সে।

'আদর্শ টার্গেট তুমি,' বললাম, 'তুমি ধনী, তোমার মা ধনী, তোমার বাবাও ধনী, তার ওপর আবার রাজনীতিবিদ। পুরো ব্রাজিলে তোমার চেয়ে ভাল শিকার কেউ নয়। আর কিডন্যাপিং আসলে নোংরা ব্যবসা। বেশিরভাগ সময় তা ব্যর্থ হয়। দেরিতে হলেও তুমি খুন হবে। আবার অনেক সময় বিশেষ দেরিও হয় না।'

সে কিছু বলল না।

আরও বললাম, 'কখনও-কখনও তা খুবই অপ্রীতিকর। ভয়, চাপ আর হতাশা গ্রাস করবে। তোমাকে তো আর রাখা হবে না সোনার খাঁচায়। কতগুলো নোংরা গুণ্ডা-মাস্তানের সঙ্গে তোমাকে থাকতে হবে জঙ্গলে।'

সে বলল, 'আমি সোনার খাঁচা চাই না। আর তুমি তো থাকবেই।'

বুঝলাম, চাকরি হয়ে গেছে আমার।

'আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব,' বললাম আমি।

তখনই আমাকে নিয়োগ দিল অ্যানি। অ্যাডভান্স হিসেবে বড় অঙ্কের টাকা হাতে দিয়ে বন্দুক, কাপড় বা গাড়ি যা কিছু লাগবে তার লিস্ট করতে বলল। আমি কিছুই চাইলাম না। ভাবলাম, যা দরকার, তা আমার কাছে আছে, ভাল করেই জানি কী করতে হবে।

এক সপ্তাহ পর ফার্স্ট ক্লাসে চড়ে পরিকল্পনা মত ঘুরপথে গেলাম ব্রাজিল, যাতে কেউ কিছুই আঁচ করতে না পারে। প্যারিস থেকে লণ্ডন, লণ্ডন থেকে মায়ামি, মায়ামি থেকে রিও। আকাশে তেরো ঘণ্টা, আর এয়ারপোর্ট লাউঞ্জে আরও পাঁচ ঘণ্টা। সঙ্গী হিসেবে অ্যানা চমৎকার। আর ক্লায়েন্ট হিসেবেও বেশ আন্তরিক। রিওতে আমার এক বন্ধু রিসিভ করল আমাদের। অ্যানার বাজেট বড় হওয়ায় একেক দিন একেক ড্রাইভার ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিলাম। এতে চাপ কমবে আমার ওপর। মেক্সিকোয় পরিচিত এক রাশান থাকল প্রথম দিনের ড্রাইভার। এ ধরনের কাজে রাশানরা সেরা। হতেই হবে, ঝামেলার জন্য রিও'র চেয়েও বেশি কুখ্যাত মস্কো।

সেবা প্রকাশনী এবং প্রজাপতি প্রকাশনের সব ধরনের বইয়ের জন্য বগুড়ায়
মুসলিম বুক ডিপো
আকবরিয়া মার্কেট, বগুড়া।
ফোন: ৬৪২৬৪
মোবাইল: ০১৯১১-৪০২৭৮২

রিওতে অ্যানার নিজের বাড়ি। শহর থেকে বাইরে বিশাল কোনও প্রাসাদ আশা করেছি। কিন্তু তার বাসা শহরেই। ব্যাপারটা একদিক দিয়ে ভালই হলো। ঢোকার দরজা একটা, দারোয়ান একজন আর একজন প্রহরী। এলিভেটর পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই নজরে পড়বে আগত অতিথিরা। অ্যাপার্টমেন্টের দরজা স্টিলের তৈরি। তাতে তিনটা লক, সঙ্গে টিভি, এন্ট্রিফোন। পিপহোলের চেয়ে এসব ভাল মনে হয় আমার কাছে। পিপহোলের আইডিয়াটা নির্বুদ্ধিতা। করিডোরে যে কেউ অপেক্ষা করতে পারে। পিপহোল অন্ধকার হলেই গুলি করা সম্ভব বড় ক্যালিবারের হ্যাণ্ডগান থেকে চোখে। বুলেট খুলি ভেদ করে মগজ ছেতরে দিয়ে লাগবে পিছনে থাকা ক্লায়েন্টের গায়ে।

পরিস্থিতি আমার অনুকূলেই থাকল। বিল্ডিঙের নিচে গাড়ি পার্ক করল রাশান বন্ধু। লিফটে চড়ে উঠে বাসায় ঢুকে তালা তিনটে আটকে সন্তুষ্ট হলাম। আমার রুম অ্যানার রুম ও বাইরের দরজার মাঝে। সবই ঠিক থাকল।

সবই ঠিক, তবে কেবল চব্বিশ ঘণ্টার জন্য!

বেশ হালকা আমার ঘুম। পশ্চিমে গেলে জেট ল্যাগের জন্যে এমনিতেও তাড়াতাড়ি ভাঙে ঘুম। আমরা দু'জনই সাতটায় উঠে গেলাম। অ্যানা বাইরে ব্রেকফাস্ট সেরে শপিং করতে চাইল। ইতস্তত করলাম। কিন্তু আমি তার বডিগার্ড, জেলার নই। তাই ব্রেকফাস্ট ও শপিঙের জন্য রাজি হলাম।

সকালের নাস্তাটা আমরা এক হোটেলের ডাইনিঙে ঢুকে ধীরে-সুস্থে সারলাম। পুরো জায়গাটাই বডিগার্ডে ভরা। কেউ আসল, কেউ নকল। কেউ আলাদা টেবিলে বসেছে, আবার কেউ তার ক্লায়েন্টের সঙ্গে। আমি অ্যানার সঙ্গে বসে খেলাম। ফলমূল, কফি, ক্রয়সে। আমার চেয়েও বেশি খেল অ্যানা। তারপর আমরা গেলাম শপিঙে।

আর সেখান থেকেই শুরু বিপত্তির।

পরে বুঝেছি, চক্রান্তটা ছিল আমার রাশান বন্ধুর। কারণ সচরাচর প্রথম দিনটাই সবচে' সহজ। আপনি শহরে এসেছেন তা কেউ জানে না। কিন্তু আমার বন্ধু নিশ্চয়ই জায়গামত ফোন দিয়েছিল। অ্যানা ও আমি দোকান থেকে বেরিয়ে পার্কিঙে খুঁজে পেলাম না আমাদের গাড়ি। অ্যানার হাতে শপিঙের মালপত্র। শুরুতেই এ ব্যাপারে তাকে সবক দিয়েছি, আমি বডিগার্ড, কুলি নই। আমার হাত খালি থাকা দরকার। বামে তাকিয়ে কিছু চোখে পড়ল না, কিন্তু ডানে চারজন লোককে দেখলাম অস্ত্র হাতে।

আমাদের কাছাকাছিই আছে তারা। হাতে নতুন, তেল চকচকে অটোমেটিক। লোকগুলো ছোটখাট, দ্রুত ও পেশিবহুল। রাস্তায় অনেক মানুষ। বামে রাস্তা, ডানে দোকানে ঢোকার দরজা। আমি গুলি করলে নিশ্চিতভাবেই প্রতিপক্ষকে লাগাতে পারব। তবে এলোপাতাড়ি গোলাগুলি হলে হতাহত হবে সাধারণ মানুষ। এমনিতেও হেরে যাব। চারজনের বিরুদ্ধে একজনের বন্দুকযুদ্ধে জয় কেবল সিনেমাতেই সম্ভব। আমার কাজ অ্যানাকে বাঁচিয়ে রাখা, সেটা আরও একদিন বা একঘণ্টার জন্য হলেও।

লোকগুলো এসে কেড়ে নিল আমার পিস্তল। অ্যানার হাত থেকে ব্যাগগুলো নিয়ে হাত পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা এক সাদা গাড়িতে তুলে নেয়া হলো আমাদেরকে। গাড়ির পেছনের সিটে দু'জন লোক আমাদের পাঁজরে পিস্তল ঠেকিয়ে বসে থাকল। সামনের সিট থেকে ঘুরে আমাদের দিকে আরেকটা পিস্তল তাক করে রাখল একজন। দ্রুত গাড়ি ছেড়ে দিল ড্রাইভার। মুহূর্তের মাঝেই মাওরা মেইন রোড থেকে সরে সাইড রোডে চলে এল গাড়ি।

জঙ্গলের কুটির নিয়ে ভুল ছিল আমার ধারণা! শহরের ভেতরেই পরিত্যক্ত এক অফিস বিল্ডিঙে নিয়ে যাওয়া হলো আমাদেরকে। ইঁটের তৈরি বিল্ডিঙের রঙ ধূসর-সাদা। গুণ্ডাদের সম্পর্কে আমার ধারণা অবশ্য ঠিক। ওই গ্যাং-এর লোক আছে পুরো বিল্ডিং জুড়েই। কমপক্ষে চল্লিশজন তারা। নোংরা আর অভদ্র, নির্লজ্জভাবে অ্যানাকে দেখল। আশা করলাম, আমাদের দু'জনকে একই সঙ্গে রাখা হবে।

কিন্তু তারা দেরি না করে আমাদেরকে আলাদা দিকে নিয়ে গেল। আমাকে রাখা হলো একটি রুমে। কোনও এক সময় অফিস ছিল ওটা। জানালায় ভারী গ্রিল, দরজায় বিশাল এক

তালা। পুরো ঘরে কেবল একটা বিছানা ও বালতি। বিছানাটা লোহার রডের তৈরি হাসপাতালের বেড। বালতি খালি থাকলেও বেশিক্ষণ আগে তা খালি করা হয়নি। দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে ওটা থেকে। হাত পিছমোড়া করে আমার হাতে হ্যাণ্ডকাফ লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। পায়ে বেড়ি লাগিয়ে আমাকে ফেলে রাখা হলো মেঝেতে। এভাবে পেরিয়ে গেল প্রায় ঘণ্টা তিনেক।

দুঃস্বপ্নের শুরু এর পর থেকেই।

তালা খুলে ভেতরে ঢুকল এক লোক। এই দলের বস বলে মনে হলো তাকে। লম্বা, শ্যামলা, গম্ভীর বিশাল মুখভরা সোনা দিয়ে বাঁধানো দাঁত। আমার পাঁজরে কষে দুটো লাথি মেরে ব্যাখ্যা করল, কিডন্যাপিঙের এই ঘটনা পুরোপুরি রাজনৈতিক। কোনও টাকা-পয়সা পেলে তা হবে উপরি। কিন্তু মূল লক্ষ্য অ্যানাকে জিম্মি করে তার রাজনীতিবিদ বাবাকে কাজে লাগিয়ে এক সরকারি তদন্তের কাজ বন্ধ করা।

অ্যানা তাদের হাতের তুরুপের তাস।

কিন্তু ঝেড়ে ফেলা যায় আমাকে। ঘণ্টাখানেকের মাঝেই মেরে ফেলবে তারা। কোনও ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের জের ধরে নয়, কেবল আনন্দের জন্য। সে বলল, এমনভাবে আমাকে খুন করা হবে, যা তাদের জন্যে হবে খুব উপভোগ্য। আমাকে কীভাবে মারা হবে তার সিদ্ধান্ত তার দলের লোকদের ওপরই ছেড়ে দিল সে।

পরে অবশ্য জানলাম, দোতলা ওপরে এমনই এক রুমে আটকে রাখা হয়েছে অ্যানাকেও। তার হাতে হাতকড়া বা পায়ে বেড়ি নেই। ওখানেও আছে হাসপাতালের লোহার বিছানা, কিন্তু বালতির পরিবর্তে আছে বাথরুম। ঘরে একজোড়া চেয়ার-টেবিলও আছে। যেহেতু সে তাদের কাছে মূল্যবান, তাই তাকে খাবারও দেয়া হচ্ছে।

অ্যানার সাহসের শেষ নেই। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়ার সঙ্গে-সঙ্গে এমন কিছু খুঁজতে লাগল, যেটা অস্ত্র হিসেবে কাজে আসবে। চেয়ার, বিছানা, বাথরুমের সিঙ্ক—কোনওটাই পছন্দ হলো না ওর। শেষে নজর দিল টেবিলের দিকে।

চারপায়া টেবিলের ওপরের দিকে তিন বর্গফুট কাঠের পাতলা আচ্ছাদন। নিচের দিক দেখতে অগভীর বাক্সের মত। পায়ার সঙ্গে আছে লোহার বাঁকা পাত। বল্টু মরচে পড়া সস্তা স্টিলের তৈরি। নাট সহজেই ঘুরিয়ে খুলে ফেলল অ্যানা। পায়া খুলে নাট-বল্টু লুকিয়ে রাখল। আলগা পায়া ওভাবেই ওজন নিল টেবিলের।

তারপর বিছানায় বসে অপেক্ষা করতে থাকল অ্যানা। একঘণ্টা পর পায়ের আওয়াজ শুনল করিডোরে।

তালা খুলে খাবারের ট্রে হাতে ভেতরে ঢুকল অল্পবয়সী এক ছেলে। দলের নিচের দিকের কেউ, ছোটখাট কাজ সামলায়। কোমরে নতুন এক অটোমেটিক পিস্তল।

অ্যানা দাঁড়িয়ে বলল, 'ট্রে-টা বিছানায় রাখো। আমার মনে হচ্ছে টেবিলে কোনও সমস্যা আছে।'

ট্রে তোষকের উপর নামিয়ে রাখল ছেলেটা।

অ্যানা জিজ্ঞেস করল, 'আমার বন্ধু কোথায়?'

'কোন্ বন্ধু?'

'আমার বডিগার্ড।'

'নিচতলায়,' ছেলেটা বলল।

অ্যানা আর কিছু বলল না।

ছেলেটা জিজ্ঞেস করল, 'টেবিলের কী হয়েছে?'

'মনে হচ্ছে একটা পায়া ঢিলা।'

'কোন্টা?'

'এইটা!' বলেই হ্যাঁচকা টানে একটা পায়া খুলে নিয়েই ঘুরিয়ে ছেলেটার মুখে বেসবল ব্যাটের মত নামাল অ্যানা। ছোকরার নাকের ওপরের হাড় ভেঙে ঢুকে গেল মগজে। মাটিতে পড়ার আগেই মারা পড়েছে সে। অ্যানা তার কোমর থেকে পিস্তলটা নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল।

পিস্তলের গায়ে লেখা গ্লক। নেই কোনও সেফটি মেকানিযম।

ট্রিগারে আঙুল রেখে করিডোরে বেরিয়ে এল অ্যানা, সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নিচে।

ততক্ষণে টেনে নিচতলার বড় এক রুমে আমাকে নিয়ে গেছে ওরা। কোনও এককালে এটা সম্ভবত ছিল কনফারেন্স রুম। রুমে উপস্থিত

উনচল্লিশজন লোক। ছোট এক মঞ্চে দুটো চেয়ার পাতা। তার একটায় বসেছে ওদের বস। অন্যটাতে বসিয়ে দেয়া হলো আমাকে। সবাই মিলে শলা-পরামর্শ করতে লাগল পর্তুগিজ ভাষায়। বোধহয় ঠিক করছে কীভাবে খুন করবে আমাকে। কাজটা করতে হবে উপভোগ্য হওয়ার মত করে। এর মাঝেই খুলে গেল রুমের পিছনের এক দরজা। পিস্তল হাতে সবাইকে কাভার করতে-করতে ঘরে ঢুকল অ্যানা। মুহূর্তের মাঝে পিস্তল বের করে ওর দিকে তাক করল আটত্রিশজন মাস্তান। চুপ করে বসে আছে তাদের বস, এবার চিৎকার করে উঠল। পর্তুগিজ না জানলেও সে কী বলছে, ঠিকই বুঝলাম।

'গুলি কোরো না, ওকে জীবিত দরকার!'

পিস্তল নামিয়ে ফেলল দলের সবাই।

তাদের মাঝ দিয়ে জায়গা করে মঞ্চের দিকে এল অ্যানা।

মৃদু হেসে বস বলল, 'তোমার পিস্তলে সতেরোটা গুলি আছে। আর আমরা উনচল্লিশজন।'

মাথা দোলাল অ্যানা। 'জানি।' হঠাৎ করেই পিস্তলটা সরাসরি ধরল নিজের বুকে। 'কিন্তু আমি নিজেকে তো গুলি করতে পারি?'

কাজটা খুব সহজ।

আমসির মত শুকিয়ে গেল দলনেতার মুখ।

এবার আমার হাতকড়া ও পায়ের বেড়ি খুলে দিতে বলল অ্যানা।

সামান্য ভেবে নিয়ে ওর দাবি মেনে নিল লোকটা।

একটু পর আরেকটা পিস্তল জোগাড় করে অ্যানাকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম ওই দালান থেকে। শত্রুকে গুলি করার হুমকি না দিয়ে বরং নিজেকে মেরে ফেলার কথা বলেছে বলে মুক্তি পেয়ে গেল অ্যানা।

পাঁচ মিনিট পর ট্যাক্সিতে চেপে বসলাম আমরা। মিনিট তিরিশেক পর ফিরলাম বাসায়।

এর পরদিনই চাকরি ছাড়লাম বডিগার্ডের।

বুঝে গেছি ভাগ্যের ইশারা। যে বডিগার্ডকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে হয়, তার নকল বডিগার্ড হওয়া ছাড়া ভবিষ্যৎ একেবারে নিকষ কালো অন্ধকার! ■

১৭/৪/১৭ তারিখে প্রকাশিত হচ্ছে

মাসুদ রানা

ভলিউম-২

অসংক্ষেপিত সংস্করণ

কাজী আনোয়ার হোসেন

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে। বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি। কোমলে-কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর-সুন্দর এক অন্তর। একা। টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না। কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে রুখে দাঁড়ায়। পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয় আর মৃত্যুর হাতছানি। আসুন, এই দুর্ধর্ষ চির-নবীন যুবকটির সঙ্গে পরিচিত হই। সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে। আপনি আমন্ত্রিত।

ধন্যবাদ।

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

mail: alochonabibhag@gmail.com

শো-রুম

৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

জোছনা রাতে

সেলিম আউয়াল

'আসেন একদিন চান্নি রাইতে।
আসমান ভাইঙ্গা জোসনা নামব।'

হঠাৎ উপস্থিত হয়ে চমকে দেয়ার জামানা শেষ। আজকাল আর সারপ্রাইজ দেয়া যায় না। ঘর থেকে বেরোবার আগেই খবর পৌঁছে যায় মোবাইল ফোনের কারণে। গিয়ে দেখলাম, আম্মা, মেয়ে মাশিয়াত, বোন কাজল, ভগ্নিপতি আনোয়ার, ভাগ্নে তানজু ও তালহা– সবাই অপেক্ষা করছে বাংলোর বারান্দায়। আমরা কখন কোথায় সব খবর মিনিটে-মিনিটে জেনে নিয়েছে। আগেই ওই বাংলোয় হাজির হয়েছেন আম্মা ও মাশিয়াত।

লাল মাটির আঁকাবাঁকা পথ ভেঙে উঠতে হয় টিলার মাথায়, ওই সমতল জায়গাতেই বাংলো।

আঙিনার গেট পেরিয়ে ঢুকতেই ভরে গেল মন। বাংলোর সামনে সারবাঁধা ফুলের গাছ। একপাশে বিশাল এক বোগেনভেলিয়া গাছ। ছেয়ে আছে ফুলে-ফুলে।

ভগ্নিপতি আনোয়ারের নতুন কর্মস্থল এখানেই। চণ্ডিছড়া চা বাগানের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। এ বাংলোয় থাকবেন এখন থেকে। তাঁর চাকরির সুবাদে অনেক বাগানে রাত কাটিয়েছি আমরা। নন্দন চা বাগান, পাত্রখলা চা বাগান, কেওয়াঝড়া চা বাগান, কুরমা চা বাগান, চাম্পা রায় চা বাগান। সবগুলো বাগানেই গেছি দল বেঁধে। সারাদিন-রাতভর হৈ-চৈ করে ঘুরে ফিরে ক্লান্ত হয়ে ফিরেছি বাড়ি।

চণ্ডিছড়া বাংলোর চারপাশে ফুলের বাগান। বাংলোর বাইরে টিলা বাবুদের সারবাঁধা বাসা। বাসার সামনে লিচু গাছের সারি ও চায়ের চারার শেড। অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায় চা বাগান।

বারান্দার সোফায় বসলাম সবাই। মাথার উপর ঘুরছে দুটো ফ্যান। শরবত, ভেজিটেবল রোলস, সিঙ্গারা খেলাম। বাচ্চারা নেমেই দে ছুট। বাংলোর একপাশে গাছের ছায়ায় ঝুলছে দোলনা। সেখানে বাচ্চাদের দে-দোল! তাদের সঙ্গে যোগ দিলাম আমরাও।

দোলনার একপাশে ফুলের গাছ। নাম যেন কী? পরে মনে পড়ল–কাঠ গোলাপ। গাছটিতে এখন কোনও পাতা নেই। বর্ষার সময় ফোটে সাদা ফুল। নাকের কাছে নিলে পাওয়া যায় হালকা সুবাস। গাছটি বেশ বড়। মাটি থেকে হাত দেড়েক উঠে ছড়িয়ে গেছে দু'পাশে। এজন্যে ঝটপট গাছে উঠছে বাচ্চারা। অনেকের আবার জীবনে প্রথম গাছে চড়া। ভাবতেই পারেনি এমন গাছ পাবে আর তাতে মজা হবে। ক্লিক-ক্লিক শব্দে তোলা হচ্ছিল ছবি। মাশিয়াত ছোট্ট হ্যাণ্ডিক্যাম দিয়ে ভিডিয়ো করল।

আজ শুক্রবার। বাংলোর পাশেই ছোট মসজিদ। বাংলোর সীমানা থেকে মসজিদ পর্যন্ত সারবাঁধা মেহগনি গাছের বাগান। গাছের ছায়ায়-ছায়ায় মসজিদে গেলাম। চৈত্র মাস, শুকিয়ে গেছে মসজিদের সামনের পুকুরের পানি। নিচে সামান্য জমে আছে। কষ্ট লাগল পুকুরটির দুরবস্থা দেখে। পাড়ে বেশ ক'টি খেজুর গাছ।

নামায শেষ করে আজ যেন তাড়াতাড়ি খিদে লাগল। আমার বোন কাজল বলেছিল, মেনুতে চুনারুঘাটের দেশি মোরগ থাকবে। পাহাড়ি এলাকায় সেসব মোরগ মুক্তভাবে বেড়ে উঠেছে। মেদশূন্য লম্বাটে টাইপের, খেতে বনমোরগের মতই। মেনুতে ওদের বাংলোর গাছ থেকে সদ্য পেড়ে আনা সজনে দিয়ে ডাল, বাংলোতে ফলানো সার-কীটনাশকবিহীন করল্লা-শাক ইত্যাদি।

মেনু শুনে খুশি হয়েছে সবাই।

ন্যাশনাল টি কোম্পানির অবসরপ্রাপ্ত ইসহাক মিয়া বাবুর্চির চমৎকার রান্না খেলাম সিলেটের লাক্কাতুরা বাগানের রেস্ট হাউসের বাবুর্চি ছিল সে। অনেক রথী মহারথী তার হাতের রান্না খেয়ে প্রশংসা করেছেন। এখন সে কাজলের ব্যক্তিগত বাবুর্চি। মানুষটিও খুব ভাল ও বিশ্বাসী। ইসহাক মিয়া বাবুর্চির হাতে রান্না করা খাবার থেকে শুরু করে ঘরের জিনিসপত্র ও বাচ্চা-কাচ্চা সব নিরাপদ!

খাবার সেরে হালকা ঘুম দিয়ে নিল আমার ভায়রা শাহীন, ভগ্নিপতি দীপু।

আর আমরা তখন দল বেঁধে দোলনায় দুললাম, গাছে চড়ল বাচ্চারা।

আমাদের সফরটা শুক্র ও শনিবারের জন্যে–দু'দিনের। সামনেই হরতাল, এজন্যে শুক্রবারেই ফিরব সিলেটে। সংক্ষেপে যতটুকু সম্ভব ঘুরে দেখব ঠিক করেছি।

সবাই রেডি হতেই গাড়িতে চাপলাম আমরা। হাই এস ও কাজলদের মারুতি গাড়ি চলল সাতছড়ির পথে। হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার সাতছড়ি হচ্ছে প্রাকৃতিক পাহাড়ি বনভূমি। ওটা রক্ষায় উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। করা হয়েছে জাতীয় উদ্যান। চুনারুঘাট উপজেলায় আরেকটি জাতীয় উদ্যান আছে, ওটার নাম রেমা কালেঙ্গা। কিন্তু ওটা চণ্ডিছড়া বাংলো থেকে পনেরো-বিশ কিলোমিটার দূরে, তাই ওখানে যাব না ঠিক হলো।

বাগানের ভেতরের আঁকাবাঁকা পথে চলেছে গাড়ি। দু'পাশেই চা বাগান। চণ্ডিছড়া (খাল) দিয়ে আসে প্রচুর বালি। বালি তুলছে একদল লোক। প্রায় বিকেল হয়ে এসেছে, কাপড়ের ঝোলায় চা পাতা বোঝাই করে ফিরছে মহিলা চা শ্রমিকরা। সারাদিন একটানা কাজ করেও যেন ক্লান্তি নেই। নিজেদের মধ্যে হাসি-ঠাট্টা করে পথ চলছে। একজন অপরজনের পেছনে সার বেঁধে হাঁটছে। টিলা বাবুর কাছে চা পাতা জমা দেবে। চা পাতা কেজি হিসেবে মেপে রাখা হবে, তারপর সপ্তাহ শেষে মজুরি।

আমরা যখন পৌঁছলাম সাতছড়ি, তখন মাঝ বিকেল। লম্বা হয়ে মাটিতে পড়েছে গাছের ছায়া। সাতছড়িতে ঢুকতে টিকেট লাগে। দেরি না করে ঢুকে পড়লাম। হাতে সময় কম। গেটে পরিচয় হলো উদ্যানের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা বা সহব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান আরজু মাস্টারের সঙ্গে। তিনি সহব্যবস্থাপনার বিষয়টি বোঝালেন। এটি হচ্ছে–সাতছড়ি বাগানের কাঠ-প্রাণীর ওপর নির্ভরশীল মানুষদেরকে নিয়ে একটি কমিটি। এই কমিটিকে কারিগরী সহায়তা দিচ্ছে ইউএসএইড, বিভিন্ন এনজিও ও গবেষণা সংস্থা। এলাকার লোকজনের ভোটে

সহব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন আরজু মাস্টার। এই কমিটি সাতছড়ি বনাঞ্চলের ওপর নির্ভরশীলদেরকে বিভিন্ন ঋণ দিয়ে, জমি লীজ দিয়ে, বনাঞ্চলের ওপর থেকে তাদের নির্ভরশীলতা কমাবার চেষ্টা করছে। বললেন, তাঁরা যথেষ্ট সফল। এ প্রকল্পের কারণে বনাঞ্চল ধ্বংস হওয়া ঠেকানো গেছে।

আরজু মাস্টার আমাদেরকে একজন গাইড দিয়ে বলে দিলেন, কপাল ভাল হলে দেখা হয়ে যেতে পারে বনে মায়া হরিণের সঙ্গে।

গাইড জানালেন, বন ঘুরে দেখার নানান হাঁটাপথ আছে। একটি হাঁটাপথে গেলে আধঘণ্টায় দেখা যায় বনের কিছু অংশ। আরেকটায় একঘণ্টায় দেখা যাবে অনেকটা বনভূমি। আর অপর একটি হাঁটাপথে তিনঘণ্টায় দেখা যাবে প্রায় পুরো বন।

হাতে সময় নেই, তার ওপর সঙ্গে বাচ্চা-কাচ্চা। বনবাদাড়ে সন্ধেয় ঘোরাফেরাও ঝুঁকিপূর্ণ। আমরা আধঘণ্টার হাঁটাপথ বেছে নিলাম।

একসময় সাতছড়ির নাম ছিল রঘুনন্দন পর্বত। এই পাহাড়ের নানান জায়গায় বইছে সাতটি ছড়া। তাই নাম হয়েছে–সাতছড়ি। সিলেটে পাহাড়ি খালকে বলে ছড়া। সাতটি ছড়া সবসময় থাকে না। কয়েকটি আছে শুধু বর্ষার সময় পানি থাকে। অন্য সময় এসব শুকনো ছড়া দিয়ে চলাচল করে লোকজন। ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের দু'পাশে সাতছড়ি। বামদিকে ঘন জঙ্গল। রাস্তার ডানে লোকজনের ঘুরে বেড়াবার ব্যবস্থা। মূল রাস্তা থেকে ধাপে ধাপে উঠেছে টিলা। আমাদের সবচে' ছোট সদস্য নাফিসা, বয়স আড়াই বছর, আর সবচে' বড় আমি। চলেছি সরু এক পথে। দু'পাশে গাছগাছালি। একজনের পেছনে আরেকজন হাঁটছি। মাথা ছাড়িয়ে অনেক ওপরে গাছের চূড়া। যেন আকাশ ফুঁড়তে চায়। পেছনে মাথাটা হেলিয়ে দেখতে হয় আগা। অজস্র পাতা ছড়িয়ে আছে রাস্তার ওপর। পায়ের চাপে মড়মড় শব্দে ভাঙছে পাতা।

সাতছড়ির আরেকটি ব্যাপার, এখানে রয়েছে কয়েক শ' পাম গাছ। অনেক উঁচু। পাম তেল সংগ্রহের জন্যে গাছগুলো লাগানো হয়েছে পরিকল্পিতভাবে। ছোট্ট রাস্তাটির দু'পাশে ঘন জঙ্গল। বাঁশ ও বেতের ঝোপ। চারপাশে নানান গাছ–মান্দার, বেলপই, আশার, শেওড়া, ভরভুটি আওয়াল, শিমুল গাছ। শিমুলের বীজের সঙ্গেই আছে তুলা। এই প্রথম শিমুল তুলা দেখল বাচ্চারা। তুলা নিয়ে মুখের কাছে এনে ফুঁ দিয়ে ছড়িয়ে দিল আকাশে।

আমরা যতই পাহাড়ের অভ্যন্তরে চলেছি, গাছের সংখ্যাও বাড়ছে। গাছগাছালির ভিড়ে এদিকটা অন্ধকারমত। নাকে লাগল বনের ঘাসপাতার গন্ধ। বাড়ছে পাখির কূজন। ময়না, ঘুঘু, বুলবুলি কত জাতের নাম-না জানা পাখি। কিছু খুব ছোট, কিন্তু ডাকছে জোরে। হঠাৎ বাচ্চাদের 'মাংকি' 'মাংকি' শুনে দেখলাম অসংখ্য বানর। এক গাছ থেকে আরেক গাছে ছুটে বেড়াচ্ছে। বানরগুলো সাইজে একটু ছোট। পরে আরজু মাস্টার বললেন: সাতছড়িতে এ বছর বানর ও হনুমান অন্যান্য বছরের চেয়ে বেশি বাচ্চা প্রসব করেছে।

পাহাড়ের আরও ভেতরে যেতে ইচ্ছে করল। কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে আসছে। তার ওপর আজই ফিরতে হবে সিলেট। তাই সোজা পথে না গিয়ে বামে একটি রাস্তা দেখে সেটি ধরে

মনির বুক স্টল ও সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র

প্রোপ্রাইটর: মনির হোসেন

এখানে সেবা প্রকাশনী ও প্রজাপতি প্রকাশনের নতুন ও সমস্ত রিপ্রিন্ট বই পাওয়া যায়।

মুক্তবাংলা মার্কেট সংলগ্ন, মীরপুর-১

মোবাইল: ০১৯১২-২২৫৫৮৩

চললাম। উঠলাম একটি টিলায়। গাছপালা তেমন নেই। ওপরটা বড় টেবিলের মত সমতল। হঠাৎ ঝপ্ করে নেমে গেছে টিলাটা। নিচে খাদ। ওখানে লাগানো হয়েছে নারকেল ও পাম গাছ। ডগা দেখা যাচ্ছে না। পাম ট্রিগুলো খুব সুন্দর। সবাই ছবি তুললাম। নাফিসা লাফালাফি করছে। ভয় হলো, একটু পা ফসকালে একদম নিচে গিয়ে পড়বে। তাই ছবি তোলা শেষ করেই সবাইকে নিয়ে হাঁটতে লাগলাম।

খানিক যেতেই পড়ল কয়েকটি ঘর। ডানদিকে ছোট শেড। খড় দিয়ে ছাতার মত ছাউনি। চারপাশে কাঠের বেড়া। শেডের মধ্যে খুঁটির সঙ্গে লোহার চিকন শিকল দিয়ে বাঁধা একটি বানর। বাচ্চারা খুব মজা পেল। এই প্রথম কাছ থেকে দেখছে বানর। বাচ্চাদের দেখে লাফাতে শুরু করল বানরটা। বাচ্চারা আরও মজা পেল।

'বান্দর-বান্দর!'

'কলা দে!'

'লেজ ধরে টান দে!'

বানরের শেড ছেড়ে সামনে পেলাম একটি মিনি জেল। উপর দিক খোলা। চারপাশে কাঠের বেড়া। ছোট্ট জেলটিতে আছে একটি মায়া হরিণ। বন ছেড়ে মানুষের বাড়িঘরের কাছে চলে এসেছিল। ওকে ধরে ফরেস্ট বিভাগের কর্মকর্তার কাছে দিয়ে গেছে। একটু জখম হয়েছে। সুস্থ হলেই ছেড়ে দেয়া হবে বনে। বাচ্চারা খাঁচার ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ছোঁয়ার চেষ্টা করল হরিণ। ওটা খুব নিরীহ। অলসভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল একটু দূরে। বানরের কাজ দেখে বাচ্চারা যেভাবে মজা পেয়েছিল, হরিণটি দেখে তেমন মজা পেল না। তবুও কাছ থেকে হরিণ ছোঁয়ার আনন্দ তো আছেই।

টিলা বেয়ে সমতলে নেমে এলাম আমরা। ওখানে বড়-বড় গাছ কেটে মাঝ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে চলার পথ। লোকজনের বসার জন্য চেয়ার দিয়েছে বনবিভাগ। আমরা একটু বসলাম। মাথার উপরের ডেউয়া গাছের ডালে ছুটোছুটি করছে কালোমুখী হনুমান। অনেকগুলো। গাছ থেকে মাটিতে পড়ছে ডেউয়া ফল।

রাত ঘনিয়ে এসেছে। আজকেই কম করে হলেও এক শ' মাইল পথ পাড়ি দিয়ে ফিরতে হবে সিলেট শহরে।

গেটের কাছে যাওয়ার পর আবার দেখা গেল আরজু মাস্টারের সঙ্গে। চা ও পান খাওয়াতে চাইল। কো-ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের সফলতার কথা বলল। শত-শত বছর ধরে এ এলাকার মানুষ সাতছড়ি বনের গাছের উপর নির্ভরশীল। গাছ কেটে নিত এলাকার মানুষ। বা বলা যায় চুরি করত বনবিভাগের কাছ থেকে। সহজে বন্ধ করা সম্ভব নয় গাছ কাটা। তবু কো-ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের কারণে অন্তত ষাট ভাগ অবৈধভাবে গাছ কাটা বন্ধ হয়েছে।

আমরা বললাম, 'কই, আপনার মায়া হরিণের দেখা পেলাম না তো!'

আরজু মাস্টার বললেন, 'আছে, বনের আরও ভেতরে। এই বনে অবশ্য কম। ভোরবেলা হঠাৎ হঠাৎ দেখা দেয়।' রাস্তার উল্টো দিকের ঘন জঙ্গল দেখিয়ে দিলেন। 'ওই দিকের জঙ্গলে ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরে বেড়ায় মায়া হরিণ।'

তিনি অনেকবার দেখেছেন। এলাকার লোকজন প্রায়ই দেখে।

আমরা গাড়িতে উঠব, এমন সময় আমাদের নেশা লাগিয়ে দিলেন তিনি। 'আসেন একদিন চান্নি রাইতে। আসমান ভাইঙ্গা জোসনা নামব। বনের গাছপালার ফাঁকফোকর দিয়া গইল্যা পড়ব জোসনার আলো। জোসনায় জঙ্গলের ভেতরের সব দেখা যায়। পাতায় শব্দ না তুইল্যা, হাঁটবেন, হঠাৎই দেখবেন একঝাঁক মায়া হরিণ। দল বাইন্ধা হাঁটতাছে জঙ্গলে।'

জোছনার কথা শুনে আমরা বললাম, 'কোনও জোছনা রাতে ঠিকই আসব।'

হয়তো সেই দিন কেউ গাইবে: 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে, উছলে পড়ে আলো...'

সেই গানটি রবীন্দ্রনাথ শুধু সেই রাতটির জন্যেই বুঝি লিখেছিলেন! ■

অতিলৌকিক উপন্যাসিকা

নিতাই ফকির

তৌফির হাসান উর রাকিব

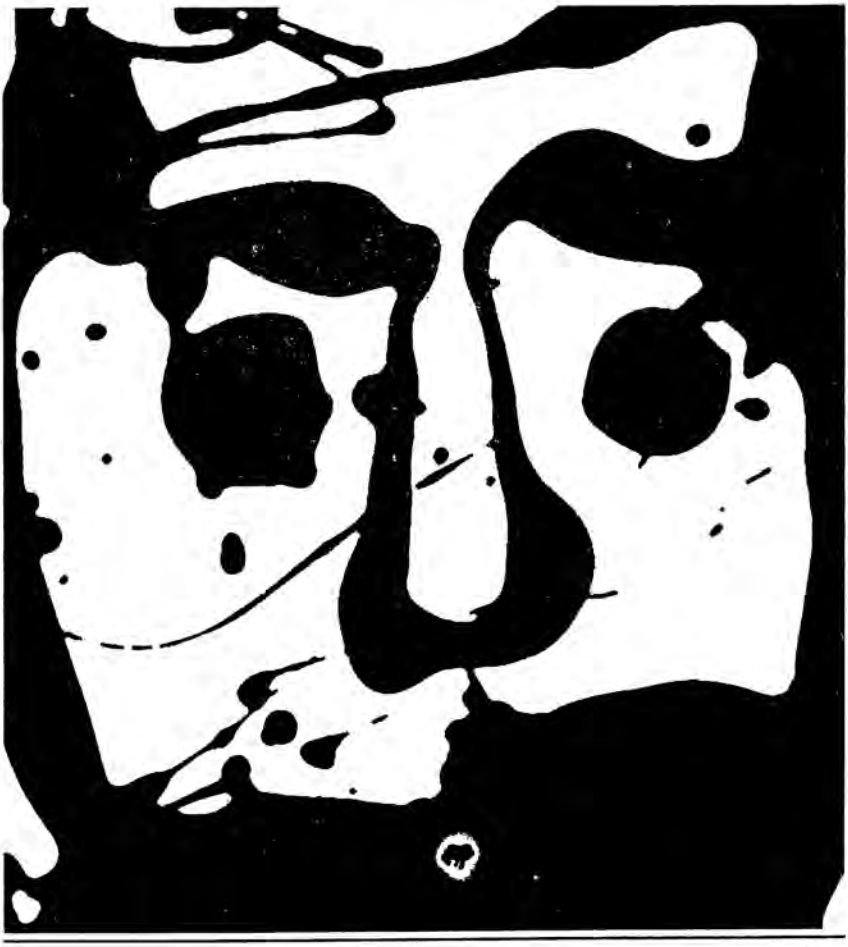

এক

শেষ বিকেলের রাঙা আলোর পরতে-পরতে বিষাদ মাখানো। শঙ্খ নদীর শান্ত জলের ওপর পাতলা একখানা চাদরের মতই ছড়িয়ে আছে সে লালচে আভা।

নীড়ে ফিরতে শুরু করেছে বুনো পাখির ঝাঁক। পদ্মপাতার আড়ালে-আবডালে লুকিয়ে থাকা ব্যাঙের দলের কোলাহলও খানিকটা থিতিয়ে এসেছে।

গাছের সবুজ পাতার শরীর ছুঁয়ে বয়ে চলা বাতাসে কীসের যেন চাপা হাহাকার। কান পেতে শোনা যায় না বটে, তবে দিব্যি অনুভব করা যায়।

এমন পরিবেশে মানুষের নিজেকে বড্ড ক্ষুদ্র মনে হয়, উদাস-উদাস লাগে। প্রকৃতির সীমাহীন রহস্যময়তা তাকে বিমোহিত করে, বিরক্ত করে না।

কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে রেগে বোম হয়ে আছে নিতাই ফকির; মেজাজ পুরোপুরি খিঁচড়ে আছে তার। অবশ্য এজন্য তাকে খুব একটা দোষ দেয়ারও উপায় নেই; পেট খালি থাকলে কারই বা মন ভাল থাকে?

আজ দু'দিন হতে চলল উদরে কোনও দানাপানি পড়েনি তার। সহসা কিছু জোগাতে পারবে, তেমন কোন সম্ভাবনাও চোখে পড়ছে না। মেজাজ তিরিক্ষি না হয়ে উপায় কী?

চম্পকনগর হিন্দু অধ্যুষিত গ্রাম। মুসলমান পরিবার প্রায় নেই বললেই চলে। জনপদের পাশ দিয়ে বয়ে চলা শঙ্খ নদীতে মাছ ধরে তিন বেলার আহার জোগায় কয়েক ঘর জেলে পরিবার; বাকি সবাই কৃষিকাজ করে। কারও নিজের জমি আছে, কেউবা বর্গা চাষি।

তবে অর্থ-বিত্তের প্রাচুর্য না থাকলেও, গ্রামবাসীদের কেউই তেমন অসুখী নয়। যেখানে প্রত্যাশা কম, সেখানে অতৃপ্তির কালো ছায়াও কদাচিৎই চোখে পড়ে।

গাঁয়ের শেষ মাথায়, যেখানে শঙ্খ নদী বাঁক নিয়ে হারিয়ে গেছে দূর দিগন্তে; পাশাপাশি হাতে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে দুটো প্রকাণ্ড তালগাছ। জায়গাটা বেশ উঁচু, ভরা বর্ষাতেও ডোবে না। জোড়া গাছের গোড়া থেকে নদীর পাড় পর্যন্ত সবুজ গালিচার মত বিছিয়ে আছে কচি দূর্বাঘাস। ঝোপঝাড়ের লেশমাত্রও নেই কোথাও।

মাথায় পাকা তাল পড়ে অক্কা পাওয়ার আশঙ্কাটুকু আমলে না নিলে, জায়গাটা হাত-পা ছড়িয়ে বসে গল্প করার জন্য পুরোপুরি আদর্শ। তবুও চম্পকনগরের লোকেরা নিতান্ত ঠেকায় না পড়লে, ও পথ মাড়ায় না।

জায়গাটাকে ভয় পায় ওরা; ভীষণ ভয়।

বুড়োরা বলে, মাঝরাতে অশরীরীদের হাট বসে ওখানটায়। অতীতে বেশ কয়েকবারই রাতের বেলায় ওখানে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে গাঁয়ের লোক। স্বভাবতই তালতলাটার বদনাম রটে গেছে। অতি উৎসাহ দেখাতে গিয়ে বেঘোরে জান খোয়ানোর কোন মানে হয় না। তাই এড়িয়ে চলার পন্থাটুকু বেছে নিতে কসুর করেনি চম্পকনগরের মানুষজন।

লোকের ধারণা, কালো বিড়ালের ভিতরে অতিপ্রাকৃত কোন ব্যাপার রয়েছে। একারণেই কালো বিড়ালকে ভয়ানক অশুভ মনে করা হয়।

তবে অন্য সবাই ঢিবিটা থেকে দূরে-দূরে থাকলেও, একজন থাকেনি; নিতাই ফকির! এক সন্ধ্যায়, ভূতের ভয়ে জবুথুবু সবার চক্ষু চড়কগাছ করে দিয়ে, অভিশপ্ত তালতলাটাতেই গিয়ে আবাস গেড়েছে ক্ষ্যাপা লোকটা!

উন্মাদটা কে, কোত্থেকে এসেছে; কেউই জানে না। নিজের সম্পর্কে কোন কিছুই খোলসা করে বলেনি সে। উৎসুক জনতার হাজারো প্রশ্নের জবাবে নিজের নামটাই কেবল বিরক্তভরা কণ্ঠে বয়ান করেছে সে; নিতাই।

সঙ্গে 'ফকির' পদবীটা লোকে স্বপ্রণোদিত হয়েই জুড়ে দিয়েছে; নিতাইয়ের মতামতের ধার ধারেনি। নিতাইও কখনও এর প্রতিবাদ করেনি, বিনাবাক্যব্যয়ে মেনে নিয়েছে। অবশ্য তার এহেন নামকরণের পিছনে তার চেহারা-সুরত আর কিম্ভূতকিমাকার পোশাক-আশাকের যে একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল, তা নিশ্চয়ই আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

তারপর কালে-কালে শঙ্খ নদীতে গড়িয়ে

গেছে অনেকখানি জল। চম্পকনগরের বাসিন্দাদের কাছেও ধীরে-ধীরে খোলতাই হয়েছে নিতাই ফকিরের স্বরূপ। পাগলাটে লোকটা যে আদতে কত শক্তিশালী একজন গুণিন; অদ্ভুত বেশভূষার আড়ালে কতটা ভয়ঙ্কর ক্ষমতা রাখে, সেসব বুঝতে আর বাকি নেই কারও।

নিতাই ফকির এমন একজন মানুষ, যাকে উৎসব-পার্বণে নিমন্ত্রণ করা হয় না ঠিকই, কিন্তু বিপদে পড়া মাত্রই তার কথা স্মরণ করা হয়।

বাড়ি বন্ধ করা থেকে শুরু করে বদ নজর কাটানো, এসব কাজে হরহামেশাই তার ডাক পড়ে। আর আলগা বাতাস কিংবা জিনে ধরা রোগীর কথা তো বলাই বাহুল্য।

মানুষের রকমারি মুশকিল আসানে সর্বদা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেও, অজ্ঞাত কারণে কেউই খুব একটা পছন্দ করে না তাকে। এড়িয়ে চলে; ভয় পায়। তার কাছে ঘেঁষার কিংবা তাকে ঘাঁটানোর সাহস করে না কেউ। লোকটার মধ্যে অশুভ কী যেন একটা আছে। একশো হাত দূর থেকেও যেটা স্পষ্ট ঠাহর করা যায়।

অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকিয়ে বিড়-বিড় করে কাকে যেন অভিসম্পাত করল নিতাই ফকির। গলা খাঁকারি দিয়ে একদলা থুতু ফেলল দোরগোড়ায়। তারপর কয়েক কদম পিছিয়ে গিয়ে ধপ্ করে বসে পড়ল স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে। আলো ভাল লাগে না তার, সে ভালবাসে অন্ধকার।

ছোট্ট খুপরি ঘরটায় আসবাবপত্রের কোন বালাই নেই। মেঝেতে জরাজীর্ণ একখানা চাটাই আর ঘরময় ছড়িয়ে থাকা কিম্ভূতকিমাকার কিছু জিনিসপত্র; সম্পত্তি বলতে কেবল এই-ই আছে নিতাই ফকিরের।

চারপাশে দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নড়বড়ে চারটে বাঁশের বেড়া। ওদের যে কোন একটা বয়সের ভারে হাল ছেড়ে দিলেই যে হুড়মুড় করে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে সব ক'টা, সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপও নেই ঘরের মালিকের।

চালার ছনগুলোর দশাও তথৈবচ; আর কতদিন টিকবে খোদা মালুম! মাঝারি আকারের একটা ঝড়েও যে চালাসুদ্ধ উড়ে যাবে ঘরটা, এহেন বাজি ধরার লোকের অভাব হবে না চম্পকনগরে।

হাত বাড়িয়ে তেল চিটচিটে ঝোলাটা কাছে টেনে নিল নিতাই; ইতিকর্তব্য ঠিক করে ফেলেছে। সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে, আঙুল বাঁকা করতেই হয়। কী আর করা?

আবারও নিচু স্বরে বার কয়েক খিস্তি করল সে; রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলছে তার। ভূত-প্রেতের দল সব গেল কোথায়? ওরা দলবেঁধে তল্লাট ছেড়ে পালালে তো তার অন্নসংস্থান হুমকির মুখে পড়বে!

ঝোলাটা থেকে ছোটমতন একটা খুলি বেরোল। খুলিটা মানুষের না, বিড়ালের। লোকের ধারণা, কালো বিড়ালের ভিতরে অতিপ্রাকৃত কোন ব্যাপার রয়েছে। একারণেই কালো বিড়ালকে ভয়ানক অশুভ মনে করা হয়।

তবে নিতাই জানে, প্রেতলোকে সংযোগ স্থাপনের জন্য বিড়ালের খুলি ভীষণ উপকারী হলেও, রঙের কোন প্রভেদ নেই এখানে। সাদা-কালো-বাদামী, যে কোন রঙের বিড়াল দিয়েই দিব্যি কাজ চালিয়ে নেয়া যায়।

তবে জন্মান্ধ বিড়ালের ব্যাপারটা পুরোপুরি আলাদা। অন্যদের তুলনায় এই বিড়ালদের ক্ষমতা অনেক বেশি। যে কোন গুণিনের কাছেই তাই বাড়তি কদর পায় একটা জন্মান্ধ বিড়াল!

খুলিটা সামনে রেখে শিরদাঁড়া সোজা করে পদ্মাসনে বসল নিতাই ফকির। ঝোলা ঘেঁটে সবুজ রঙের ছোট একটা শিশি বের করা হয়েছে। লম্বা দম নিয়ে শিশিটা থেকে দু'ফোঁটা তরল খুলিটার শূন্য দুই অক্ষিকোটরে ফেলল সে। বিচ্ছিরি একটা শব্দ হলো। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সেদিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল সে, তারপর চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা সশব্দে ছাড়ল।

বেশ খানিকটা সময় নিয়ে আলতো করে চোখ মুদল নিতাই; পরক্ষণেই অনুচ্চ স্বরে মন্ত্র জপতে শুরু করল। মন্ত্রের ভাষাটা প্রাচীন, চেনা কোন ভাষার সঙ্গে বিন্দুমাত্র মিলও নেই।

ধীরে-ধীরে বাড়তে লাগল তার গলার আওয়াজ; দূর থেকে দূরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল ভরাট কণ্ঠের উত্তাপ।

নড়বড়ে ঘরটাকে ঘিরে থাকা বাতাসে তীব্র

আলোড়ন উঠল। গোত্তা মেরে নেমে আসা সাঁঝের আঁধারও যেন অদৃশ্য দেয়ালে বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়াল।

একঘেয়ে অপার্থিব কণ্ঠে অশরীরীদেরকে ডেকে চলেছে নিতাই ফকির।

অল্পক্ষণের মধ্যেই পরিস্থিতি পুরোপুরি পাল্টে গেল। ঝোড়ো হাওয়ায় ভর করে একের পর এক এসে হাজির হতে লাগল ধোঁয়াটে ছায়ারা! যেন হ্যামিলিনের বংশীবাদকের বাঁশির টানে ছুটে এসেছে ইঁদুরের পাল!

ছোট্ট কুঁড়েটাতে যখন আর তিল ধারণের জায়গাও রইল না, তখনই কেবল মন্ত্র জপায় ক্ষান্ত দিল নিতাই ফকির। রক্তবর্ণ চোখে ফিরে তাকাল তাকে ঘিরে থাকা কায়াহীনদের দিকে।

তার অগ্নিঝরা দৃষ্টির সামনে রীতিমত কুঁকড়ে গেল দলটা; মৃদু একটা গুঞ্জন উঠল জটলায়। নিতাইয়ের কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরত্ব বজায় রাখতে চাইছে ওরা।

নিতান্ত বাধ্য হয়েই আজ এখানে সমবেত হতে হয়েছে ওদের, কেউই স্বেচ্ছায় আসেনি। অন্যের মর্জিমাফিক চলতে কারই বা ভাল লাগে? অশরীরীরাও যে তীব্র অনুভূতিপ্রবণ, ক'জনই বা জানে সেটা!

দীর্ঘ সময় নিয়ে চারপাশে নজর বুলাল নিতাই ফকির। চোখজোড়া ভাঁটার মত জ্বলছে তার; হাপরের মত ওঠানামা করছে শীর্ণ পাঁজর।

আচমকা বাম হাত বাড়িয়ে খপ্ করে একটা ধূসর ছায়াকে চেপে ধরল সে। তার হাতের মুঠোয় গুঙিয়ে উঠল ওটা, দ্রুত পিছিয়ে গেল অন্যরা।

মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে ডান হাতটা দোলাল নিতাই ফকির; আপাতত অন্য কাউকে আর দরকার নেই তার।

হাত নাড়াতে যা দেরি, চোখের পলকে একযোগে বাতাসে মিলিয়ে গেল সবক'টা ছায়া। বেমালুম গায়েব হয়ে যাবে ওরা; ফের নিতাই ফকির না ডাকলে, এই তল্লাটে ওদের টিকিটিরও সন্ধান মিলবে না আর।

মুঠোবন্দি অবয়বটার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে কী যেন বলল নিতাই ফকির। সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা দোলাল ওটা।

মুক্তি পাওয়া মাত্রই একছুটে হারিয়ে গেল বাইরের অন্ধকারে। কাঁধে অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করতে চলেছে।

দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে বসল পরিশ্রান্ত নিতাই ফকির।

বীজ বপন করা হয়ে গেছে; এখন শুধু ফসল ঘরে তোলার অপেক্ষা।

দুই

কৃষ্ণপক্ষ চলছে। আকাশে ঝুলে থাকা ক্ষয়া চাঁদকে সঙ্গ দিচ্ছে উজ্জ্বল কিছু তারা। দুধের সরের মত মিহি কুয়াশা ঝরছে বিরামহীন।

শনের বনে আছড়ে পড়া বাতাসের আর্তনাদ পিলে চমকে দেয়। তার সাথে যদি যোগ হয় দলছুট শেয়ালের হাঁক, তাহলে তো সোনায় সোহাগা।

ভেজা আইলের ওপর দিয়ে জোর কদমে হেঁটে চলেছে কালু লাঠিয়াল, পিছন থেকে তাকে ছায়ার মত অনুসরণ করছে নিতাই ফকির। কয়েক কদম পরপরই ঘাড় ঘুরিয়ে ফিরে তাকাচ্ছে কালু, তারপর আবারও পা বাড়াচ্ছে সামনে। মন মেজাজ ভাল নেই তার; চেহারা ভরা আষাঢ়ের আকাশের মতই গুমট।

নিতাইকে দু'চোখে দেখতে পারে না সে। আর আজ কিনা তাকেই জামাই আদর করে চেয়ারম্যান বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে! কপালের ফের বুঝি একেই বলে।

না নিয়ে অবশ্য উপায়ও ছিল না। সন্ধ্যার পরপরই আচমকা ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছে চেয়ারম্যানের ছোট মেয়ে চৈতালি।

আলগা বাতাসের লক্ষণগুলো বুঝতে বেগ পেতে হয়নি কারও। তাই একান্ত বাধ্য হয়েই নিতাই ফকিরকে নিতে নিজের সবচেয়ে বিশ্বস্ত লাঠিয়াল, কালুকে পাঠিয়েছে নরেন চেয়ারম্যান।

আশপাশে দশ গাঁয়ে নিতাই ফকিরের মত কামেল গুণিন আর দ্বিতীয়টি নেই। তাই সুবোধ বালকের মত নিজের পছন্দ-অপছন্দের তালিকাটা আপাতত শিকেয় তুলে রাখতে হয়েছে তাকে। ইতিপূর্বে কখনওই আর চেয়ারম্যান বাড়িতে ডাক পায়নি নিতাই ফকির।

চরম অস্বস্তি নিয়ে আবারও পিছন ফিরে তাকাল কালু। সঙ্গের অদ্ভুতুড়ে লোকটাকে একবিন্দুও বিশ্বাস করে না সে। সারাক্ষণ অশুভ

একটা বলয় ঘিরে থাকে লোকটাকে; কাছাকাছি হলেই গা শিউরে ওঠে। ব্যক্ত করা যায় না; কিন্তু বুকে ঠিকই কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়।

একটা অভিশপ্ত জায়গায় একা-একা থাকে। দিনরাত কী যে করে, ভগবানই জানেন! কোত্থেকে এসেছে, কেন এসেছে, জিজ্ঞেস করলেও বলে না। নির্ঘাত কোন বদ মতলব নিয়েই চম্পকনগরে এসে হাজির হয়েছে ব্যাটা। ভূত-প্রেত নিয়ে কারবার কি আর ভালমানুষে করে? ভাবতেই তো গায়ে কাঁটা দেয়।

কালুর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তাকে দাঁত কেলানো একটা বিটকেলে হাসি উপহার দিল নিতাই ফকির। জানে; হাসিটা নির্বোধ লাঠিয়ালের পিত্তি জ্বালিয়ে দেবে।

হলোও তাই।

রাগে চাঁদিতে আগুন ধরার উপক্রম হলো কালুর। পাকা বাঁশের তেলতেলে লাঠিটার ওপর তার চেপে বসা আঙুলগুলো নিমিষেই রক্তশূন্য হয়ে উঠল।

দেবে নাকি হারামজাদার মাথা বরাবর একটা ঘা বসিয়ে? এক আঘাতেই কম্ম কাবার হয়ে যাবে, দ্বিতীয়বার লাঠি তোলার ফুরসত মিলবে না। তল্লাটের সেরা পালোয়ান কালু। তার লাঠির বাড়ি খেয়ে যমের দুয়ার থেকে বেঁচে ফেরার কোন নজির নেই।

বহু কষ্টে নিজের ওপর জোর খাটিয়ে ছলকে ওঠা রাগটাকে দমন করল কালু। আচমকা চৈতালির পবিত্র মুখখানা ভেসে উঠেছে তার মনের পর্দায়। এই মুহূর্তে নিতাই ফকিরকে প্রাণে মেরে ফেললে, চৈতালিকেও হয়তো আর বাঁচানো যাবে না। আপাতত হিসেবটা তোলা থাকুক। পরে একসময় কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে নেয়া যাবে।

কালুর বেহাল দশাটা তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করল নিতাই ফকির। মুখ টিপে হাসল খানিকক্ষণ।

বিশালদেহী পালোয়ানের মনের কথাগুলো বুঝতে মোটেও বেগ পেতে হচ্ছে না তাকে, সবকিছু তার কাছে ভরদুপুরের দিবালোকের মতই ফকফকা পরিষ্কার।

তবে ও নিয়ে মোটেও দুশ্চিন্তায় ভুগছে না সে; উল্টো পুরো ব্যাপারটায় ভীষণ আমোদ পাচ্ছে। বলদটাকে আরও খানিকটা বাজিয়ে দেখলে কেমন হয়?

গলা খাঁকারি দিল নিতাই ফকির। হালকা গলায় বলল, 'তুমি আমারে এত অপছন্দ কর ক্যান, কালু?'

ক্ষণিকের জন্য থমকে গেল কালুর সম্মুখগতি, পরক্ষণেই অবশ্য নিজেকে সামলে নিল সে। 'আফনেরে আমি অপছন্দ করুম ক্যান? অপছন্দ করি না।'

হো-হো করে হেসে উঠল নিতাই, সশব্দে থুতু ফেলল পাশের সরিষা খেতে। 'কর, কর। মুখে স্বীকার যাও আর না যাও, তুমি যে আমারে দেখবার পার না, হেইডা আমি জানি।'

জবাব দিল না কালু, নীরবে পথ চলতে লাগল।

তবে এত সহজে তাকে নিস্তার দেয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছেও নেই নিতাই ফকিরের। আবারও মুখ খুলল সে, 'আমারে দেখলেই তোমার মুখ-চোখ কিরাম জানি শক্ত হইয়া যায়। কারণডা কী?'

'আমার চেহারাই এমুন,' বিরস কণ্ঠে বলল কালু। পথ চলা থামায়নি। 'ভগবান তো আর সবতেরে এক রহম কইরা বানায় নাই।'

'তোমার চেহারা কিন্তুক খারাপ না। বেহুদা ভগবানের দোষ দিতাসো ক্যান?' দরাজ গলায় বলল নিতাই ফকির। 'কেবল আমার সামনে আইলেই তোমার খোমাড়া ফাইলার তলার মতন কালা হইয়া যায়। ব্যাপার কিছু মাথায় আহে না।'

চুপ করে রইল কালু; কী জবাব দেবে? মিথ্যে কিছু বলেনি নিতাই ফকির। মনের ভাব গোপন করার কায়দা-কানুন কমই জানে কালু।

'চেয়ারম্যান সাবের বাইত্তে তো আচার-অনুষ্ঠান লাইগাই থাকে বারো মাস। তুমিই তো হগলতেরে দাওয়াত দেও। ঠিক না?' শীতল স্বরে বলে উঠল নিতাই; কণ্ঠের আমুদে ভাবটা নেই আর। 'কই, আমি তো কুনুদিন কুনু নিমন্তন্ন পাইলাম না?'

পুরোপুরি ঘাবড়ে গেল কালু, দু'চোখে অন্ধকার দেখছে সে। কথার মারপ্যাঁচে তাকে ঘায়েল করার চেষ্টা করবে গুণিন, এটা সে কস্মিনকালেও ভাবেনি। তা নাহলে জবাবটা

নির্ঘাত চেয়ারম্যান সাহেবের কাছ থেকে জেনে আসত সে। তাহলে আর এখন এভাবে ফেঁসে যেতে হত না তাকে।

একটা জুতসই জবাবের আশায় মরিয়া হয়ে স্মৃতির ঝাঁপি হাতড়ে বেড়াল কালু। নিজের স্বল্পবুদ্ধির জন্য এই প্রথম ভীষণ আফসোস হচ্ছে তার।

শেষটায় অনেকটা যন্ত্রচালিতের মত বলে উঠল, 'আমি হইলাম গিয়া হুকুমের গোলাম। হুকুম দেয়ার মালিক তো আর আমি না।'

বিস্ফারিত নেত্রে কয়েক মুহূর্ত কালুর দিকে তাকিয়ে রইল নিতাই ফকির, পরক্ষণেই হেসে উঠল গলা ফাটিয়ে। 'তুমি তো দেখতাসি দার্শনিক হইয়া গেসো, কালু! তাজ্জব কারবার!'

মুখ ব্যাদান করে তার দিকে তাকিয়ে রইল কালু। দার্শনিক বলতে ঠিক কী বুঝিয়েছে তান্ত্রিক, ব্যাপারটা সে পুরোপুরি বোঝেনি। কথাটা ভাল নাকি মন্দ?

যা হয় হোক; এসব তত্ত্ব কথার ধার ধারে না কালু লাঠিয়াল। যার জীবন চলে পেশি-শক্তি আর লাঠির জোরে, বাঁকা কথার মানে বোঝার দরকার নেই তার।

হাসি থামা মাত্রই আবারও গম্ভীর হয়ে গেল নিতাই ফকির। ভারিক্কি গলায় বলল, 'আমারে ক্যান যে তোমাগো পছন্দ হয় না, বিষয়ডা হাজাই আমার মাথায় আহে না, কালু। আমি তোমাগো উপকার ছাড়া অপকার করি নাই কুনুদিন। কাউরে জিনে আছর করলে হেইডা ছাড়াই, আলগা বাতাসও খেদাই। এর কুনু দাম নাই তোমাগো কাছে?'

অপ্রত্যাশিতভাবে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল কালু পালোয়ান। হাঁটা থামিয়ে ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল। নিতাই ফকিরের আধহাত তফাতে এসে ক্রোধান্বিত গলায় বলল, 'আফনে আসার আগে এই চম্পকনগরে কুনু ঝামেলা আছিল না। কাউরে কুনুদিন জিনে ধরে নাই। আলগা বাতাস লইয়াও কাউর কুনু দুশ্চিন্তা আছিল না। আফনে গেরামে আসার পর থাইকাই বেবাক হাঙ্গামা শুরু হইসে। আফনেই যে সব নষ্টের গোড়া, হেই কথা হগলেই জানে।'

ভীষণ চমকে উঠল নিতাই ফকির। গ্রামের চাষাভুষারা যে গোটা ব্যাপারটাকে এভাবে দেখে, এটা তার কল্পনাতেও আসেনি কখনও। জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল সে; কালুর পেট থেকে আরও খানিকটা কথা বের করা দরকার।

তাকে অবশ্য বাড়তি কোন কৌশল খাটাতে হলো না। আপনমনেই তোতাপাখির মত বকবক করে চলল কালু। রোখ চেপে গেছে তার; ঠিকরে পড়ছে কণ্ঠের ঝাঁঝ। 'আফনে আইসা বসত গাড়সেন ওই ভুতুইড়া তালতলায়। জিন-পেত্নিগুলারে তাগো আস্তানা থাইকা খেদাইসেন। হের লাইগাই অরা অহন পুরা গেরামে ছড়াইয়া গেসে। আফনের ঝাল আমাগো উপরে ঝাড়তাসে।'

স্বস্তির নিঃশ্বাসটা সশব্দেই ফেলল নিতাই ফকির। যতটা আশঙ্কা করেছিল, পরিস্থিতি মোটেও ততটা গুরুতর নয়। আসল রহস্য এখনও গুপ্তই আছে। অযথাই তাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল খচ্চরটা।

তবে আপাতত মুখে কুলুপ এঁটে রাখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। হাতির বাচ্চাটাকে আজ আর বেশি খেপানোটা উচিত হবে না। মাথায় আগুন চড়ে গেছে ব্যাটার; এখন অযথা ঘাঁটাতে গেলে ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। আপাতত খুনোখুনি করার কোন মানে হয় না। কী দরকার অহেতুক খাল কেটে কুমির আনার?

বাকি পথটুকু কোনরকম উচ্চবাচ্য ছাড়াই নিরাপদে পাড়ি দিল ওরা।

মাঝে অবশ্য আচমকা জলা থেকে উঠে আসা একটা তাগড়া মেছোবাঘের সামনে পড়তে

পাবনায় সেবা প্রকাশনী ও প্রজাপতি প্রকাশনের যে-কোনও বই এবং রহস্যপত্রিকার জন্য আসুন–

বিকিকিনি মার্ট

২৯ নিউ মার্কেট, পাবনা।

মোবাইল: ০১৫৫৮-৬৯৬৯৩২

হয়েছিল ওদের! তবে নিতাইয়ের ওপর চোখ পড়া মাত্রই আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার জোগাড় হয়েছিল ওটার। কালবিলম্ব না করে তড়িৎ গতিতে পাশের কাশবনে সেঁধিয়ে গিয়েছিল চারপেয়ে জানোয়ারটা।

প্রথম সাক্ষাৎ হলেও, নিতাই ফকিরকে ঠিকঠাক চিনে নিতে এক লহমার বেশি লাগেনি বেচারার!

তিন

প্রফুল্লচিত্তে চেয়ারম্যান বাড়ির টানা বারান্দায় বসে আছে নিতাই ফকির। পাশে রাখা একটা জলচৌকির ওপর শোভা পাচ্ছে কাঁধের সার্বক্ষণিক ঝোলাটা।

সামনে রাখা নাস্তার পিরিচগুলো ছুঁয়েও দেখেনি সে। তীব্র ক্ষুধার সময় এসব সাধারণ খাবার মুখে রোচে না তার।

পাশেই একটা বেতের চেয়ারে গোমড়া মুখে বসে আছে নরেন চেয়ারম্যান। মেয়ের দুশ্চিন্তায় শ্যামবরণ মুখখানা হাঁড়ির তলার মত কালো হয়ে আছে তার। বার-বার কী যেন বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিচ্ছে সে; গুণিনকে তাগাদা দিতে সংকোচ হচ্ছে।

সেদিকে অবশ্য বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপও নেই নিতাই ফকিরের; চেয়ারম্যানের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না সে।

ক্ষমতাবান মানুষজনকে উপেক্ষা করার মধ্যে পৈশাচিক একটা আনন্দ আছে। নিজেকে সেই সুখ থেকে কিছুতেই বঞ্চিত করতে রাজি নয় নিতাই।

কামলা শ্রেণীর কিছু লোক ইতিউতি হাঁটাচলা করছে। তাদের উপরেই ঘোরাফেরা করছে তান্ত্রিকের নজর। এদের প্রায় প্রত্যেকেরই স্বাস্থ্য ভাল; তুকে বাড়তি একটা তেলতেলে ভাব আছে। হলফ করে বলা যায়, চেয়ারম্যান বাড়িতে খেয়ে-পরে বেশ সুখেই আছে ওরা।

অন্তরের অন্তস্তলে ঈর্ষার একটা ছাইচাপা আগুনের অস্তিত্ব টের পেল নিতাই; বুক চিরে বেরিয়ে এল একটা দীর্ঘশ্বাস। বিমর্ষ মুখে আলতো করে মাথা নাড়ল সে; ঘাড় ঘুরিয়ে ফিরে তাকাল চেয়ারম্যানের দিকে।

'সমস্যা কার?'

'আমার ছোট মাইয়া, চৈতালির,' আমতা-আমতা করে বলল নরেন চেয়ারম্যান।

'কী হইসে, বিস্তারিত খুইলা কন।'

'সারাদিন মাইয়াডা ভালই আছিল। সন্ধ্যার পর হঠাৎ কইরা কেমুন জানি হইয়া গেল! কী থাইকা যে কী হইল, কিচ্ছুই বুঝলাম না। রসুই ঘরে অর মায়ের লগে খাড়াইয়া-খাড়াইয়া কথা কইতাসিল। দুম্ কইরা মাথা ঘুরান দিয়া পইড়া গেল! মাটিতে পড়ার পর কতক্ষণ এক নাগাড়ে গড়াগড়ি করল। ইচ্ছামতন চিল্লাইল। শেষমেশ আমার কইলজার টুকরাডার মুখ দিয়া ফেনা বাহির হইয়া গেসিল, ফকির সাব...' বলতে-বলতে গলা ধরে এল তার। সাময়িক বিরতি দিয়ে আবারও মুখ খুলল সে, 'এরপর শুরু হইল পাগলামি। হায়, ভগবান! যারে সামনে পাইসে, তারেই মারসে। কিল-ঘুষি-লাথি কিছুই বাদ দেয় নাই। এমনকী কয়েকজনরে কামড়াইয়া রক্তও বাহির কইরা ফালাইসে! অর মা-বইনের কথা আর কী কমু, আমারেও ছাড়ে নাই সে! শেষ পর্যন্ত আর দিশ-মিশ না পাইয়া আফনের লাইগা লোক পাঠাইসি।'

গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা দোলাল নিতাই ফকির। 'মাইয়া কই অহন?'

'অর ঘরেই আছে। তালা মাইরা থুইসি।'

মেরুদণ্ড টানটান করে বসল নিতাই। 'কাঁচা বয়স। এই বয়সে কী দরকার আছিল সন্ধ্যাবেলায় চুল ছাইড়া পুকুর ঘাডে যাওনের?'

'পুকুর পাড়ে তো সে খুব একটা যায় না...' বলতে গিয়ে বাধা পেল নরেন চেয়ারম্যান।

রীতিমত খেঁকিয়ে উঠল নিতাই ফকির, 'আফনে সারাদিন থাহেন বিচার-সালিশ লইয়া ব্যস্ত। মাইয়ার খবর আফনে জানবেন ক্যামনে? মাইয়ার মা'য় কই? তারে ডাকেন।'

ডাকতে হলো না। চৈতালির মা, হেমা, পর্দার আড়ালেই ছিল; ওদের কথোপকথনের সবটুকুই কানে গেছে তার। গুটি-গুটি পায়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল মহিলা।

একে চেয়ারম্যানের স্ত্রী, তায় আবার অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছে; স্বভাবতই অন্য দশ জন সাধারণ গ্রাম্য মহিলার তুলনায় অনেক বেশি আধুনিক হেমা। চলাফেরায়ও বেশ সাবলীল সে; পরপুরুষের সামনে আসা নিয়ে খুব

একটা জড়তা নেই তার ভিতরে। আর যেখানে নিজের মেয়ের জীবন বিপন্ন, সেখানে জড়তার কারণে আত্মগোপন করে থাকার তো প্রশ্নই আসে না।

তবে নিতাই ফকিরের সঙ্গে চোখাচোখি হওয়া মাত্রই তার মনে হলো, কাজটা করা মোটেও ঠিক হয়নি! আলাপচারিতাটা আড়াল থেকে চালালেই ভাল ছিল! লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা ওই চোখ দুটো কী মানুষের নাকি পিশাচের? মানুষের চোখ বুঝি এমনও হয়!

সর্বাঙ্গ ঢাকা থাকা সত্ত্বেও লোকটার সর্বগ্রাসী দৃষ্টির সামনে নিজেকে নগ্ন মনে হলো হেমার। অস্ফুট শব্দ করে নিজের অজান্তেই সভয়ে এক কদম পিছিয়ে গেল সে।

জিভ বের করে নিজের শুকনো ঠোঁটজোড়া আচ্ছামতন চেটে নিল নিতাই। ইত্যবসরে একাধিকবার মহিলার পা থেকে মাথা পর্যন্ত নজর বুলিয়ে নিয়েছে সে।

পেটানো দেহ, চমৎকার গড়ন; দেখলেই ভীষণ লোভ লাগে।

মনে-মনে নিজেকে অশ্রাব্য কিছু গালি দিল নিতাই। মেয়ের পিছনে না লাগিয়ে প্রেতটাকে মায়ের পিছনে লেলিয়ে দেয়া উচিত ছিল তার। তাহলে ফুর্তি খানিকটা বেশি মিলত।

তবে আফসোসের কিছু নেই। এবারে করা হয়নি বলে ভবিষ্যতেও আর কখনও করা যাবে না, এমন কোন মাথার দিব্যি দেয়নি কেউ! এই খেলা এখানেই শেষ নয়; অনন্তকাল ধরে চলবে।

নিতাই কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই কথা বলে উঠল হেমা। 'চৈতালি আইজ সারাদিন ঘরেই আছিল, পুকুর পাড়ে যায় নাই। অর চুলও খোলা আছিল না; আমি নিজে তেল দিয়া খোঁপা বাইন্ধা দিসি।'

নিজের চেয়ারে খানিকটা নড়েচড়ে বসল তান্ত্রিক। ভারী গলায় বলল, 'আফনে সত্য কইতাসেন তো? মিথ্যা কইলে কিন্তুক বিপদ হইতে পারে।'

নিস্পৃহ দৃষ্টিতে নিতাইয়ের দিকে তাকাল হেমা, একবারের জন্যও চোখের পলক ফেলছে না। 'সত্য কইতাসি। মিছা কথা কওনের কী আছে এইখানে?'

তাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করল না গুণিন, হাতের ইশারায় যেতে বলল।

ঝড়ের বেগে প্রস্থান করল হেমা। লোকটার কুৎসিত দৃষ্টির সামনে রীতিমত গা জ্বালা করছিল তার।

চার

চৈতালির ঘরটা অন্ধকার। কোনার দিকে অল্প আঁচে একটা দিয়াড়ি জ্বলছে, এছাড়া অন্য কোন আলো নেই বিশাল ঘরটায়। দরজা-জানালার কবাটগুলো বন্ধ। ভিতরের বাতাস ভারী হয়ে আছে ধূপের কড়া গন্ধে।

খাটের ওপর চিত হয়ে শুয়ে বেঘোরে ঘুমুচ্ছে যুবতী মেয়েটা। নিতাই ফকিরের আরকের ফল; কয়েক ঢোক পেটে পড়লে মদ্দা হাতিও ঘুমিয়ে কাদা হতে দিশ পায় না।

ঘরে ঢুকে ধীর পায়ে খাটের দিকে এগিয়ে গেল নিতাই ফকির। শ্বাসের তালে-তালে ওঠানামা করছে মেয়েটার উন্নত বুক; মন্ত্রমুগ্ধের মত দৃশ্যটা খানিকক্ষণ গিলল সে। নিজে সে শক্তসমর্থ একজন পুরুষ মানুষ; রিপুর তাড়না এখনও কমেনি তার। এখনই মেয়েটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ইচ্ছেটা পরিহার করতে নিজের সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধ করতে হলো তাকে।

অন্ধকার জগতের বাসিন্দা সে। ক্ষমতা বজায় রাখতে তাকেও কিছু অলিখিত বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয়। চাইলেই যা খুশি করার সুযোগ নেই। নয়তো ভয়াবহ অনর্থ ঘটে যাবে।

চকিতে গত মাসের একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল তার।

শিকার হিসেবে ধনবানরা আদর্শ হয়। তাদের কাছ থেকে অন্ন সংস্থান করাটাই সবচাইতে সহজ। ঝুঁকির পরিমাণও তুলনামূলক কম। এসব তত্ত্ব মাথায় রেখেই বিষ্ণু পালের স্ত্রী মালতীর পিছনে অশরীরী লেলিয়ে দিয়েছিল নিতাই।

বাজারে ব্যবসায়ী হিসেবে বেশ নামডাক আছে বিষ্ণু পালের। ক'খানা ফটকা ব্যবসায় টাকা খাটিয়ে স্বল্প সময়েই আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে সে। তাকে নিশানা করতে একবারের বেশি দু'বার ভাবতে হয়নি নিতাইকে।

কিন্তু বিষ্ণুর বউটা যে এতটা সুন্দরী হবে, এটা নিতাই ভাবতেও পারেনি। নিজের কামনা

দমনে সেদিনের মত কষ্ট আর কখনও করতে হয়নি তাকে।

মালতীর নধর দেহটা স্মৃতির পর্দায় ভেসে উঠতেই হাসি ফুটল নিতাইয়ের মুখে; দু'চোখে দানা বাঁধল রাজ্যের লোভ। ক'দিন পর আবারও একবার বিষ্ণু পালের বাড়িতে হানা দিলে কেমন হয়?

নরেন চেয়ারম্যান আর হেমা হতবিহ্বল হয়ে বসে আছে বারান্দায়। দু'জনে করুণ চোখে বার-বার ফিরে তাকাচ্ছে চৈতালির ঘরের বন্ধ দরজার দিকে।

কী হচ্ছে ঘরের ভিতরে? -

তাদের আদরের মেয়েটার সাথে কী করছে নিতাই ফকির?

হেমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মুখ নামিয়ে নিল নরেন। কাজটা স্ত্রীর অমতে করতে হয়েছে বলে খানিকটা অনুতপ্ত। ওই বদ তান্ত্রিকের হাতে নিজের কন্যাকে সঁপে দেয়ার ইচ্ছে তো তারও ছিল না। কিন্তু এই দুঃসময়ে আর কী-ই বা করার ছিল?

তবে চৈতালির সঙ্গে নোংরা কিছু করার চেষ্টা করলে, আজ এখানে, এই চেয়ারম্যান বাড়িতেই মারা পড়বে গুণিন। কালুর লাঠিয়াল বাহিনীকে সেরকমই নির্দেশ দেয়া আছে।

দাঁতে দাঁত চেপে আবারও মেয়ের ঘরের দিকে তাকাল নরেন। করছেটা কী ওই হারামজাদা?

ঠিক তখনই অপার্থিব চিৎকারটা শুনতে পেল সবাই!

ভয়ঙ্কর হিংস্র একটা গর্জন! যেন হাজারটা বাঘের টুঁটি চেপে ধরেছে কেউ, আর সবক'টা বাঘ একযোগে হুঙ্কার ছাড়তে চাইছে! সেই সঙ্গে যোগ হয়েছে অসহ্য একটা গোঙানি আর বিরামহীন হিস্-হিস্ শব্দ। আর যা-ই হোক, কোন মানুষের পক্ষে অমন আওয়াজ করা সম্ভব নয়!

তীব্র আতঙ্কে স্বামীর হাত আঁকড়ে ধরল হেমা; সারা শরীর ক্রমাগত কাঁপছে তার। বাহুতে নখ দেবে গিয়ে যে প্রচণ্ড ব্যথা পাচ্ছে নরেন, সেদিকে বিন্দুমাত্র খেয়ালও নেই তার।

আচমকা এক ঝলক দমকা হাওয়া এসে আছড়ে পড়ল ঘরের চালায়। পট্-পট্ করে নিভে গেল বারান্দার সবক'টা হারিকেন।

'ও, মা গো! অইডা কী? অইডা কী?' তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল একজন বুড়োমতন কাজের মহিলা। পরক্ষণেই হাত পা ছড়িয়ে মূর্ছা গেল সে।

উত্তেজনায় দৌড়ে গিয়ে উঠনে দাঁড়াল কালু; উদ্‌ভ্রান্তের মত এদিক-ওদিকে তাকাচ্ছে। তার দলের অন্য কেউ অবশ্য তার সঙ্গী হলো না; ওরা বারান্দায় দাঁড়িয়েই সম্মিলিতভাবে ইষ্টনাম জপ করা শুরু করল।

ততক্ষণে প্রায় সবাই-ই দেখতে পেয়েছে ওটাকে। চৈতালির ঘর থেকে বেরিয়ে, শূন্যে ভর করে, ভেসে-ভেসে দূরে সরে যাচ্ছে একটা ধূসর ছায়া! প্রতি মুহূর্তেই পাল্টে যাচ্ছে ছায়াটার আকৃতি।

আচমকা আরেক পশলা ঝোড়ো হাওয়া প্রবল আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওটার ওপরে! পরমুহূর্তেই সবার চোখের সামনে থেকে বেমালুম গায়েব হয়ে গেল ছায়াটা। কোথাও আর ওটাকে দেখা গেল না।

এই হৈ-হট্টগোলের মাঝে কখন যে ভয়ঙ্কর আর্তনাদটা থেমে গেছে, কেউই সেটা খেয়াল করেনি। এখন আচমকা চারপাশ নীরব হয়ে যাওয়ায়, যে যার জায়গায় স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল বাড়ির বাসিন্দারা। কী করবে, কেউই ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

ঠিক তখনই চৈতালির ঘরের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল নিতাই ফকির। সারা শরীর ঘামে ভিজে জবজব করছে।

দ্রুত পায়ে হেঁটে এসে চেয়ারম্যানের পাশের খালি চেয়ারটায় বসল সে। তারপর মুখ তুলে তাকাল নরেনের দিকে। 'আফনের মাইয়া ভালা হইয়া গেছে। সব সমস্যা খতম।'

আর শোনার অপেক্ষা করল না হেমা, সবেগে ছুটে গেল চৈতালির ঘরের দিকে।

অপ্রকৃতিস্থের মত ঠায় বসে রইল নরেন চেয়ারম্যান। চোখেমুখে ফুটে উঠেছে একরাশ কৃতজ্ঞতা। অবাধে গড়িয়ে পড়া তার দু'ফোঁটা অশ্রুতে কতখানি ভালবাসা নিহিত আছে, সেটা পরিমাপ করার সাধ্য নেই কারও!

দাঁত কেলিয়ে হাসল নিতাই, ভেজা ঠোঁটে

জিভ বুলাল। 'কিছুদিন কিম্ভক দুব্বল থাকবে মাইয়াডা। যা একখান ধকল গেল! এই সময় অরে ভাল-মন্দ খাইতে দিতে হইবে। দুধ-ডিম, মাংস; শিঙি-মাগুরের ঝোল। এগুলান খাইলে শইল্যে রক্ত হয়। রক্ত তো বেবাকতেরই দরকার। কিপ্টামি করন যাইবে না কিম্ভক। নাইলে বিরাট ক্ষতি হইয়া যাইবার পারে।'

সজোরে মাথা নাড়ল নরেন চেয়ারম্যান। হাতের চেটো দিয়ে চোখ মুছল। 'কী কন এগুলা! কিপ্টামি করুম ক্যান আমি! ভগবান কি আমারে কিছু কম দিসে নাকি? যা-যা কইসেন, সবই আমি খাওয়ামু আমার মাইয়ারে।'

'হের লাইগাই তো ট্যাকা-পয়সাওয়ালা মালদার পার্টিই আমার পছন্দ...' অনুচ্চ স্বরে বিড়বিড় করল নিতাই।

'কিছু কইলেন নাকি, ফকির সাব?' বুঝতে না পেরে জানতে চাইল নরেন।

'নাহ্ । কইতাসিলাম যে, মাইয়াডারে আমি একটা মাদুলি পরাইয়া দিসি। মন্ত্র পরা মাদুলি; রক্ষাকবচ। ওইডা এক মাস গলায় রাখতে হইবে, খোলা যাইবে না। এমুনকী গোসলের সময়ও খোলা যাইবে না। তাইলে আবারও আলগা বাতাসটা ফেরত আইবার পারে। আবার যদি ফেরত আহে, ওইডারে খেদানো কিম্ভক খুবই কঠিন হইবে।'

আতঙ্ক ভর করল চেয়ারম্যানের চেহারায়। 'না, না। খুলবে ক্যান? খুলবে না। আফনে যেমনে কইবেন, হেমনেই চলবে হে। হেইডা নিয়া দুইকথা হইবে না।'

না খুললেই ভাল; মনে-মনে বলল নিতাই ফকির। তাহলে আর গলার দগদগে ক্ষতটা চোখে পড়বে না কারও। দিন পনেরোর মধ্যেই দাগ দুটো মিলিয়ে যাওয়ার কথা; সবার ক্ষেত্রে তা-ই হয়। তবুও বাড়তি সতর্কতা হিসেবে এক মাস রাখতে বলা।

'আফনে কিম্ভক আজকে এইখানে খাইয়া যাইবেন। মানা করতে পারবেন না,' আর্দ্র গলায় বলে উঠল নরেন চেয়ারম্যান। নিতাইয়ের ডান হাতটা নিজের হাতের মুঠোয় তুলে নিয়েছে সে।

মুচকি হাসল গুণিন।

তাজা রক্ত পেটে পড়েছে আজ। মুখের স্বাদটা নষ্ট হবে, এমন কিছু আর আগামী কয়েকদিন খাবে না সে। উষ্ণ রক্তের সাথে পৃথিবীর অন্য সব খাবারের কোন তুলনাই চলে না। একবার যে এর স্বাদ পেয়ে যায়, বাকি সমস্ত খাবার তার কাছে পানসে লাগে!

'হেইডা পরে দেখা যাইবে। আফনে অহন মাইয়াডার কাছে যান। অরে প্রাণ ভইরা আদর করেন।'

তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল নরেন, পা বাড়াল চৈতালির ঘরের দিকে। কন্যার কাছে যাওয়ার জন্য সেই তখন থেকেই প্রাণ আইঢাই করছিল তার। তান্ত্রিককে একা রেখে যাওয়াটা শোভন হবে না বলে যেতে পারছিল না।

উঠন থেকে পায়ে-পায়ে নিতাই ফকিরের সামনে এসে দাঁড়াল কালু। চৈতালিকে সুস্থ করে তোলায়, আদতেই গুণিনের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করছে সরলমনা বিশালদেহী মানুষটা।

তাকে আপাদমস্তক নিরীখ করল তান্ত্রিক। দিব্য চোখে দেখতে পেল, কালুর প্রকাণ্ড দেহটার শিরা-ধমনীতে তীব্র বেগে ছুটে চলছে উষ্ণ রক্তের স্রোত! কয়েকবার করে পান করলেও যে ভাণ্ডার সহসা নিঃশেষ হবে না!

আবারও ঠোঁট চাটল নিতাই ফকির।

বহু কষ্টে কালুর ওপর থেকে নজর সরিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ভ্যাম্পায়ার হওয়ার কত যে জ্বালা, কেবল ভ্যাম্পায়াররাই সেটা জানে! ■

আলী লাইব্রেরী

টি এ রোড, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

এখানে সেবা প্রকাশনী ও প্রজাপতি প্রকাশনের নতুন ও সমস্ত রিপ্রিন্ট বই পাওয়া যায়।

মোবাইল: ০১৭১১-৮১৩৬০৫

প্রশ্ন-উত্তর

প্রশ্ন: পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বইয়ের নাম কী ও ওজন কত?
উত্তর: জার্মান প্রিন্স অ্যাটলাস, ওজন ৬৭ মণ।
প্রশ্ন: পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ডিকশনারি কোন্‌টি?
উত্তর: অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি।
প্রশ্ন: বেলুনে করে কে প্রথম বিশ্ব ভ্রমণ করেন?
উত্তর: আমেরিকার নাগরিক স্টেও ফ্রাসেট।
প্রশ্ন: কোন্ পাখির ডিমের উপর একসাথে চারজন মানুষ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে?
উত্তর: উট পাখির।
প্রশ্ন: পৃথিবীর কোন্ ঘরের উপর দিয়ে আজও কোন পাখি যায়নি?
উত্তর: কাবাঘর।
প্রশ্ন: কোন্ ব্যক্তি একটি ডিমের উপর দশ হাজার শব্দ লিখেছিলেন?
উত্তর: ভারতের শংকর চ্যাটার্জী।
প্রশ্ন: কোন্ দেশে একটি গাছ তেইশ রকম ফল দেয়?
উত্তর: সাইপ্রাসের সিসিবো এলাকায়।
প্রশ্ন: কোন্ প্রাণী জীবনে একবারও পানি পান করে না?
উত্তর: যুক্তরাষ্ট্রের মরু প্রাণী ক্যাঙ্গারু র‍্যাপট্।
প্রশ্ন: কোন্ প্রাণী তিন বছর কিছু না খেয়ে কেবল ঘুমিয়ে কাটাতে পারে?
উত্তর: শামুক।
প্রশ্ন: স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগামী সাঁতারু প্রাণী কোন্‌টি?
উত্তর: ডলফিন। ঘণ্টায় ৩৫ মাইল।
প্রশ্ন: কোন্ শিল্পী একই সময়ে এক হাতে ছবি আঁকতে ও অন্য হাত দিয়ে লিখতে পারতেন?
উত্তর: লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি।
প্রশ্ন: ইংরেজি ভাষার সবচেয়ে পুরানো শব্দ কোন্‌টি?
উত্তর: Town.
প্রশ্ন: গরিলা গড়ে প্রতিদিন প্রায় কত ঘণ্টা ঘুমায়?
উত্তর: চোদ্দ ঘণ্টা।
প্রশ্ন: কাঁচি কে আবিষ্কার করেন?

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি

উত্তর: ইতালির বিখ্যাত চিত্রকর লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি।
প্রশ্ন: কোন্ প্রাণীর চোখের মণি গোল নয়, সমান্তরাল?
উত্তর: ছাগল।
প্রশ্ন: কোন্ চিত্রশিল্পী তাঁর জীবদ্দশায় মাত্র একটি ছবি বিক্রি করতে পেরেছিলেন?
উত্তর: চিত্রশিল্পী ভ্যান গগ।
প্রশ্ন: সবজির মধ্যে সবচেয়ে পুরানো সবজি কোন্‌টি?
উত্তর: মটরশুঁটি।
প্রশ্ন: কোন্ মহাদেশে একটিও পিঁপড়ে নেই?
উত্তর: অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশে।
প্রশ্ন: স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে একমাত্র কোন্ প্রাণী উড়তে পারে?
উত্তর: বাদুড়।
প্রশ্ন: একমাত্র কোন্ মহাদেশে কোন সক্রিয় আগ্নেয়গিরি নেই?
উত্তর: অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ।
প্রশ্ন: গরু প্রতিদিন কত গ্যালন পানি পান করে?
উত্তর: ২৫-৫০ গ্যালন।
প্রশ্ন: ডিমে কোন্ ভিটামিন থাকে না?
উত্তর: ভিটামিন 'সি'। ■

সংগ্রহে: **ফরিদা ইয়াসমিন**

নিতাই মাস্টার

সুমন দাস

যত দ্রুত সম্ভব গরুটাকে মানুষ বানাতে হবে, সুতরাং নন্দন আর অপেক্ষা করতে পারে না।

অনেক কাল আগের কথা। হরিপুর গ্রামে বাস করতেন নিতাই মাস্টার। কথিত ছিল, নিতাই মাস্টার গরু পিটিয়ে মানুষ করতে পারেন! গরু পিটিয়ে মানুষ, এই আশ্চর্য কথাটি একসময় ছড়িয়ে পড়েছিল আশপাশের বিভিন্ন গ্রামে, যা ঘুরতে-ঘুরতে একদিন দূরবর্তী গ্রামের নন্দন কুমারের কানেও গিয়ে পৌঁছায়।

নন্দন একজন অতি সাধারণ কৃষক। নিজের কোনও জমি-জমা নেই। তাই অন্যের জমিতে হাড়ভাঙা শ্রম দিয়ে সংসারের খরচ জোগায়। তার সম্পদ বলতে একটি মাত্র গরু রয়েছে। আদর করে গরুটির নাম রেখেছে রমেশ। দুর্ভাগ্যবশত নন্দনের কোনও সন্তানও নেই, মাঝে-মাঝে সে গভীর যন্ত্রণায় ভগবানকে বলে, 'ভগবান, তুমি আমাগোর একডা সন্তান দাও, ভগবান। বিনিময়ে তোমার যা ইচ্ছা তা লইয়া যাও। শুধু একডা সন্তান দাও, ভগবান। শুধু একডা সন্তান।'

হরিপুর গ্রামের নিতাই মাস্টার, গরু পিটিয়ে মানুষ বানাতে পারেন কথাটি জানার পর থেকেই নন্দনের শূন্য হৃদয়ে জেগে ওঠে নতুন আকাঙ্ক্ষা। মনে-মনে ভাবে, ইশ, ভগবান যদি আমার গরুডাক নিতাই মাস্টারের অছিলায় মানুষ বানায় দ্যায়, তাইলে জীবনের আর কোনও দুঃখ থাকবি না।

যত দ্রুত সম্ভব গরুটাকে মানুষ বানাতে হবে, সুতরাং নন্দন আর অপেক্ষা করতে পারে না।

পরদিন খুব সকাল-সকাল ঘুম থেকে উঠেই, কোনওরকমে হাত-মুখ ধুয়ে আদরের গরুটাকে নিয়ে রওনা দেয় হরিপুর গ্রামের উদ্দেশে। হাঁটতে-হাঁটতে অবশেষে হরিপুর গ্রামে সে এসে পৌছায় ঠিক দুপুরের প্রারম্ভে। লোকমুখে শুনে-শুনে হাজির হয় নিতাই মাস্টারের দরজায়। নন্দন দরজায় ঠক-ঠক করে ডাকে: 'মাস্টার মশাই, ও, মাস্টার মশাই, বাড়িত আছেননি?'

ভেতর থেকে একটি ভারী কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে আসে, 'কে?'

নন্দন বলে, 'নিতাই মাস্টার মশাই কি বাড়িত আছেননি? আমি নন্দন, নন্দন কুমার। অনেক দূরদেশ থেইক্যা আইছি।'

নিতাই মাস্টার সশব্দে দরজা খুলে নন্দনকে বলেন, 'কে তুমি? কী চাও আমার কাছে? আমিই নিতাই মাস্টার।'

নন্দন নিতাই মাস্টারকে দেখামাত্রই তার দু'পা আকস্মিকভাবে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে-কাঁদতে বলে, 'মাস্টার মশাই, মাস্টার মশাই, আমি হুনছি, আপনি নাকি গরু পিডায় মানুষ বানাবার পারেন। আমাগোর কোনও সন্তান নাই, মাস্টার মশাই। আপনি যদি একটু করুণা কইরা আমার গরুডাক পিডায়-পাডায় মানুষ কইরা দ্যান, তাইলে পরে গরিবের বাঁচার একডা আশা হইতো। ভগবান আপনার ভাল করব, মাস্টার মশাই। আপনি শুধু গরিবের এই উপকারডুক করেন।'

নন্দনের কথা শুনে নিতাই মাস্টার বলেন, 'আরে-আরে, এসব কী করছ তুমি! এই সামান্য ব্যাপারের জন্য পা ধরে কান্নাকাটি করার কী আছে!! আমি তোমার গরুটাকে পিটিয়ে-পাটিয়ে অবশ্যই মানুষ করে দেব, কিন্তু এর জন্য কিছুটা সময় আমাকে দিতে হবে। এক কাজ করো, তুমি তোমার গরুটাকে আমার কাছে রেখে যাও। আগামী তিন মাস পরে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে।'

নিতাই মাস্টারের মুখ থেকে আশার বাণী শুনে নন্দন তো মহাখুশি। সে গভীর আনন্দে লাফাতে-লাফাতে বাসায় চলে যায়।

সময় যেন কাটে না, তবুও কষ্ট করে ধৈর্য ধরে অপেক্ষার দিনগুলো অতিবাহিত করে নন্দন।

আজ দীর্ঘ অপেক্ষার কঠিন প্রহরের শেষ মুহূর্ত, সুতরাং অন্ধকার রাত থাকতেই জেগে ওঠে নন্দন। হাত-মুখ ধুতে কিছুটা সময় নষ্ট হবে বলে, সে হাত-মুখ না ধুয়েই রওনা দেয় হরিপুর গ্রামের উদ্দেশে। নিতাই মাস্টারের দরজায় গিয়ে চিৎকার করে ডাকে, 'মাস্টার মশাই, ও, মাস্টার মশাই, বাড়িত আছেননি?'

নিতাই মাস্টার সশব্দে দরজা খুলে হাসিমাখা মুখে বলেন, 'কেমন আছ, নন্দন?'

নন্দন গভীর আনন্দ বুকে নিয়ে বলে, 'মাস্টার মশাই, আমার আদরের সন্তান কোথায়?'

নিতাই মাস্টার একটু মুচকি হেসে বলেন, 'কোন্ সন্তানকে তুমি খুঁজছ? তুমি তো একটা গরু আমাকে দিয়েছিলে! আমি তা বিক্রি করে আমার একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। নন্দন, তুমি হয়তো জানো না, ভাই, বিপদের মুহূর্তে তোমার এই গরুটাকে পেয়ে আমার অনেক উপকার হয়েছে। ধন্যবাদ, নন্দন, অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।'

মাস্টার মশাইয়ের মুখ থেকে আদরের গরু বিক্রির কথা শুনে, নন্দনের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। শুকনো শরীর থরথর করে কেঁপে ওঠে। প্রচণ্ড রাগ, ক্ষোভ ও যন্ত্রণার বশবর্তী হয়ে নন্দন চিৎকার করে বলে, 'ধোঁকাবাজ মাস্টার, আমি তোক খুন কইরা ফেলামু! তুই আমার সন্তানের লাহান গরুডাক বিক্রি কইরা দিলি!!!'

নিতাই মাস্টার শান্ত কণ্ঠে বলেন, 'নন্দন, তুমি একটু শান্ত হও। আমাকে খুন করলে তুমি তো কিছুই পাবে না, বরং আরও ক্ষতি হবে তোমার। তারচেয়ে ভাল, শহরের আদালতে গিয়ে আমার নামে একটা মামলা ঠুকে দাও। তা হলে হয়তো আমার একটি উপযুক্ত শাস্তি হতে পারে।'

মাস্টারের কথাগুলো শুনে নন্দনও মনে-মনে ভাবে, তাই তো, খুন করলি পরে আমার কোনও লাভ হবি না, বরং ক্ষতি হইবার সম্ভাবনাই বেশি। তার চাইতে জজের কাছে

একডা মামলা বসাই দিলে ব্যাডা মাস্টার বুঝব কত ধানে কত চাল।

সুতরাং আর দেরি নয়, নন্দন রওনা দেয় শহরের উদ্দেশে। লোকমুখে শুনে-শুনে পৌঁছায় আদালতের দোরগোড়ায়। কিন্তু কী আশ্চর্য ঘটনা, আদালতে তাকে মামলা ঠুকতে দেয়া হয় না। নন্দনের মাথা তো এমনিতেই খারাপ ছিল, আরও খারাপ হয়ে যায়। সে দারোয়ানকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে আদালত চলাকালীন সময়ে ভেতরে প্রবেশ করেই চিৎকার দিয়ে বলে, 'জজ সাব, ও, জজ সাব, আমি বিচার চাই। আমি নিতাই মাস্টারের একডা বিচার চাই। আপনি বিচার কইরা দ্যান আমাক।'

কথাগুলো বলতে না বলতেই হঠাৎ পেছন থেকে পুলিস এসে ধরে ফেলে ওকে এবং জজের নির্দেশে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁর অফিস রুমে। আদালতের কার্যাদি শেষ করে জজ সাহেব তাঁর রুমে এসে নন্দনের কাছে জানতে চান তার সমস্যার কথা।

নন্দন প্রায় কাঁদতে-কাঁদতে বলে, 'জজ সাব, আমি বিচার চাই নিতাই মাস্টারের। সে ব্যাডা আমাক বিশাল বড় ধোঁকা দিছে। আপনি জানেন না, জজ সাব, আমার আদরের গরুডাক পিডায়-পাডায় মানুষ বানাবার লাইগ্যা দিছিলাম, তাক কি না সে ব্যাডা নিতাই মাস্টার বিক্রি কইরা মাইয়া বিয়া দিছে। আমি ওই শয়তান মাস্টার ব্যাডার একখান বিচার চাই, জজ সাব।'

নন্দনের মুখে নিতাই মাস্টারের কথা শুনে জজ সাহেব বলেন, 'নন্দন, শোন, তুমি একটু ভুল বুঝেছ। মানুষের মাঝে যাদের বুদ্ধির অবস্থা খুব একটা ভাল থাকে না, তাদেরকে অনেক সময় গরু বলে আখ্যায়িত করা হয়। আর এসব গরুকেই পিটিয়ে মানুষ বানাতে পারেন নিতাই মাস্টার। তুমি এই যে আজ আমাকে দেখছ; এই আমিও একসময় গরু ছিলাম। তিনিই আমাকে পিটিয়ে-পিটিয়ে আজ মানুষের মতন মানুষ বানিয়েছেন। নন্দন, তুমি দুঃখ কোরো না। আমি তোমাকে তোমার গরুর দ্বিগুণ দাম দিয়ে দিচ্ছি। তুমি গ্রামে ফিরে যাও। আর একটি অনুরোধ, মাস্টার মশাইকে অবশ্যই আমার প্রণাম জানিয়ো।' ■

২/৪/১৭ তারিখে প্রকাশিত হচ্ছে
কিশোর ক্লাসিক
তিনটি বই একত্রে

দ্য কর্সিকান ব্রাদার্স/আলেকজান্দার দ্যুমা/
কাজী আনোয়ার হোসেন

কর্সিকান এক বনেদী পরিবারে জন্ম যমজ দুই ভাই লুসিয়েন ও লুই দো ফ্রানশির। চেহারায় এতই মিল যে ছোটবেলায় ওদের মা পর্যন্ত কোন্‌টা কোন্‌জন চেনার জন্যে জামায় চিহ্ন দিয়ে রাখতে বাধ্য হতেন। বিপরীত চরিত্রের এই দুই ভাইকে নিয়েই বিশ্বখ্যাত কথা সাহিত্যিক আলেকজান্দার দ্যুমার অমর সৃষ্টি: দ্য কর্সিকান ব্রাদার্স। অসংক্ষেপিত।

গ্রেশাস বেইন/মেরী ওয়েব/কাজী শাহনুর হোসেন

কাটা ঠোঁট প্রডেন্স সার্নের জন্মগত ত্রুটি। কেউ কেউ এজন্যে ওকে ডাইনী মনে করে। বড় ভাই গিডিয়ন সার্ন কথা আদায় করে নেয়, তার খামারে সারাজীবন শ্রম দেবে প্রডেন্স, যা বলা হবে তাই করবে। কারণ ঠোঁট কাটা মেয়েকে তো কেউ ভালবাসবে না, বিয়ে করবে না। কিন্তু সত্যিই কি তাই?

বেন-হার/লিউ ওয়ালেস/কাজী মায়মুর হোসেন

সামান্য এক দুর্ঘটনায় বেন-হারের জীবনের মোড় ঘুরে গেল। বন্দি করা হলো ওকে। রোমান সৈন্য ধরে নিয়ে গেল ওর মা-বোনকে। বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল সমস্ত সম্পত্তি। ভাগ্যের পরিহাসে ক্রীতদাসে পরিণত হলো প্রিন্স বেন-হার। দেখা হলো যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে। তিনি দেখালেন নতুন আলোর পথ।

দাম ■ নব্বই টাকা

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
mail: alochonabibhag@gmail.com
শো-রুম
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

গল্প নয়, সত্যি

মীর আবুবকর শীবলি

ওই বাংলোটিতে ভূত-প্রেতের উপদ্রব আছে বলে লোকমুখে শোনা যেত।

রহস্যপত্রিকায় ২০০৭ সালের মার্চ সংখ্যায় মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে স্মৃতি বিজড়িত দিনগুলো সম্বন্ধে লিখেছিলাম। তারপর চাকরিতে ব্যস্ততা থাকায় লেখার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও লিখব-লিখব করে আর লেখা হয়নি।

বর্তমানে আমি মুন্নু গ্রুপ অভ ইণ্ডাস্ট্রিজে (মুন্নু সিরামিক, মুন্নু ফেব্রিক্স প্রভৃতি) সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার হিসাবে কর্মরত আছি। আমার ছোট মেয়ে সামিরার আগ্রহে এবং বার-বার বলাতে লিখতে বাধ্য হলাম।

লিখতে বসে জীবনের অনেক কাহিনি চোখের সামনে ভেসে উঠছে। আজকাল মানুষের ভূত, প্রেত, জিন সম্বন্ধে আগ্রহ বেশি। তাই এই সম্বন্ধেই লিখতে বসলাম।

১৯৮০ সাল। আমি জেম্‌স্ ফিনলে কোম্পানির অধীনে দারাগাঁও চা বাগানে সহকারী ব্যবস্থাপক হিসাবে কর্মরত। হবিগঞ্জ জেলায় দারাগাঁও চা বাগান, মাঝে রশিদপুর রেলওয়ে স্টেশন। আমি তখন কামাইচরা বাংলোতে আমার সহকর্মী বন্ধু আলী আশরাফ (বর্তমানে ইউনিকলের ডিরেক্টর হিসেবে কর্মরত)-এর সঙ্গে দু'রুমে থাকতাম। আমাদের তৎকালীন ব্যবস্থাপক কাশেম ভাইয়ের পাশের কটেজ বাংলোটি বেশ পুরনো এবং বহুদিন ধরে খালি পড়ে ছিল।

১৯৭৯ সালের দিকে কাশেম ভাই বাংলোটি বসবাসযোগ্য করে আমাকে ওখানে থাকতে বললেন। ওই বাংলোটিতে ভূত-প্রেতের উপদ্রব আছে বলে লোকমুখে শোনা যেত। আমার ভয়-ভীতি এমনিতেই একটু কম। কিন্তু মনে-মনে একটু আতঙ্কগ্রস্তও ছিলাম। যাই হোক, প্রথম রাতে আমার কটেজ বাংলোর পাহারাদার বীরবলকে বার-বার সাবধান করলাম, আমি যেন ডাকলেই ও সাড়া দেয়।

ও আমাকে আশ্বাস দিল ভয় না পাওয়ার জন্য, বলল সমস্যা হলে জান দিয়ে মোকাবেলা করবে।

রাতে লাইট অফ করার আধঘণ্টা পরেই উপরের চালে খর-খর আওয়াজ এবং নিচের ফ্লোরে চলাফেরার আওয়াজ পেলাম। সময় যত বাড়ছিল, আওয়াজও মনে হলো বাড়ছে। আমার জানা যত দোয়া-দরূদ আছে তা বার-বার পড়ে ভয় তাড়ানোর চেষ্টা করছিলাম।

এদিকে পাহারাদার 'সাহসী' বীরবল আমাকে একা রেখে গায়েব!

ওকে অনেক খুঁজেও পেলাম না। এভাবে কোনও অঘটন ছাড়াই রাত পার হলো। পর-পর কয়েক রাতে একই অবস্থা। রাতে খোঁজাখুঁজি করি, কোনও হদিস পাই না। তারপর দিনে ভালভাবে অনুসন্ধান করে দেখলাম, পুরানো বাংলো হওয়াতে চালে প্রচুর জালালী কবুতর বাসা বেঁধেছে। যেহেতু হযরত শাহজালাল (রাঃ) এই জালালী কবুতর নিয়ে এসেছিলেন, সেই কারণে বৃহত্তর সিলেট জেলার লোকেরা জালালী কবুতর সাধারণত খান না। পরে কবুতরগুলো চাল থেকে সরানোর ফলে উপরের ঝামেলা কমল। তা ছাড়া, বাংলো পুরনো হওয়াতে বেশিরভাগ নিচের ফ্লোর ফাঁপা। রাতে ইঁদুরের চলাচলে বিভিন্ন আওয়াজ হত। পরে এই অসুবিধাগুলো দূর হয়ে যায়।

কিন্তু আসল ঝামেলা আমার দ্বিতীয় পোস্টিঙে। আমাকে ১৯৮১ সালে কোম্পানি প্রমোশন দিয়ে ব্যবস্থাপক হিসাবে জাগচড়ায় গ্রিন টি ফ্যাক্টরি বানানোর জন্য পাঠায়। জাগচড়া চা বাগান শ্রীমঙ্গল শহর থেকে ৬ কিলোমিটার দূরে। মৌলভীবাজার যাওয়ার মেইন রাস্তার মধ্যেই পড়ে। তখন আমি বিবাহিত। আমার বাংলোতে রাতে কোনও পাহারাদার থাকতে চাইত না কেন, বুঝতাম না। পরে রাতে পাহারাদারকে জিজ্ঞেস করলে ওরা বলে, গভীর রাতে ওই বাংলো থেকে একজন বিদেশি সাহেবকে বের হতে দেখা যায়। কিন্তু আমরা কয়েক বছর থাকা সত্ত্বেও ওই বিদেশি সাহেবকে দেখিনি। আমাদের বাংলোর পাশের রাস্তায় কোম্পানির স-মিল ছিল। ওই সময় ওখান থেকে লক্ষ-লক্ষ সিএফটি কাঠ কেটে কোম্পানির বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হত।

ওখানে একজন রাতের পাহারাদার ছিল, সে বেশ পরহেজগার। কিন্তু কিছু দিন পর ওই পাহারাদারও কাজে আসা বন্ধ করে দিল। পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম, গভীর রাতে একজন ছয় ফুটের বেশি লম্বা পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা লোক ওকে ডিউটিতে আসতে মানা করেছে। যদি কথা না শোনে, তবে নাকি পাহারাদারটি মারা যাবে।

আমি নতুন ফ্যাক্টরিতে প্রোডাকশন নিয়ে ব্যস্ত। গ্রিন টি বানানোর জন্য কোম্পানি তাইওয়ান থেকে মেশিনারি আনিয়ে ফ্যাক্টরি চালু করেছে। ১৯৮৫ সালে ফ্যাক্টরিটি পুরোপুরি চালু হলো। খুবই ব্যস্ত, ভাল রেজাল্ট পাচ্ছি।

চব্বিশ ঘণ্টা কারখানা চলে। গ্রিন টি-তে আমি অভিজ্ঞ দেখে কোম্পানি আমাকে ১৯৯৩ সালে শ্রীলঙ্কায় জেমস্ ফিনলে কোম্পানিতে গ্রিন টি প্রোডাকশন কাজ আরম্ভ হওয়ার আগে এক্সপার্ট হিসাবে এক মাসের জন্য পাঠিয়েছিল। আমি চা বাগান সম্বন্ধে বিস্তারিত লিখে আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না।

তখন কারখানা পুরোদমে চলছে। গ্রিন টি প্রক্রিয়াজাত করতে Sorting Room-এ তিন শিফট কাজ চলত। বাজারজাত করার জন্য বিভিন্ন Size-এর চা পাতা তৈরি করা হত। প্রতিটি শিফটে পনেরোজন মেয়ে এবং চারজন ছেলে শ্রমিক কাজ করত।

হঠাৎ এক রাতে সাতটার সময় আমার কাছে খবর এল, একটা মেয়ে হাসতে-হাসতে

রুপালী পেপার হাউস

রুপালী সিনেমা হল, রংপুর

এখানে সেবা প্রকাশনীর নতুন ও রিপ্রিন্ট সমস্ত বই পাওয়া যায়।

মোবাইল: ০১১৯১-৪৪৬৪৭৯, ০১৭৭৭-২৯৫৯৪৫

কথা বন্ধ করে চুপচাপ বসে আছে। কোনও কথা বলে না।

পরে গিয়ে দেখলাম সে অজ্ঞান হয়ে গেছে। তৎক্ষণাৎ কারখানার ডাক্তার দেখানো হলো। দেড়ঘণ্টা পর ও সুস্থ হওয়ার পর কী হয়েছিল জিজ্ঞেস করায় কিছু বলতে পারল না। এভাবে পরের রাতে আরও তিন মেয়ে অসুস্থ হয়ে গেল। পরে আস্তে-আস্তে অসুস্থদের সংখ্যা বাড়তে লাগল। কারখানার Sorting Room চালানোই কষ্টকর হয়ে উঠল!

সবাই আতঙ্কিত।

মসজিদের হুজুর দোয়া করেও কোনও লাভ না হওয়ায় সবাই ফ্যাক্টরিতে খারাপ কিছুর আছর আছে বলা শুরু করল। আমরা সবাই চেষ্টা করতে লাগলাম কীভাবে এই বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

আমার মাথাব্যথা বেশি, যেহেতু আমার দায়িত্বে জাগচড়া কারখানা চলে। এই ফ্যাক্টরির বড় বাবু (Head Factory Clerk) রব, যিনি চা বাগান অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি ছিলেন। তিনি এক প্রত্যন্ত গ্রামে একজন জিন তাড়ানো কবিরাজের ঠিকানা জোগাড় করলেন।

ওই কবিরাজ রাত আটটার পর রোগী দেখেন।

অসুবিধা দূর করে কারখানার উন্নতির জন্য বড় বাবু ও একজনকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম কবিরাজের গ্রামে। কবিরাজ থাকেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে। গাড়ি, নৌকা যোগে গিয়ে অনেক পথ পাড়ি দিয়ে রাত প্রায় সাড়ে আটটার দিকে পৌঁছুলাম ওই অজপাঁড়াগায়ে।

এইটুকু বলে রাখি, এখনও যদি আমাকে দিনের বেলাতেও ওই জায়গায় কেউ যেতে বলে, আমি যাব না। আমরা সবাই ফ্যাক্টরির ওই উৎপাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, আর কবিরাজ কী করেন তা দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলাম।

জাগচড়া বাগানের যে লোকটি আমাদের নিয়ে গিয়েছিল, তার নাম মনে করতে পারছি না। তবে ওই লোকটি আগেই কবিরাজকে আমাদের আসার কথা বলে রেখেছিল।

কবিরাজ যে রুমে রোগী দেখেন, সেটি টিনের ঘর। ঘুরে দেখে নিলাম কোনও ফাঁক-ফোকর আছে কি না, পেলাম না। রুমে ঢোকার পর কবিরাজ আপ্যায়ন করে বসতে বললেন।

ঘরভর্তি মানুষ। সবাই কবিরাজের কাছে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য এসেছে। কবিরাজ একটা চেয়ারে বসে ছিল, সামনে টেবিল এবং টেবিলে উপর একটা হারিকেন মিটমিট করে জ্বলছে। ছাতে চল্লিশ ওয়াটের একটা বাতিও আছে।

উনি একটা কাগজে ক্রমিক নং অনুসারে আমার নামসহ সব রোগীর তালিকা তৈরি করে নিলেন। যেহেতু আমি দেরি করে গিয়েছিলাম, তাই ক্রমিক নং ২০।

উনি ডানপাশের আলমারির উপরে জায়নামাজে রাখলেন ওই তালিকাটি। জায়নামাজটি দেখে মনে হবে, যেন ওখানে কেউ বসেন।

কবিরাজ বললেন, এখন জিন আসবেন।

এরপর লাইট নিভিয়ে ঘর অন্ধকার করে দোয়া-দরূদ পড়া আরম্ভ করলেন।

হারিকেনের আলো নিভিয়ে ঘরটি সম্পূর্ণ অন্ধকার করে তিনবার তালি দিলেন।

ঘরটি একদম নিস্তব্ধ।

কোনও আওয়াজ নেই।

এর প্রায় দুই-তিন মিনিট পর চিকন গলায় জোরে কেউ একজন আসসালামু আলাইকুম বলে নিজেকে জাহির করলেন। কবিরাজের দেয়া তালিকামত রোগীদের এক-এক করে ডাকতে লাগলেন এবং তাদের অসুবিধাগুলো শুনতে থাকলেন।

কাউকে-কাউকে কবিরাজি ওষুধ আর কাউকে কোরআন শরীফের আয়াতের অংশ বিশেষ নামাজের মাঝে পড়ার জন্য বললেন।

এভাবে রোগীদের সমস্যার সমাধান করতে থাকলেন এবং রোগী ভাল না হলে আবার আসতে বললেন। উনি পাঁচ-ছয়জন রোগী দেখার পর চলে গেলেন। এরপর আসসালামু আলাইকুম বলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জিন এসে ক্রমিক নম্বর

মত রোগী দেখতে থাকলেন।

তবে এটা দেখলাম, সবাই কোরআন শরীফ ভাল জানেন, এবং সুমধুর গলায় কোরআনের আয়াতগুলো তেলাওয়াত করেন।

আমার সামনের এক রোগীকে জিন দাঁড়াতে বলে ফুঁ দিলেন এবং ওই ফুঁ-এর গতি দেখে মনে হলো, কোনও মানুষের পক্ষে এমনটি সম্ভব নয়। যাই হোক, আমার ক্রমিক নম্বর এলে নাম ধরে ডেকে আমাকে কারখানার অসুবিধাগুলো বলতে বলা হলো।

আমি বলার পর, আধঘণ্টা সময় চেয়ে নেয়া হলো।

শ্রীমঙ্গলে জাগচড়া কারখানায় জিন পাঠিয়ে খবর নিয়ে সমাধান দেবেন বলে জানালেন কবিরাজ।

এভাবে রোগী দেখা চলতে থাকল।

তারপর প্রায় পঁয়ত্রিশ মিনিট পর আমাকে ডেকে বললেন, কারখানার চালে একটা খারাপ জিন থাকে। আমরা কারখানা বানানোর সময় ওর রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছি, সেজন্যই এই ঝামেলা।

এটা ঠিক, নতুন কারখানাটি আমরা আগের রাস্তার উপর বানিয়ে নিয়েছি।

কবিরাজের মাধ্যমে জানলাম, 'ফ্যাক্টরির দুষ্ট জিনটিকে আপাতত আনা সম্ভব হয়নি। তবে তাকে বলে আসা হয়েছে, ফ্যাক্টরিতে কোনও ঝামেলা না করতে। যদি আবারও ফ্যাক্টরিতে অসুবিধা হয়, জানাবেন। ওই দুষ্ট জিনকে বন্দি করে নিয়ে আসব।'

আর আমাকে নামাজের পর সুরা ইউনুস-এর এই আয়াতটি *'লা-ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ যালিমীন'* পড়তে বললেন কবিরাজ।

সত্যিই এটা অলৌকিক ঘটনা, এরপর আমি যত দিন ছিলাম কারখানায়, আর কোনও অসুবিধা হয়নি।

এই একবিংশ শতাব্দীতে এসব বললে, অনেকেই বিশ্বাস করবে না। কিন্তু ভাবতেও অবাক লাগে, এমন একটি ভৌতিক অভিজ্ঞতা আমার জীবনে সত্যিই হয়েছিল! ■

প্রকাশিত হয়েছে
অনুবাদ
হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর
দুটি বই একত্রে
মর্নিং স্টার
রূপান্তর: নিয়াজ মোরশেদ

রানী নেতের-তুয়া প্রাচীন মিশরীয় দেবরাজ আমেন-এর কন্যা। ছেলেবেলার খেলার সাথী রামেসকে ভালবেসে বড় হলো, বাবা ফারাওয়ের ইচ্ছায় হলো রানী। রামেসের দেহে রাজরক্ত থাকলেও তুয়া আর রামেসের মিলনের পথে বাধা দুস্তর মরুভূমিসম। কিন্তু কোন বাধা মানতে রাজি নয় আমেনের ভোরের তারা নেতের-তুয়া। এদিকে মেম্ফিসের কুমার আবি বিয়ে করতে চায় তুয়াকে। থিবি থেকে বাবা ফারাওয়ের সাথে মেম্ফিসে বেড়াতে এসেছিল তুয়া, ঘৃণ্য কৌশলে তাদের বন্দি করল আবি। ফারাওকে হত্যা করল জ্যোতিষী কাকুর জাদুর সহায়তায়, নেতের-তুয়া আর তার দাই মা আসতিকে করল না খাইয়ে মারার ব্যবস্থা। স্নেহধন্য কন্যাকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলেন দেবরাজ আমেন।

চাইল্ড অভ স্টর্ম
রূপান্তর: কাজী মায়মুর হোসেন

এ কাহিনি আপনাদের চেনা সেই দুর্ধর্ষ শিকারী অ্যালান কোয়াটারমেইনের তরুণ বয়সের। প্রথমে মনে হবে শিকার কাহিনি, আফ্রিকার দুর্গম বনে অভিযানের কাহিনি, অথবা হাসির উপন্যাস। কিন্তু আরও কয়েক পাতা এগোলে পাঠক বুঝবেন প্রেম, বিরহ, চাতুরি, বিশ্বাসঘাতকতা, যুদ্ধ, স্নেহ, ভালবাসা আর আশাভঙ্গের এক অপূর্ব উপাখ্যান লিখে গেছেন হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড।

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

অপারেশন রমনা পার্ক

মুনতাসীর মারুফ

আজকে হাত একদমই খালি। গত দু'দিন ধরে কোথাও থেকে কোনও কামাই নেই। হাতে যা ছিল, সব শেষ।

আরেকবার ভাল করে তাকিয়ে চারপাশটা দেখে নেয় মতি। পরিবেশ অনুকূলে।

কপোত-কপোতী হাতে হাত রেখে বেঞ্চিতে বসে আছে এখনও। সহসাই উঠে যাবে এমন কোনও লক্ষণ নেই। ওদের বাম পাশের সবচেয়ে কাছের বেঞ্চটায় একা বসে আছে সিরাজ–মতির সঙ্গী। এমন ভাব, যেন ডুবে আছে গভীর চিন্তায়।

মতি হাসে মনে-মনে–শালা সিরাজের পার্ট দেখো! চোখের কোণ দিয়ে ঠিকই লক্ষ রাখছে পাশের বেঞ্চ আর মতিদের উপর। বসে আছে মতির ইশারার অপেক্ষায়।

জোড়ার ডান পাশের সবচেয়ে কাছের বেঞ্চটা খালি। তার পরের বেঞ্চটায় মতি আর রাজু। আধঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছে ওরা। পার্কে ঢুকে পুরোটায় বার দুই নজর বুলিয়ে এই জায়গাটাই সবচেয়ে পছন্দ হয়েছে মতির।

যুগলের সামনে পায়ে চলার সরু রাস্তা, তবে ওপথ দিয়ে সাধারণত কেউ হাঁটে না। রাস্তার ওপারের যে বেঞ্চটা, তাতে এক বাদামওয়ালা বাদামের টুকরি সামনে রেখে বসে-বসে ঝিমুচ্ছে।

পেছন দিকে কাছাকাছি এক বেঞ্চে এক লোক লম্বা হয়ে ঘুমাচ্ছে। খানিকটা দূরে আরেক জোড়া ছেলে-মেয়ে, বয়স ষোলো-সতেরো বছরের বেশি হবে না।

মতিদের টার্গেট জোড়া আরেকটু বেশি বয়েসী। মেয়েটির বয়স সঠিক আন্দাজ করা না গেলেও বাইশ-তেইশের নিচে নয় বলেই মনে হয়। ছেলেটি তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে হবে। পোশাক-আশাকে বোঝা যায় ভদ্র ঘরের, খানিকটা মালদার পার্টি।

ওদের পাশ দিয়ে আসার সময় মতি আড়চোখে দেখে নিয়েছে, দু'জনের হাতেই ঘড়ি। কোনোটিই এক হাজার টাকার নিচে হবে না। ছেলেটির বাম পকেট ফুলে আছে আয়তক্ষেত্র হয়ে–নিশ্চিতভাবেই ভেতরে মোবাইল ফোন সেট। মেয়েটির মাঝারি সাইজের ভ্যানিটি ব্যাগটাও চকচকে এবং ভেতরে মোবাইলসহ টাকা বা অন্য দামি কিছু থাকার সম্ভাবনা।

সূর্য পশ্চিমাকাশে চোখের আড়াল হয়ে যাচ্ছে প্রায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাগরিবের আযান দেবে। আর দেরি করা ঠিক হবে না–ভাবে মতি। অনেকক্ষণ ধরেই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে ওরা। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত আর আসে না। এসব ক্ষেত্রে, মতিদের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত, যখন পুরুষটি নারীকে জড়িয়ে ধরে, অথবা ঠোঁটে ঠোঁট স্পর্শ করে। অনেক পুরুষ আবার নারীর কোলে মাথা রেখে আবেশে চোখ বুজে থাকে, পুরুষটির মাথায় হাত বুলাতে থাকে মেয়েটা অথবা বুক নামিয়ে ঠেসে ধরে পুরুষের মুখ-চোখ-কপালের উপর। এরকম সময়ে হাজির হয় মতি ও তার দল। অপ্রস্তুত মুহূর্তে চালায় 'অপারেশন'। শুধু মুখের কথাতেই কাজ হয় অনেক সময়। সামাজিক পরিবেশ দূষিতকরণ ও বেলেল্লাপনার অভিযোগ তুলে নারী-পুরুষকে কোণঠাসা করে ফেলা যায় সহজেই। সবচেয়ে সহজ হয় তখন, মাঝবয়সী, পক্বকেশ কোনও পুরুষ যখন কচি বয়সী মেয়ে নিয়ে ঘুরতে আসে। এরা 'সামাজিক পরিবেশ দূষণ'-এর মত কিছু না করলেও দুর্বল হয়ে পড়ে মতিরা সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই। শোরগোল বাড়ানোর আগেই ঘড়ি-মানিব্যাগ-মোবাইল ফোন মতিদের হাতে হস্তান্তর করে মানে-মানে সটকে পড়ে। যুবক বয়সী কিছু পুরুষ 'নায়িকা'-র সামনে 'হিরো' হওয়ার বাসনায় গলা তোলে। তখন কষ্ট করে পকেট থেকে ধারাল ছুরিটা বের করতে হয় মতিদের। হিরো হওয়ার ইচ্ছে তৎক্ষণাৎ মিলিয়ে যায়। অথবা ভীত নায়িকাই নায়কের নায়কোচিত হয়ে ওঠায় বাধা দেয়।

আজ সেরকম সময় আসছে না আধঘণ্টার প্রতীক্ষাতেও। শুধুই হাতে হাত রেখে গল্প করে যাচ্ছে এ দু'জন। কিন্তু বিশেষ মুহূর্তের জন্য আর কতক্ষণ অপেক্ষা করা যায়?

সন্ধে নামার পর-পর যদি এরা চলে যায়, তো আজ হয়তো কোনও কামাই-ই হবে না মতিদের। দূরে বসা ষোলো-সতেরো বছর বয়সী ছেলে-মেয়ে দুটি যে হারে যা খুশি করছে, তাতে ওদের গিয়ে হয়তো ধরা যায়। কিন্তু ওদের কাছ থেকে একটা কমদামী মোবাইল ছাড়া তেমন কিছুই আশা করা যায় বলে মনে হয় না মতির। বোঝাই যাচ্ছে–স্কুল-কলেজ-পড়ুয়া ছেলে-মেয়ে।

রাতে কামাইয়ের সম্ভাবনা কম। মাঝে-মধ্যে হয়। তবে রাতে রমনা পার্কে আসে সাধারণত রিকশাওয়ালা-দিনমজুর শ্রেণীর লোকজন। হাতে হাত রেখে গল্প করা, একটু-আধটু চুমু, জড়িয়ে ধরে শারীরিক উষ্ণতা বিনিময়ের রোমান্টিকতা এদের ধাতে নেই। এরা পঞ্চাশ-এক শ' টাকায় পার্কের আশপাশ বা ভেতর থেকে নিশিকন্যাদের জোগাড় করে। 'ধর তক্তা, মার পেরেক'-টাইপে দশ-পনেরো মিনিটে বা বড়জোর আধঘণ্টায় কাজ সেরে চলে যায়। এদের সাধারণত বিরক্ত করে না মতিরা। কিন্তু কোনও-কোনও দিন খুব হাত-টান থাকলে অথবা নেশা চাগিয়ে উঠলে এদের কাছ থেকেও বিশ-পঞ্চাশ যা-ই পায়, রেখে দেয়।

আজকে হাত একদমই খালি। গত দু'দিন ধরে কোথাও থেকে কোনও কামাই নেই। হাতে যা ছিল, সব শেষ। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কবির মিয়া আসবে। ওর কাছে পাওয়া যায় নেশার উপকরণ–হেরোইন।

আজকে সারাদিন নেশা করা হয়নি মতিদের। আর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে হেরোইন না নিলে নিশ্চিত 'ব্যাড়া' উঠবে–সারা শরীরে ব্যথা, প্রচণ্ড ঘাম, নাক-চোখ দিয়ে অবিরাম পানি, পেটে মোচড়, কাঁপুনি–সব মিলিয়ে অসহ্য যন্ত্রণা তখন।

কবির মিয়া একটা খাটাশ–ভাবে মতি। এতদিন ধরে তার খদ্দের মতিরা, তাও বাকিতে কখনও দেয় না হেরোইন।

ব্যাড়ার ভয়ানক যাতনার কথা মনে হতেই তৎপর হয়ে ওঠে মতি, উঠে দাঁড়ায়।

দেখাদেখি রাজুও।

ধীরে হেঁটে গিয়ে দাঁড়ায় ওরা যুবক-যুবতীর সামনে।

যুবকটি বাম দিকে বসে আছে, যুবতীটি তার ডানে। মতি আর রাজুকে সামনে দাঁড়াতে দেখে যুবকটি চোখ তুলে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকায়। যুবতীটি আস্তে করে হাত ছাড়িয়ে নেয় যুবকের হাতের মুঠো থেকে।

শুরু করে রাজু, 'রমনা পার্ক কি মাগী লইয়া ফুর্তি করনের জায়গা? কী পাইছেন আপনেরা ভদ্দরলোকেরা? বাড়ি-ঘর-হোটেল নাই? হগলের সামনে এই ঢলাঢলির কী মানে? আপনাগো লাইগা পার্কের পরিবেশ নষ্ট হইতাছে। সাধারণ পাবলিক আপনাগো নষ্টামীর লাইগা পার্ক দিয়া চোখ খুইলা হাঁটতেও পারব না নাকি?'

সরাসরি আক্রমণে যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েছে যুবকটি। নিচু গলায় বলে, 'সরি, হোয়াট ডু ইউ মিন?'

ততক্ষণে সিরাজ চলে এসেছে পাশের বেঞ্চ থেকে। সে থামিয়ে দেয় যুবকটিকে, 'হইছে হইছে। দুই লাইন ইংরাজি শিখা আর ফুটানি মারন লাগত না। আপনেরা কি আকাম করতেছিলেন তা তো আমরা নিজ চউক্ষেই দেখছি। অহন কী চান? লোক জড় কইরা প্যাঁদানি দিমু, না পুলিশে ধরায়া দিমু?'

যুবকটি এবার যেন গলায় জোর ফিরে পায়, 'কী আজেবাজে বলছেন এসব আপনারা? আমরা আকাম করতেছি মানে? আমরা বসে-বসে গল্প করছি। কাউকে ডিস্টার্ব তো করি নাই। আপনাদের জন্য পার্কে বসাও যাবে না নাকি?'

রাজু তাকায় মতির দিকে। 'লম্পটে দেখি আবার কথা কয়।'

মতি এবার নেতৃত্ব নেয়, 'বহুত কথা কইছোস! বেশ্যা লয়্যা রংঢং করবি পাবলিকের সামনে, আবার মুখে ফুটানি! উইঠা দাঁড়া, দাঁড়ায়া কথা ক! অক্ষণ মোবাইল আর মানিব্যাগ বাইর কর, নাইলে এমন প্যাঁদানি শুরু করুম!'

'মগের মুল্লুক পেয়েছেন নাকি?' গলা একটু চড়ে যুবকটির। দাঁড়িয়ে যায় সে। 'ছিনতাইয়ের মতলব?'

গলা চড়তে দেয়া যাবে না। দূর থেকে লোকজন শুনতে পেয়ে চলে এলে সমস্যা। অপমান হয়তো করা যাবে, কিন্তু মানিব্যাগ-ঘড়ি এসব আর তখন পাওয়া যাবে না। মতি দ্রুত পরের ধাপে চলে যায়। পকেট থেকে টিপ-ছুরিটা বের করে। বোতামে চাপ দিতেই ধারাল ফলাটা বেরিয়ে আসে। 'হ, ছিনতাই-ই। তোর আপত্তি আছে? আপত্তি থাকলে ক! তোর ভুঁড়িটা নামায়া ট্যাকা আর মোবাইল নিয়া যামু! জানে বাঁচতে চাইলে চুপ থাক! চুপ কইরা যা আছে বাইর কর! ওই, মাগী, তোর ঘড়ি খোল! ব্যাগে কী আছে বাইর কর! তাড়াতাড়ি!'

ছোরা দেখে মুখ বন্ধ হয় যুবকের। বাম হাতে বাম পকেট থেকে মোবাইল বের করে। ডান হাত যায় পেছনের পকেটে।

মেয়েটি 'দাঁড়ান-দাঁড়ান, প্লিজ-প্লিজ মারবেন না' বলতে-বলতে ব্যাগের চেইন খোলে।

সিরাজ যুবকের মোবাইল সেটটা নেয়ার

মেসার্স আমীর অ্যাণ্ড সন্স

এখানে মাসিক রহস্যপত্রিকা বিক্রি করা হয়

৫৯/৩/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০

মোবাইল: ০১৭১১-১৩৭৮৫১, ০১৬১১-১৩৭৮৫১

ফোন: ৯৫৫৬৪৮৪, ৭১১১৩৭২

জন্য হাত বাড়ায়।

কিন্তু মোবাইলটা হাতে নেয়া হয় না আর সিরাজের। এর আগেই যুবকের ডান হাত সামনে চলে আসে। মতি, সিরাজ, রাজু–তিনজনেই অবাক হয়ে দেখে যুবকের হাতে শোভা পাচ্ছে একটা পিস্তল। পিস্তলের নল মতির বুক বরাবর তাক করা। বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! মেয়েটিও ব্যাগ থেকে পিস্তল বের করে। রাজুর দিকে তাক করে সেটা। একই সঙ্গে পেছন থেকে আওয়াজ আসে: 'হ্যাণ্ডস্ আপ!'

এই ইংলিশের অর্থ বোঝে তিনজনেই। ঘোর লাগা চোখে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে তাদের ঠিক পিছনে সিরাজের দিকে পিস্তল তাক করে আছে বাদামওয়ালা, কিছুক্ষণ আগেও যাকে বাদামের টুকরি সামনে রেখে বেঞ্চের উপর বসে ঝিমুতে দেখেছে ওরা। এখানেই শেষ নয়। কিছুটা দূরে আপাত দৃষ্টিতে ঘুমিয়ে থাকা লোকটিও উঠে চলে এসেছে। তার হাতেও শোভা পাচ্ছে পিস্তল।

দু'হাত ওপরে তোলে মতি। সিরাজ, রাজুও। মতির হাত থেকে ছোরাটা নিয়ে নেয় 'বাদামওয়ালা'। যুবক-যুবতীকে লক্ষ্য করে বলে, 'ওয়েল ডান, রজত, ওয়েল ডান, শিমু। ভাল দেখিয়েছ।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যর,' প্রত্যুত্তর করে দু'জনেই।

ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করে মতি, 'আপনারা কারা, স্যর?'

উত্তর দেয় 'বাদামওয়ালা', 'এখনও বুঝিস নাই? তোদের বাপ! গোয়েন্দা পুলিস! আজ থেকে শুরু "অপারেশন রমনা পার্ক"। তোদের মত ছিনতাইকারী, ইভটিজার আর পার্কে ঘুরতে আসা মানুষদের উত্ত্যক্ত করা বখাটেদের ধরার জন্য এই অপারেশন। তোদের কল্যাণে প্রথম দিনেই সাফল্য। এখন চল থানায়।'

রজতের দিকে তাকিয়ে বলে 'বাদামওয়ালা', 'সাংবাদিকদের খবর দাও। থানায় চলে আসুক। ফলাও করে ছাপা হোক কাহিনিটা। এরপর পার্কে ঘুরতে আসা লোকদের ছিনতাই করার আগে আশা করি এক শ'বার চিন্তা করবে ছিনতাইকারীরা।' ■

প্রকাশিত হয়েছে

একগুচ্ছ গল্পের সংকলন

তিনটি বই একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন

১৯৭৩ সাল থেকে শুরু করে তিন বছরে একের পর এক চোদ্দটি গল্প রচনা করেছিলেন লেখক পত্র-পত্রিকা ও বন্ধু-বান্ধবের অনুপ্রেরণা ও অপ্রতিরোধ্য তাগিদে।

তিন ভাগে তিনটি সংকলনে প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলো সেবা প্রকাশনী থেকে।

প্রতিটি গল্প ইংরেজি কাহিনির ছায়া অবলম্বনে রচিত।

তিনটি উপন্যাসিকা

তিক্তচন্দ্রমা, রূপান্তর ও মাকড়সা–এই তিনটি উপন্যাসিকা নিয়ে প্রথম বই।

ছায়া অরণ্য

দ্বিতীয়টিতে রয়েছে ছয়টি কাহিনি–উপন্যাসিকা: ছায়া অরণ্য, বড়গল্প: ইচ্ছা এবং গল্প: ভয়াল দ্বীপ, যন্ত্রণা, ঠিক দুক্ষুর বেলা ও এপ্রিল ফুল।

পঞ্চ রোমাঞ্চ

শেষ বইটিতে রয়েছে পাঁচটি কাহিনি–উপন্যাসিকা: ওস্তাদ এবং চারটি বড়গল্প: অন্য কোনোখানে, পরকীয়া, ক্যান্সার ও ঝামেলা। পড়ুন। উপভোগ করুন।

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম

৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

শাড়ি

আল আমিন

তাঁর অন্তঃপুরীতে অবলা, অসহায়, এতিম, সদ্য-প্রসবিনী এক নারীর কষ্টটুকু তিনি খেয়াল করতেন না।

আমার বয়স যখন সাতদিন, তখন আব্বা এক ট্রাক রসুন নিয়ে মোকামে গেলেন দিনাজপুর। যাবার আগে দাদার সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হলো। দাদা ছিলেন খুব রাগী মানুষ। ছেলে-মেয়েদের যারপর নাই বকাবকি করতেন। আব্বাকে কী নিয়ে যেন খুব বকাবকি করলেন। আব্বা প্রতি-উত্তর করেননি। কিন্তু মনে-মনে খুব খেপেছেন। আব্বা যে রাগে ফেটে পড়ছেন তা সবাই পরে বুঝতে পারল। সাতদিন পর আব্বার মোকাম থেকে ফেরার কথা ছিল। তিনি না ফিরে ওই পথেই খুলনায় আমার এক দূর সম্পর্কের চাচার বাড়ি গিয়ে উঠলেন।

উঠলেন তো উঠলেনই। ছয় মাস তাঁর আর খবর পাওয়া গেল না। তখন এমন মোবাইলের চল ছিল না যে হুটহাট করে খবর নেয়া যাবে।

আব্বা নিরুদ্দেশ। মা তাঁর ছোট্ট সন্তানকে নিয়ে পড়লেন মহাবিপদে। আমাদের বড় বাড়ি। হাজারটা লোকের আনাগোনা। মা তাঁর সুবিধা-অসুবিধার কথা কাউকে বলতে পারেন না। তা ছাড়া, সে যুগে মেয়েরা ছিল নিগৃহীত। তাদের প্রয়োজন পূরণ না হলে এমন কিছু যেত-আসত না। শাড়ি, গহনা, কসমেটিক্স্ বা খাবার-দাবারে এতটুকু বিলাসিতা ছিল না মায়ের জীবনে।

দাদা অনেক জমি-জায়গার মালিক। এক কথায় জমিদার। কিন্তু তাঁর অন্তঃপুরীতে অবলা, অসহায়, এতিম, সদ্য-প্রসবিনী এক নারীর কষ্টটুকু তিনি খেয়াল করতেন না। তাঁর যত্ন-আত্তির খোঁজ কেউ রাখত না। আমি মায়ের দুধ খেতাম। তাঁর যথেষ্ট পুষ্টিকর খাবারের দরকার ছিল। তিনি তা পেতেন না। প্রত্যেক বেলায় আমাদের বাড়িতে ত্রিশ-চল্লিশজন লোক খাওয়া-দাওয়া করত। সবার শেষে খায় মেয়েরা। মা খেতে যেতেন। তেমন খাবার আর অবশিষ্ট থাকত না। হাঁড়ি-কড়াই মুছে চেটেপুটে কিছুটা উদর পূর্তি হত। দুধ, ডিম বা ফলমূল—সে অনেক দূরের কথা!

দাদা যে খারাপ মানুষ ছিলেন, তা নয়।

খয়রাত অনেক করতেন। ছেলের বউয়ের জন্য তাঁর ভালবাসার কমতি ছিল না। কিন্তু কী জানি! অন্তঃপুরীর অন্য ব্যাপার হয়তো তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখত।

আব্বা তখন বেকার। তেমন কিছু করেন না। নিজের স্ত্রী-সন্তানের জন্য তিনি বাড়তি কিছু করতেন না। হয়তো লজ্জা পেতেন। দাদা আব্বাকে বকাবকি করতেন, 'বি. এ. পাশ করে বসে আছিস কেন? চাকরি-বাকরি খোঁজ। একটা কিছু কর।'

তিনি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। আব্বাকে বলতেন জমি-জায়গা ভাইবোনদের মাঝে সব ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে যাবে। তখন আর জমিদারি থাকবে না। মা দাদাকে সমর্থন করতেন। আব্বা ছিলেন উদাসীন। প্রচণ্ড সরল টাইপের মানুষ। কেউ যদি চোখে-মুখে গভীর মায়া টেনে বলতেন দুয়ে-দুয়ে পাঁচ, তিনি তাই বিশ্বাস করতেন: আহা, লোকটার চোখে-মুখে কী মায়াই না জেগে উঠেছে। যা বলছে তা নিশ্চয়ই সত্যি।

আমার জন্মের সময় মা'র পরা শাড়ি ছিল একটা। তোলা শাড়ি দুটো। তোলা শাড়ি তো আর বাড়িতে পরা যায় না। এক শাড়িতে মা'র খুব কষ্ট হত। যেসব বাচ্চা মায়ের দুধ খায়, তারা নাকি ঘন-ঘন বাথরুম করে। আমিও তাই করতাম। মা এক শাড়িতে পড়তেন বিপাকে। আমাকে কোলে নিয়েছেন। অমনি আমি বাথরুম করে দিয়েছি। মা আমাকে শুইয়ে বা কারও কোলে দিয়ে চুলোর পিঠে গিয়ে শাড়ি শুকিয়ে আসতেন। শাড়ির শুকনো অংশ পরে ভেজা অংশ চুলোর উপর ধরতেন। শাড়ি শুকিয়ে যেত। মা এসে আমাকে কোলে নিতেন। ভেজা শাড়ি পরে থাকা যাবে না। আমি মায়ের দুধ খাই। মা'র ঠাণ্ডা লাগলে আমারও লেগে যাবে। নিজের কষ্ট হলেও সন্তানের ঠাণ্ডা লাগতে দেয়া যাবে না। তিনি তো মা! গোসল সেরে পরনের শাড়িটা ধুয়ে একটা তোলা শাড়ি পরতেন মা। তারপর সেটা রোদে শুকিয়ে পুনরায় পরতেন আর তোলাটা উঠিয়ে রাখতেন।

আমাকে দেখে সবাই কম-বেশি টাকা দিত।

মা সেই টাকা জমালেন। জমিয়ে চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকার মত হলো। বাড়ির কাজের লোককে হাটবারে টাকাটা দিয়ে বললেন একটা শাড়ি আনতে।

সে খুবই নিচু মানের একটা পরার শাড়ি এনে দিল মাকে।

মা সেটা পেয়েই মহাখুশি। ছেলে নিয়ে তাঁকে আর কষ্ট পোহাতে হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটিতে আমার মেজ চাচা বাড়িতে এলেন। এসে দেখেন মা ওই শাড়িটা পরে আছে। দাদিকে বললেন, 'মা, তোমার ছেলের বউকে শাড়িটা কে কিনে দিয়েছে? এমন একটা শাড়ি আমাদের হলের ক্লিনার মহিলাটা পরে।'

আমি বড় হয়েছি। এখন সম্মানজনক চাকরি করি। আব্বা বেঁচে নেই। দাদাও মারা গেছেন। মাকে নিয়ে ভাড়া বাসায় থাকি। সুখেই আছি আমরা। আমি এখন প্রতিমাসে মাকে শাড়ি কিনে দিতে পারি। মাকে কখনও যদি শাড়ি কিনে দিতে চাই, মা বলেন: 'লাগবে না। যখন শাড়ি পরার বয়স ছিল তখন পাইনি। এখন কী করব?'

মা'র কণ্ঠে স্পষ্ট ফুটে ওঠে অভিমান। ছোট্ট খুকীর মত মায়ের মুখটা পাংশু বর্ণ ধারণ করে। ■

সেবা প্রকাশনী ও প্রজাপতি প্রকাশন-এর যাবতীয় নতুন ও রিপ্রিন্ট বই বিক্রেতা
এন. সি. পোস্টার হাউস (নিউজ কেবিন)
শহীদ ডা. জিকরুল হক রোড, সৈয়দপুর, নীলফামারী
প্রোপ্রাইটর: খালিদ নিয়াজী (নান্না)
মোবাইল: ০১১৯৯-৩৭০৮১৫, ০১৭১৮-৪২০৪৬৭

রম্য গল্প

দ্বন্দ্ব

খো. মেহেদি হাসান

আমার ভারি মনে ধরল কথাটা। দ্বন্দ্ব! আহ্, কী শব্দ একখান!

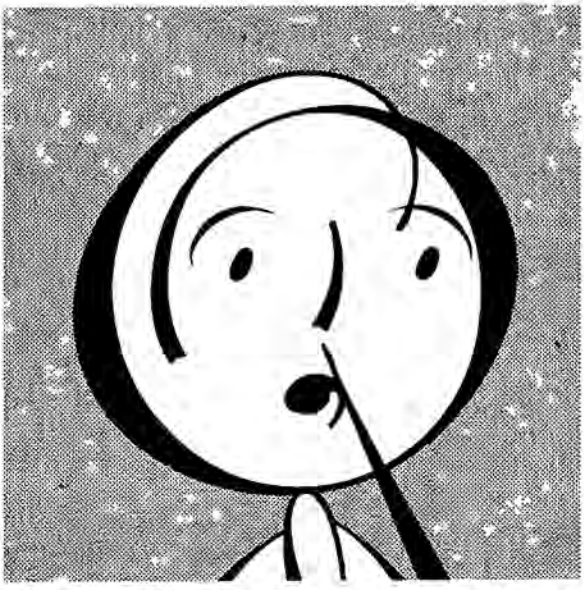

সকালে অফিসে ঢুকছি। প্রতিদিনের মত বুটের শব্দ তুলে সালাম দিল ব্যাংকের গার্ড। আমিও গম্ভীর মুখে মাথা ঝাঁকালাম। প্রতিদিন এই সময়ে আমার নিজেকে সেনাবাহিনীর ফিল্ড মার্শালের মত মনে হয়। অবশ্য কিছু পরেই কোনও কারণে অথবা অকারণে ম্যানেজার যখন দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ওঠেন, তখন আবার নিজেকে ফুটপাতের হকারের মত লাগে। যাকগে। অফিসে ঢুকে নিজের সিটে বসতে না বসতেই রবিন ভাই ডাকলেন, 'ইমন, এদিকে একটু এসো তো।'

রবিন ভাই আমাদের ব্রাঞ্চের ফরেন এক্সচেঞ্জ ইনচার্জ। তাঁর ভাবভঙ্গি একটু উঁচুদরে বাঁধা থাকে। সবাই বেশ খাতিরও দিয়ে চলে ওঁকে। আমিও হেঁ-হেঁ করে ভারি একটা বিনীত ভাব নিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়ালাম।

উনি বললেন, 'বসো, তোমাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিই। ভাল ব্যাংকার হতে হলে তোমাকে সবসময় সতর্ক থাকতে হবে।'

আমি চোখ বুজে মাথা নেড়ে বললাম, 'তা তো অবশ্যই। আমি কিন্তু খুব সতর্ক, ভাইয়া। ভিড়ের মধ্যে যাতে পকেট মার না হয়, সেজন্যে মানিব্যাগ পকেটে না রেখে হাতে রাখি, আবার মৌমাছি প্রতিশোধ নিতে পারে ভেবে মধুও খাই না।'

রবিন ভাই কেমন একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন, তারপর একটু অদ্ভুত চোখে আমার দিকে

তাকিয়ে বললেন, 'উঁহুঁ, সে কথা হচ্ছে না। কথা হচ্ছে দ্বন্দ্ব। কোনও কিছুতেই না বুঝে না দেখে চট করে সিদ্ধান্ত নেবে না। দ্বন্দ্বের মধ্যে থাকতে হবে সবসময়, দ্বন্দ্বই তোমাকে সত্যকে দেখাবে।'

আমার ভারি মনে ধরল কথাটা।

দ্বন্দ্ব!

আহ্, কী শব্দ একখান!

ওই যে দূরে বসে নতুন ইন্টার্নি সুন্দরী মেয়েটা, যাকে দেখলেই গোটা কয়েক হার্টবিট মিস হয়ে যায় আমার, সে কি আসলে সত্যিই সুন্দরী?

আমি ভাল করে দেখার জন্য একটু উঁচু হলাম। দূর থেকে ঠিক বোঝা না গেলেও কেন যেন আমার মনে হতে লাগল, মেয়েটার চুলগুলো একটু লালচে, রুক্ষ, দাঁতগুলোও কি একটু উঁচু-নিচু নয়?

উঁহুঁ, চট করে কোনও সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছে না।

দ্বন্দ্ব হচ্ছে, দ্বন্দ্বই জীবন।

আমার এ ধরনের উচ্চমার্গীয় চিন্তাধারায় বিঘ্ন ঘটালেন ম্যানেজার স্যর। হুট করে তাঁর কাঁচ ঘেরা রুম থেকে বের হয়েই বললেন, 'ইমন, ফলো মি!'

আমি তটস্থ হয়ে স্যরকে ফলো করলাম। ব্যাংক থেকে বেরিয়ে উনি গাড়িতে উঠলেন। আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ফলো করছিলাম তাঁকে। উনি খেঁকিয়ে উঠলেন, 'গাড়িতে ওঠেন।'

ম্যানেজার আমাকে নিয়ে গেলেন এক সরকারি স্বায়ত্তশাসিত অফিসে। এদের অনেক প্রজেক্টের টাকা ডিপোজিট আছে আমাদের ব্যাংকে। সম্প্রতি বিভিন্ন ব্যাংকের নজর পড়েছে এই ডিপোজিটের উপর। তাই একটু সম্পর্ক বজায় রাখতে আসা।

অফিসের বড়কর্তা খুব হ্যাণ্ডসাম। নিচু গলায় ধীরে কথা বলেন। আমাদের সঙ্গে খুব ফ্রেণ্ডলি ভঙ্গিতে গল্প করলেন। দেশে চরম অরাজকতা, নৈতিকতার চরম অধঃপতন নিয়ে একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেললেন। একফাঁকে বললেন যে তাঁর অফিসে সাধারণ মানুষের যে ভোগান্তি পোহাতে হয়, সেটাও এক চরম সংঘবদ্ধ অনাচার। দুরাচারদের হাত থেকে তিনি অফিসকে রক্ষা করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, যদিও তাঁর হাত-পা বাঁধা।

আমি এত মুগ্ধ হয়ে গেলাম যে চোখে পানি এসে গেল, দু'একবার মনেও হলো, এই তো, এই সেই বীর, এই সেই লোক, যাকে খুঁজছে বাংলাদেশ। চরম ক্লাইমেক্সে হাততালিও দিয়ে ফেললাম একবার।

ভদ্রলোকের কাছ থেকে ফেরার সময় তাড়াহুড়োয় পায়ের ধুলোটা নেয়া হলো না বলে মনটা খারাপ হলো একটু।

ফেরার পথে গাড়িতে ম্যানেজারের ফোন বেজে উঠল। সেই বড়কর্তার পিএস ফোন করেছেন। ইনিয়ে-বিনিয়ে পিএস বললেন, চারদিক থেকে ব্যাংকগুলোর ভীষণ চাপ চলছে ডিপোজিটের, সরকারি অফিস, নানান তদবির ঠেকাতে হচ্ছে বড়কর্তাকে। একটা আইফোন হলে এসব চাপটাপ ঠেকাতে সুবিধা হত বেশ।

'আইফোন!' ম্যানেজার একটু বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

'না... না, ওটা বড়কর্তার জন্য নয়, বড়কর্তার ছেলে ইউনিভার্সিটি ভর্তি হয়েছে... তার জন্যই আর কী!'

চাঁদের অন্য পিঠের মত ভদ্রলোকেরও অন্য পিঠ দেখে আমার হঠাৎ করে রবিন ভাইয়ের কথাটা মনে পড়ল:

দ্বন্দ্ব!

আহা, কী চমৎকার শব্দ ওটা! ■

জাতীয় পত্রিকা ও সেবা প্রকাশনীর বইসহ সৃজনশীল বইয়ের বিপুল সমাহার
আনন্দ বিপণী
১০ খান সুপার মার্কেট, জনতা ব্যাংক মোড়
ফরিদপুর।
মোবাইল: ০১৭১১-২৩৪২৭৩, ০৬৩১৬-৪৪৬৭

স্বপ্নপূরণ

মোঃ আব্দুল হাকিম

যে সিনেমা দেখার জন্য এত শাস্তি, এত ঝক্কি-ঝামেলা, সে সিনেমার পাত্র-পাত্রীদের দেখার সাধও জাগত মনে।

ছাত্রজীবনে সিনেমা দেখার জন্য কত যে স্কুল পালিয়েছি, তার কোনও শেষ নেই। পরদিন ক্লাসে গিয়ে যথারীতি স্যারের হাতে পিটুনি খেয়েছি। আর সিনেমা দেখার কথা যদি বাপ-মা কোনওভাবে জানতে পেরেছে, তা হলে ভাত বন্ধসহ আরও অনেক ধরনের শাস্তির খড়্গ নেমে আসত। কিন্তু তাই বলে সিনেমা দেখা থেমে থাকেনি। যে সিনেমা দেখার জন্য এত শাস্তি, এত ঝক্কি-ঝামেলা, সে সিনেমার পাত্র-পাত্রীদের দেখার সাধও জাগত মনে। কিন্তু সাধ জাগলেই তো আর সব সাধ মেটে না।

১৯৮৭ সাল। মোটর দুর্ঘটনায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হলেন বাবা। আমরা দু'ভাই বাবার চিকিৎসার জন্য বাবার সঙ্গে ঢাকা গেলাম। প্রয়োজনের তাগিদে ছোট ভাই অনেক আগে থেকেই ঢাকায় যাতায়াত করছে, কিন্তু ইতিপূর্বে আমি কখনও ঢাকা যাইনি। সেবারই প্রথম ঢাকা গেলাম। বাবার কাছে হাসপাতালে দু'ভাই পালা করে থাকি। বিকাল থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত ছোট ভাই আর সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত আমি থাকি। আমরা গ্রীনরোডের ওদিকে কোনও এক বাসায় থাকতাম। সেখান থেকে প্রতিদিন হাসপাতালে যাতায়াত করতাম। ওই বাসায় আমার দূরসম্পর্কের সমবয়সী এক চাচা থাকত। আমি রাস্তাঘাট চিনতাম না বলে প্রতিদিন সকালে ওই চাচা আমাকে হাসপাতালে রেখে আসত এবং বিকেলে নিয়ে আসত। প্রতিদিন সকালে বাবার জন্য ফ্লাস্কে করে গরম দুধ নিয়ে যেতাম। এভাবে কয়েকদিন চলার পর বাবা একটু সুস্থ হলেন; আমরাও কিছুটা স্বস্তি পেলাম।

একদিন বিকেলে ওই চাচা আমাকে নিতে হাসপাতালে গেল। ফেরার পথে রাস্তার ধারে বিভিন্ন সিনেমার পোস্টার চোখে পড়ল। সিনেমাতে যেসব নায়ক-নায়িকা দেখি, বাস্তবে তাদের দেখার সাধ কত দিনের! কিন্তু শখ থাকলেই তো আর তা সবসময় মেটানো যায় না। ঢাকায় যখন এসেছি, তখন সেই সাধটা মেটানোর একটা সুযোগ আছে। তাই চাচাকে খুব

করে অনুরোধ করলাম, যেন আমাকে এফডিসি-তে নিয়ে যায়। কারণ আমি তো রাস্তাঘাট ভাল চিনি না।

অনেক অনুরোধের পর চাচা রাজি হলো। এফডিসির গেটের সামনে গিয়ে দেখলাম অনেক মানুষের ভিড়। প্রিয় নায়ক-নায়িকাকে দেখার জন্য আমার মত ওরাও সব এসেছে দূর-দূরান্ত থেকে। কিন্তু ভিতরে ঢোকার কোনও সুযোগ নেই। প্রবেশদ্বারে ইয়া বড় গোঁফওয়ালা আব্দুল কাদের (যিনি বিভিন্ন সিনেমায় জল্লাদ বা দস্যুর ভূমিকায় অভিনয় করেন) লাঠি হাতে পাহারায় আছেন। এফডিসি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া কেউই ভিতরে যেতে পারছে না।

অনেকক্ষণ ধরে দেখছি আর ভাবছি কী করা যায়। হঠাৎ ইউরেকা বলে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

চাচা কৌতূহলী হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

চাচাকে বললাম, 'আমি ভিতরে যাচ্ছি, তুমি অপেক্ষা করো, ভিতরটা দেখে আসি।'

চাচা বলল, 'আমার জন্য চিন্তা করতে হবে না, তুমি কীভাবে যাবে যাও, আমি আছি।'

এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দেখলাম বেশ কয়েকজন ছেলে এফডিসির বাইরে থেকে ফ্লাস্কে করে চা নিয়ে ভিতরে যাচ্ছে। আমিও ওদের মত আমার হাতের ফ্লাস্কটা বুকের সামনে উঁচু করে ধরে (যেন চা নিয়ে যাচ্ছি) বীরদর্পে এফডিসির ভিতরে ঢুকে গেলাম। বিখ্যাত গোঁফওয়ালা আব্দুল কাদের আমাকে কিছুই বলল না। ভিতরে ঢুকতে পেরে যেন বিশ্বজয় করেছি এমন একটা অনুভূতি আমার। ভিতরে গিয়ে ববিতা-উজ্জ্বলকে বীরাঙ্গনা সখিনা ছবির শুটিং করতে দেখলাম। অঞ্জু ঘোষকে দেখলাম সাগর ভাসা (সম্ভবত) ছবির শুটিঙে। প্রয়াত জসিম-গুইকে দেখলাম টাকা-পয়সা ছবির শুটিঙে। বাস্তবে এদের দেখে আমি তো অভিভূত। আরও বেশ কয়েকটি ছবির শুটিং দেখলাম।

সবগুলোর নাম আজ আর মনে নেই। কিছুক্ষণ পর দেখি কীভাবে যেন আমার সেই চাচাও এফডিসির ভেতরে চলে এসেছে। দু'চাচা-ভাতিজা অনেকক্ষণ ধরে এফডিসিতে বিভিন্ন ছবির শুটিং আর স্বপ্নের নায়ক-নায়িকাসহ সিনেমা জগতের অন্যান্য কলাকুশলীদের প্রাণভরে দেখলাম।

আর কী চাই? ■

অচিরেই পুনঃপ্রকাশিত হচ্ছে

কিশোর থ্রিলার

তিন গোয়েন্দা

ভলিউম-১৪১

শামসুদ্দীন নওয়াব

দ্বীপের রাজা/শামসুদ্দীন নওয়াব: কন্ট্রা দ্বীপের রাজপুত্র র‍্যামি তিন গোয়েন্দার বন্ধু। ওর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে কন্ট্রায় গেছে তিন গোয়েন্দা। চুরি গেল রাজা, অর্থাৎ র‍্যামির বাবার একাত্তরটা সোনার বার। সন্দেহভাজনদের মধ্যে আসল অপরাধী কে? রহস্য সমাধানে তদন্তে নামতে দেরি করল না কিশোর, মুসা, রবিন।

গুপ্তনগরী/শামসুদ্দীন নওয়াব: তুরস্কের প্রাচীন এক গুপ্তনগরীতে বন্দি হয়েছে কিশোর আর মুসা। স্বঘোষিত এক রাজা বলি দিতে চায় ওদেরকে। পালাবার সব পথ বন্ধ। সম্বল শুধু উপস্থিত বুদ্ধি। দেখা যাক, কী হয়!

ম্যাক লরেঙ্গের উইল/শামসুদ্দীন নওয়াব: ম্যাক লরেঙ্গের উইল অনুযায়ী সত্যিই কি আছে গুপ্তধন? না, শুধু গুপ্তধন নয়, এটা চুরি, ডাকাতি, বিষ প্রয়োগ, অপহরণ, অগ্নিকাণ্ড ও নরহত্যার জটিল কেস! তিন গোয়েন্দা হাড়ে হাড়ে টের পেল, যেকোনও মুহূর্তে মারা পড়বে এখন; তবুও জেদ ধরল, সব সমাধান না করে ছাড়বে না ওরা!

দাম ■ একশ' সাতষট্টি টাকা

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম

৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ছায়াশ্বাপদ

আবুল ফাতাহ

এই 'কাহিনি' পছন্দ হয়নি সালাম সাহেবের। তিনি সম্ভবত নারীঘটিত রগরগে কোনও কাহিনি আশা করেছিলেন।

এক

এই নিয়ে তিনবার।

ব্যাচেলর মানুষ আমি। ছোটখাট একটা চাকরি করি। থাকি দু'রুমের একটা বাসা নামের 'কলঙ্ক'-তে। আমার সঙ্গে আরেকজন থাকে। আব্দুল মতিন। ছেলেটাকে পুরো নামে ডাকতে হয়, নইলে রীতিমত খেপে যায়। আমার মতই ছা-পোষা মানুষ আব্দুল মতিন। কোনও রকমে টিকে আছি আমরা এই নগরে।

মতিনের চাকরিটা ঠিক কী, আমি বিস্তারিত জানি না। খুব সকালে বেরিয়ে যেতে দেখি, ফেরে গভীর রাতে। সামান্য মাইনের বেশির ভাগটাই বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। আমি একা মানুষ বলে আর রান্নার ঝামেলায় যাইনি। বাসার পাশের সস্তার হোটেলে মাসকাবারি বন্দোবস্ত আছে। দুই বেলা খাবার দিয়ে যায়। দুপুরের খাবার সারি অফিসের ক্যান্টিনে। বাইরের খাবার খেতে-খেতে আজকাল জিভটা আড়ষ্ট হয়ে গেছে।

সকালবেলাটায় হোটেলের বিক্রি বেড়ে যায়। প্রায় দিনই আমাকে গিয়েই খেতে হয়, যদি না অফিসে লেট করতে চাই। নাস্তা সেরে ওখান থেকেই অফিসে দৌড়।

আজ সকালে নাস্তা খেতে বের হতেই আফজাল সাহেবের সঙ্গে দেখা। পাশের বাসাতেই

ফ্যামিলি নিয়ে থাকেন। আলাপী লোক। আমাকে দেখেই হই-হই করে ছুটে এলেন।

'কী, তাহের ভাই, আছেন কেমন?' একগাল হাসলেন ভদ্রলোক।

আমি আসলে খুব বেশি ভাল নেই। বাড়ি থেকে বিয়ের জন্য চাপ দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এই সামান্য চাকরিটাকে সম্বল করে আরেকজন মানুষের ভার কাঁধে নেবার মত সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারছি না। এসব কথা বলার মত ঘনিষ্ঠতা নেই আমার আফজাল সাহেবের সঙ্গে। তাই কাষ্ঠ হাসি হেসে বললাম, 'আছি, ভাই, ভালই আছি।'

'হে-হে, ভাল তো থাকবেনই। তা, ভাই কি গুপ্তধন পাইছেন নাকি?' ষড়যন্ত্রীর মত গলা নামিয়ে বললেন আফজাল সাহেব।

আমি হেসে ফেললাম। 'আমাকে দেখে কি মনে হয়, আমি গুপ্তধন পেয়েছি?'

'আপনাকে দেখলে মনে হয় না, কিন্তু আপনার কুকুরগুলো দেখলে তো ঠিকই মনে হয়। গুপ্তধন না পাইলে কি আর এই বাজারে কেউ তিনটা কুকুর পালে?'

আমার বুকের মধ্যে কী যেন একটা ধাক্কা দিয়ে গেল।

'কুকুর পালি মানে? কবে দেখলেন?' আমি সতর্ক হয়ে জানতে চাইলাম। বুকটা ধক-ধক করছে।

'এই তো, কালকে রাত্রেই তো। আপনে মনে হয় অফিস থেইকা ফিরতাছিলেন। আমি বারান্দায় দাঁড়ায়ে দেখলাম তিনটা বিশাল কুকুর আপনের পিছে-পিছে আসতেছে। তিনটাই কালো রঙের।'

এই নিয়ে তিনবার শুনতে হলো কথাটা।

তিন দিন আগে প্রথমবার। সেদিন অফিস থেকে ফিরতে রাত হয়েছিল খানিকটা। মাঝে মধ্যেই হয়। বসেরা কাজ ধরিয়ে দেয়। না করার জো নেই।

পরদিন অফিসে যেতেই বুড়ো দারোয়ান কী কথায় যেন বলল, আগের রাতে আমি নাকি অফিস থেকে বেরুতেই কোত্থেকে এসে আমার পিছু নেয় তিনটা ভীমদর্শন কুকুর। কালো রঙের।

গতকাল শুনলাম আনিসের মুখে। ছোকরা হোটেলের বয়। আমার বাড়িতে ও-ই খাবার নিয়ে আসে। কাল রাতে খাবার দিয়ে যাবার আগে জানাল, আমার বাসার সামনে নাকি তিনটা কুকুর বসে আছে। শুনে কী মনে করে ওর সঙ্গে বাইরে এলাম। কুকুরের লেজের দেখাও পাইনি।

কী হচ্ছে এসব? আমার আশপাশে তিনটা কুকুর দেখতে পাচ্ছে কেন মানুষজন? আমি কেন পাচ্ছি না তবে? আচ্ছা, এমন কি হতে পারে, কুকুরগুলো কোনও কারণে আমার আশপাশে ঘুরঘুর করছে ঠিকই, কিন্তু দুশ্চিন্তায় ডুবে থাকা আমার মস্তিষ্ক তাদের শনাক্ত করতে পারছে না। আনমনা চোখ দুটো ব্যর্থ হচ্ছে তাদের দেখতে।

উঁহুঁ, 'হতে পারে' না, এটাই হয়েছে। লক্ষণ খুবই খারাপ। আমি আমার চারপাশটাকে অস্বীকার করতে পারি না। আমাকে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে প্রকৃতির প্রতিটা পরিবর্তন লক্ষ করতে হবে। অথচ আমার আশপাশে তিনটা জলজ্যান্ত কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমার সে খবর পর্যন্ত নেই। মানুষের মুখ থেকে শুনতে হয়। এখন থেকে পূর্ণ মনোযোগে লক্ষ্য করব আমার চারপাশের খুঁটিনাটি।

সিদ্ধান্তটা নেয়া হতেই হালকা লাগল নিজেকে।

দুই

গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেল। মাথা তুলতে পারছি না। ভারী হয়ে আছে, যার ফলে আন্দাজ করতে পারলাম, বেশিক্ষণ ঘুমাতে পারিনি। রাতের অনেকটা এখনও বাকি। তবে ঘুম ভাঙল কেন? কারণ ছাড়া আমার গভীর ঘুম ভাঙার কথা না। মনে হচ্ছে ঘুমের ঘোরে কোনও শব্দ পেয়েছি।

কোনও রকম আগাম আভাস ছাড়াই অচেনা এক ভয় আমাকে গিলে ফেলল। অপার্থিব একটা অনুভূতি হচ্ছে। কেবলই মনে হতে লাগল, রুমে আমি একা নই। কেউ একজন আমার খুব কাছেই রয়েছে, এবং সে আর যে-ই হোক, আমার রুমমেট নয়। কারণ, আব্দুল মতিন আজ সন্ধ্যায় বাড়ি গেছে। বাসায় আমি একা, সম্পূর্ণ একা!

শব্দটা শুনতে পেলাম ঠিক তখনই। এবার ঘুমের ঘোরে নয়। পূর্ণ সচেতনতায়।

ঘেউ! ঘেউ!

কুকুরের ডাক!

আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম বিছানায়। আমার রুমে কোনও ডিমলাইট নেই। স্ট্রীট লাইটের চিকন একটা রেখা প্রতি রাতে এসে পড়ে আমার রুমে। কাজ চলে যায় তাতেই। এইমাত্র লক্ষ করলাম, আজ সেটাও নেই। ডেঁপো ছোকরার দল ভেঙে ফেলেছে ঢিল ছুঁড়ে। মশারি টানানো রয়েছে। গোলাপী রঙের জালের ফাঁক দিয়ে তিন জোড়া অঙ্গার চোখে পড়ল আমার। ঠিক পায়ের কাছেই। কয়লার আগুন যেমন ধিকি-ধিকি জ্বলে, ঠিক সেভাবেই জ্বলছে। আরও অনেক বেশি ভীতিকর উজ্জ্বলতায়। যেন তীব্র আক্রোশ ওগুলোর জ্বালানি।

আমার সারা শরীর আচমকাই কাঁপতে লাগল থরথর করে। কাঁপুনি শুরু হয়েছে বিশ্রী পচা গন্ধটা নাকে আসা মাত্রই। এইমাত্র কেউ কবর খুঁড়ে পচা মাংস খেয়ে সামনে দাঁড়ালেই শুধু এমন নারকীয় গন্ধ পাওয়া সম্ভব। গা গোলাচ্ছে আমার। তীব্র ভয় পেট উল্টে বমি করা থেকে বাঁচিয়ে দিল।

গড়ড়ড়...আওয়াজ পাচ্ছি অন্ধকারের বুকে। শ্বাপদেরা ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে এভাবেই আওয়াজ করে। অজান্তেই আমি চোখ বন্ধ করে ফেললাম।

এভাবে কতক্ষণ ছিলাম বলতে পারব না। নাকে লেগে থাকা সেই গন্ধটা একসময় বিলীন হতেই ভয়টা কমতে লাগল। চোখ মেললাম ধীরে-ধীরে। তাকালাম সামনে। কোনও অঙ্গার জ্বলতে দেখলাম না। নেই কোনও পাশবিক আওয়াজও। খাঁ-খাঁ করছে গোটা রুম। নিস্তব্ধতা ভীতির উৎকৃষ্ট উৎস। কিন্তু এই নিস্তব্ধতা আমার ভাল লাগল। যেভাবে এসেছিল, ভয়টা ঠিক সেভাবেই মিলিয়ে গেল। মাথা তেমন একটা না ঘামিয়েও আমি পুরো ব্যাপারটা বুঝে ফেললাম।

দরজাটা রাতে ঘুমাবার আগে প্রতিদিন মতিনই লাগিয়ে দেয়। আজ ও না থাকায় দরজাটা নিশ্চয়ই খোলা রয়ে গেছে। আমি লাগিয়েছি কি না মনে করতে পারছি না। আর সেই সুযোগেই আমার পেছনে ঘুরঘুর করতে থাকা কুকুরগুলো বাসায় ঢুকে পড়েছে। আসার আগে ডাস্টবিন ঘেঁটেছে শয়তানগুলো। পচা গন্ধটা তাতেই ছড়িয়েছে। আর আমি ভেবেছি...হা-হা-হা!

আসলে গভীর রাতে চোখ খুলে তিনটা কুকুর দেখতে পেলে যতটা ভয় পাওয়া উচিত, আমি তার থেকে মোটেও বেশি পাইনি। অনেকে যে হার্টফেল-টেল করে বসত সেটা নিশ্চিত করেই বলা যায়।

আমি বিছানা ছাড়লাম। দরজা বন্ধ করতে হবে। কুকুর তিনটেকে বারকয়েক 'কুত্তার বাচ্চা' বলে গালি দিয়ে অন্ধকারেই হাতড়ে-হাতড়ে এগোলাম দরজার দিকে। দরজার কাছে পৌঁছে আন্দাজে হাত রাখলাম ছিটকিনিতে। সঙ্গে-সঙ্গে শিরদাঁড়া বেয়ে বরফ নামল। বুকের খাঁচায় প্রবল ছটফটানি হৃৎপিণ্ডের। পুরানো ভয়টা ফিরে এল আগের চাইতেও তীব্র মাত্রা নিয়ে।

দরজাটা লাগানোই ছিল...

তিন

'আচ্ছা, আপনি কি খালি কুত্তার কথাই বোঝেন, নাকি অন্য পশু-পাখিরগুলাও বোঝেন?' হাসি-হাসি মুখ করে প্রশ্ন করলেন সালাম সাহেব। আমার কলিগ।

কাল রাতের ঘটনার পর মনটা কুঁকড়ে আছে আমার। সালাম সাহেবের ধূর্ত চোখ এড়ায়নি সে ভীতির ছাপ। কাজের ফাঁকে-ফাঁকে সুযোগ পেলেই 'ঘটনা' জানতে চাইছেন। শেষ পর্যন্ত কিছুটা বিরক্ত হয়ে আর বাকিটা মনকে হালকা করার উদ্দেশ্যে ক্যান্টিনে বসে ঘটনা খুলে বললাম। এরপর থেকেই মনে হচ্ছে, ভুল করে ফেলেছি। এই 'কাহিনি' পছন্দ হয়নি সালাম সাহেবের। তিনি সম্ভবত নারীঘটিত রগরগে কোনও কাহিনি আশা করেছিলেন। গম্ভীর মুখে পুরোটা শুনে আচমকাই প্রশ্নটা করে বসলেন।

আমার ভ্রু কুঁচকে গেল। 'মানে?'

সালাম সাহেব হাতের আঙুলের দিকে গভীর মনোযোগে তাকিয়ে ওগুলো কুৎসিত ভঙ্গিতে চাটতে-চাটতে বললেন, 'না মাইনে, আপনি কি খালি কুত্তার ভাষাই বোঝেন? মশা-মাছির ভাষা বোঝেন না? এই যে দেখেন আপনার প্লেটের পাশে একখান মাছি ঘোরাফিরা করতেছে। ও কি কইতে চায় আপনি বুঝতে

ারবেন?'

আমার গা জ্বলে গেল। 'সালাম সাহেব, আমি কি বলেছি আমি কুকুরের ভাষা বুঝতে পারি?'

'কইলেন না আপনার মহল্লার সব কুত্তা রাইতে আপনার ঘরে আসে। গল্পগুজব করে।'

আমি কয়েক মুহূর্ত কিছুই বলতে পারলাম না। মানুষ তিলকে তাল বানায়, এই লোক তো আস্ত তালগাছ বানিয়ে ফেলেছেন। আমি কিছু না বলেই উঠে পড়লাম।

বেসিনে হাত ধুতে-ধুতে ফিরে তাকিয়ে দেখি সালাম সাহেব আমার আরেক কলিগকে হাসি-হাসি মুখে কী যেন বলছেন। বলতে-বলতেই আড়চোখে বারকয়েক তাকালেন আমার দিকে।

ভুল করে ফেলেছি—আবারও ভাবলাম আমি।

অফিস ছুটি হতে-না-হতেই আমি উপলব্ধি করলাম গোটা অফিস আমার 'মস্তিষ্কবিকৃতি'-র খবর জেনে গেছে। কেউ সরাসরি চোখে-চোখে তাকাচ্ছে না। সকালেও যে হেসে কুশল বিনিময় করছিল তার দৃষ্টি সন্ধ্যায় এসে বাঁকা হয়ে গেছে।

আমি প্রবল হতাশা নিয়ে বাড়ির পথ ধরলাম।

পরদিন কলম পিষছি অফিসে বসে। একগাদা ফাইল গন্ধমাদনের মত উঁচু হয়ে রয়েছে আমার সামনে। আজকের মধ্যে এগুলো ক্লিয়ার করতে হবে। আরও দু'জনের কাজ আমার ঘাড়ে চেপেছে। চাপানো হয়েছে বলা যায়।

দাঁত-মুখ খিঁচে কাজ করে যাচ্ছি, এমন সময় বুঝতে পারলাম আমার কার্ডবোর্ড ঘেরা কিউবিকলে কেউ একজন প্রবেশ করেছে। চোখ তুলে তাকাতেই একরাশ বিরক্তি ছেঁকে ধরতে চাইল। সালাম সাহেব হন্তদন্ত হয়ে রুমে ঢুকেছেন। চেহারা গম্ভীর।

'তাহের সাহেব, একখানা উপকার চাই,' ধপাস করে বসে পড়ে বললেন সালাম সাহেব।

আমি ভাল করে লক্ষ্য করলাম তাঁকে। নাহ, রসিকতার চিহ্ন নেই চেহারায়। দেখে মনে হচ্ছে কোনও বিপদে পড়েছেন।

'কী উপকার, সালাম সাহেব?' আমি কাজ বন্ধ করে জিজ্ঞেস করলাম।

'আমার ছোট মাইয়াটা কাইল থেইকা খায় না। আপনেই পারবেন ওরে ঠিক করতে।'

'আমি? কীভাবে?' রীতিমত বিস্ময় বোধ করছি।

'ওর একটা বিলাই আছে। সেইটা কী কারণে জানি কাইল থেইকা খাওয়া বন্ধ কইরা দিছে। আপনে ইকটু বিলাইডার সাথে আলাপ কইরা দেখবেন কী সমস্যা?'

আমার চোখে পানি চলে এল। আমি জানি না কুকুরগুলো কেন আমার আশপাশে ঘোরাফেরা করছে। কিংবা হতে পারে এটা আমারই কোনও মানসিক সমস্যা। কিন্তু মানুষের দুর্বলতা নিয়ে এ কেমন নিষ্ঠুর রসিকতা?

আমি মাথা নিচু করে ফেললাম দুঃখে। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই আবার ঝট করে মুখ তুলতে হলো। সালাম সাহেব ভয়ার্ত দৃষ্টিতে আমার পেছন দিকে তাকিয়ে আছেন। ওদিকে ফাইল ক্যাবিনেট। কী এমন সাক্ষাৎ যমদূত ওখানে সেঁধিয়েছে যে এমন গোল্লা চোখে তাকাতে হবে? দুঃখের উপর বিরক্তি চাপল। আমি কিছু বলতে যাব তার আগেই সালাম সাহেব ফিসফিস করে বললেন, 'কুত্তা!'

ইলেক্ট্রিক শক খেলাম যেন। প্রায় লাফিয়ে উঠে পেছনে ঘুরে তাকালাম। আরেকটু হলেই চেয়ারটা উল্টে যেত।

পেছনে কিছুই নেই। অসংখ্য ধুলো জমা ফাইল নির্বাক বিদ্রূপ করছে আমাকে। তার চাইতেও রূঢ় রসিকতার হাসি ভেসে এল পেছন থেকে।

সালাম সাহেব খ্যাক-খ্যাক করে হাসতে-হাসতে বেরিয়ে গেলেন রুম ছেড়ে।

চার

আজকাল এমনটাই ঘটছে।

প্রতিদিন রাতের একটা নির্দিষ্ট সময়ে আমার ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। কোনও কারণ ছাড়াই। নির্দিষ্ট সময়ে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে, এই ব্যাপারটা আমি আন্দাজ করেছি। প্রতিবার ভাবি আজ ঘড়ি দেখব। কিন্তু ঘড়ি দেখার আগেই আমি আবার

সম্মোহিতের মত ঘুমিয়ে পড়ছি। যেন পুরো ব্যাপারটার নিয়ন্ত্রণ রয়েছে অদৃশ্য কোনও শক্তির হাতে। আমাকে কিছু একটা দেখাতে চাইছে অপার্থিব জগতের দৃশ্য। নির্দিষ্ট সময়ে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলছে, কিন্তু কোনও কারণে দৃশ্যটা না দেখিয়েই আবার ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে।

প্রথম সে-রাতের পর আর কিছু দেখিনি আমি। মাঝে চারদিন পেরিয়ে গেছে। মতিন এখনও দেশ থেকে আসেনি। বাড়িতে কী এক ঝামেলা হয়েছে। আসতে-আসতে আরও কয়েক দিন। এ ক'দিনে আর কেউ কুকুর দেখতে পায়নি আমার আশপাশে। আমি নিজেও না। কিন্তু যা সর্বনাশ হওয়ার হয়ে গেছে। পুরো অফিসে রটে গেছে আমার কুকুর দর্শনের খবর। নির্লজ্জ রসিকতা চলছে আমাকে নিয়ে। নেতৃত্বে রয়েছেন সালাম সাহেব। খুব শীঘ্রিই হয় আমাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেয়া হবে, নয়তো আমি নিজেই ছেড়েছুঁড়ে চলে আসব।

কুকুরগুলো যে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে সে ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম। ছিলাম, এখন আর নই। ঘুম ভাঙার পর থেকেই নই। আজ সেই অদৃশ্য শক্তি মনস্থির করে ফেলেছে। আমাকে দেখাবে কিছু একটা। এই মুহূর্তে আমি শুধু তিন জোড়া জ্বলন্ত অঙ্গার দেখতে পাচ্ছি পায়ের কাছের মেঝেতে। হ্যা-হ্যা জাতীয় আওয়াজ আসছে। পরক্ষণেই বদলে যাচ্ছে চাপা গুড়গুড় শব্দে।

আমি শব্দের উৎসের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে উঠে বসলাম সন্তর্পণে। সেদিনের পর থেকে শিথানের কাছে একটা লাঠি রাখা হয়। আন্দাজে হাতড়ে সেটার নাগাল পেতে চাইছি। জ্বলন্ত তিন জোড়া চোখ যেন নীরব বিদ্রূপে আমার ছেলেমানুষি দেখে যাচ্ছে।

লাঠিটা পেয়ে গেলাম আমি। শক্ত মুঠোয় চেপে ধরলাম। মনোবল জাগাল কাঠের দণ্ডটা। আমি এখন তৈরি। আয়, কুত্তার বাচ্চারা!

আমার নিভৃত আবাহন শুনতে পেয়েই কি না, লাফ দিল তিন শ্বাপদ। একযোগে। শূন্যে ভেসে ধেয়ে আসছে।

আমি নির্ভীক বসে রইলাম। টানানো মশারিতে ওরা বাধা পাবে, জানি আমি। কিন্তু একটা কথা জানা ছিল না আমার, রাতের এ সময়টা বড়ই অদ্ভুত। এমন অনেক কিছুই এ সময় ঘটে যায়, যাকে কোনও ব্যাখ্যার ছাঁচে ফেলা যায় না। যেমন এই এখন। তিনটে শ্বাপদের ভীষণ জ্বলতে থাকা ছয়টা চোখ উন্মাদ ট্রাকের হেডলাইটের মত মশারি ভেদ করে গেল। ভয় কিংবা অবিশ্বাসের অনুভূতি জাগ্রত হবার আগেই আমার দেহ সক্রিয় হয়ে পড়ল। বিদ্যুৎ বেগে এলোপাথাড়ি লাঠি চালালাম। কারও-না-কারও গায়ে লেগেই যাবে। কিন্তু আমি আবার ভুলে গিয়েছিলাম মধ্যরাতের পাগলা আইনের ধারাগুলো। বাতাস কেটে সাঁই করে বেরিয়ে গেল লাঠিটা। এরা নিছকই শ্বাপদ নয়, ছায়াশ্বাপদ।

ছায়াশ্বাপদের কায়া না থাকলেও নখরের ধার ঠিকই টের পেলাম। প্রথম সুযোগেই আমার গালে আঁচড়ে দিয়েছে এক শয়তান। বিচ্ছিরি গভীর ক্ষতটা থেকে দরদর করে রক্ত ঝরছে। বাঁ পাশের গাল পেরিয়ে কানের খাঁজে গিয়ে জমা হচ্ছে গরম রক্ত। কুকুরটা পচা গন্ধ মাখা জিভ বের করে সে রক্ত ছুঁতে চাইছে। আরেকটা তীক্ষ্ণ নখরের লক্ষ্য আমার ভয়ার্ত চোখ। আমি প্রাণপণে যুঝে চলেছি। আরেকটা কুকুর আমার গোড়ালি কামড়ে ধরেছে। প্রবলবেগে মাথা ঝাঁকিয়ে ছিঁড়ে নিতে চাইছে পোয়াটাক মাংস।

চোখ বাঁচাতে এতটাই ব্যস্ত ছিলাম যে, তিন নাম্বারটা কখন চড়ে বসেছে আমার বুকে–খেয়ালই ছিল না। ইতোমধ্যেই পাতলা গেঞ্জিটা ছিঁড়ে ফেলেছে। এবার ছিঁড়তে চাইছে আমার উন্মুক্ত বুক।

আমি আর পারছি না। তিন দানব সারমেয়র সঙ্গে লড়াই করবার মত দৈহিক ও মানসিক–কোনও শক্তিই আমার নেই। শুধু ওদের নখের স্পর্শ পাচ্ছি আমার দেহে। আমি ছুঁতে গেলেই বাতাসে খামচি পড়ছে। আর পাচ্ছি পচা সেই নাড়ি উল্টানো গন্ধটা। মাত্র ইঞ্চি কয়েকের ব্যবধানে। এই গন্ধটাই আমার সমস্ত জীবনী শক্তি টেনে নিল। আমি হাল ছেড়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললাম। সেই মুহূর্তেই চোখের পাতা ভেদ করে একটা তীক্ষ্ণ নখ ঢুকে গেল। সমস্ত দুনিয়া আঁধার হয়ে গেল।

অতলে তলিয়ে যাবার আগ মুহূর্তের উপলব্ধি–বুক চিরে হৃৎপিণ্ডে পৌঁছে যাচ্ছে নখরযুক্ত-হিংস্র এক থাবা...

পরিশিষ্ট

সালাম সাহেবের মন-মেজাজ খুব একটা ভাল নেই। আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে তিনি ভয় পাচ্ছেন। তিন দিন আগে তাঁর অফিসের কলিগ আবু তাহেরের লাশ দেখে আসার পর এই অবস্থা। পুরো অফিসটাই থমথমে হয়ে আছে। তিনি অবশ্য লাশ দেখার পর সেই যে ঘরে সেঁধিয়েছেন, আর অফিসে যাবার মত মানসিক জোর অর্জন করে উঠতে পারেননি।

আবু তাহেরকে বীভৎসভাবে খুন করেছে কেউ। চোখ খুবলে নিয়েছে। হৃৎপিণ্ডের কোনও হদিস পাওয়া যায়নি। গায়ের আঁচড়ের চিহ্ন দেখে কারও মনেই আততায়ীর পরিচয় নিয়ে দ্বিধা ছিল না।

সালাম সাহেব আবু তাহেরকে নিয়ে মস্করা করায় এখন যতটা না লজ্জিত, তার চাইতেও অনেক বেশি ভীত। তবুও তিনি ঠিক করেছেন আজ বাইরে গিয়ে খানিক হাঁটাহাঁটি করে আসবেন। ভয়টা কাটানো দরকার। ঘরে বসে থাকলে আরও বেশি করে জেঁকে বসবে।

সালাম সাহেব গায়ে পাঞ্জাবী চড়িয়ে বের হলেন। মোড়ের চায়ের দোকান থেকে চা খাবেন। বাসার কিছু টুকটাক বাজার করার কথাও কাল থেকে বলছে স্ত্রী আয়েশা বেগম।

সালাম সাহেব বাসা থেকে বেরিয়ে এদিক-ওদিক চাইলেন। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আলো-আঁধারির মাঝে কোনও কুকুর-টুকুর নজরে এল না তাঁর। পা চালালেন বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের দিকে। কয়েক পা এগিয়েছেন, ঠিক তখনই কে যেন ডেকে উঠল পেছন থেকে।

'সালাম ভাই!'

থমকে দাঁড়িয়ে ঘুরে তাকালেন সালাম সাহেব। পেছন থেকে হন্তদন্ত হয়ে হেঁটে আসছেন প্রতিবেশী নজরুল সাহেব। দেখে মনে হতে পারে ভদ্রলোক রাজ্য ওল্টানোর খবর নিয়ে আসছেন। কিন্তু সালাম সাহেব জানেন ভদ্রলোক ডায়বেটিসের রোগী। প্রতি সন্ধ্যায় এভাবেই পাড়া কাঁপিয়ে হেঁটে বেড়ান।

'কী বিষয়, নজরুল ভাই?'

'ভাই, একটা জিনিস চাইতাম আপনার কাছে।'

'কী জিনিস?'

'আমাকে একটা কুকুর দিতে হবে।'

'কুত্তা!' সালাম সাহেবের বুক ঢিবঢিব করতে লাগল।

'জী, আপনি তো অনেকগুলো কুকুর পালছেন ইদানীং। আপনার বাসার সামনে দেখি। আমাকে একটা দিয়ে দেন। যা দিনকাল এল! কুকুরের উপরে কোনও দারোয়ান নাই!

সালাম সাহেবের হাঁটু জোড়া থেকে তাকে দাঁড় করিয়ে রাখবার শক্তি চলে গিয়েছে। কুলকুল করে ঘামছেন তিনি। অনেক কষ্টে নিজেকে খাড়া রাখলেন।

'ওই তো, এখনও আপনার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে।' হাত তুললেন নজরুল সাহেব।

সালাম সাহেব তাকালেন নজরুল সাহেবের ইশারা লক্ষ্য করে।

একটু আগেও ছিল না, এখন ভোজবাজির মত আবির্ভূত হয়েছে কুকুরগুলো। অন্ধকারে দেহের আকৃতি স্পষ্ট নয়। স্পষ্ট শুধু চোখগুলো। জ্বলছে গনগনে ভাঁটার উত্তাপ নিয়ে।

সালাম সাহেব গুনলেন, এক, দুই, তিন, চার...চারটা কুকুর! ■

উত্তরা বুকস্ অ্যাণ্ড স্টেশনারি

জি. ই. এফ. ১২, রাজলক্ষ্মী কমপ্লেক্স (নিচ তলা)

উত্তরা, ঢাকা ১২৩০।

এখানে সেবা প্রকাশনী ও প্রজাপতি প্রকাশনের নতুন ও সমস্ত রিপ্রিন্ট বই পাওয়া যায়।

মোবাইল: ০১৯৩৯-৩৪১৭০৪, ০১৯৮৫-০২৮৫৩৩

শব্দ-ফাঁদ ১২৭

রবীন্দ্র

১	২	৩		৪		৫	৬
৭			■		■	৮	
৯	■	■	১০		১১		
১২	১৩	■	১৪			■	
১৫		১৬		■	১৭	১৮	■
১৯				২০	■	২১	২২
	■	২৩			২৪	■	
২৫		■	২৬				

সমাধানের সূত্রাবলী

পাশাপাশি

১. সাম্যবাদ।
৭. দেয়, দান করা হয় এমন।
৮. মালা, পরাজয়।
৯. বিখ্যাত পানীয়।
১০. ভ্রমণ বৃত্তান্ত।
১২. আওয়াজ, প্রভু।
১৪. মাটির তৈরি ক্ষুদ্র সরা।
১৫. বিবাহের পাত্র-পাত্রী, স্বামী-স্ত্রী।
১৭. কামরা, বগল, কোমর।
১৯. হিজরত ভিত্তিক চান্দ্রবৎসর।
২১. $(২^২–১^২)$
২৩. আমার বাড়ি বা বাসস্থান।
২৫. বৃক্ষ, গাছ।
২৬. সুদৃষ্টি, কৃপাদৃষ্টি।

উপর-নিচ

১. সদাচার নীতির বাইরে।
২. জিত, মুগ্ধ, ঝোলাগুড়।
৩. জলযান চলার যোগ্য, নৃতনত্ব।
৪. নিম গাছ, নিম ফল।
৫. ছলছুতা, আবদার।
৬. মাসিক বেতন।
১০. সমকক্ষ ব্যক্তি বা পক্ষদ্বয়ের মধ্যে।
১১. রসজ্ঞ, রসিকতাপটু।
১৩. পানখেত।
১৬. দয়ালু, করুণাময়।
১৮. লোকসান, অনিষ্ট।
২০. ডাঁটা, দীর্ঘ শূন্যগর্ভ অস্থি।
২২. চাকর, সেবক, দাস।
২৪. উল্টে–'নয়'।

সমাধান পাঠাবার ঠিকানা: শব্দ-ফাঁদ ১২৭, রহস্যপত্রিকা, ২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০। যাঁদের সমাধান নির্ভুল বিবেচিত হবে, তাঁদের ভিতর থেকে লটারির মাধ্যমে তিনজনকে নির্বাচন করে পুরস্কার হিসেবে তাঁদের প্রত্যেকের ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠিয়ে দেয়া হবে পরবর্তী তিন সংখ্যা রহস্যপত্রিকা। সমাধান আমাদের দপ্তরে এসে পৌঁছুবার সর্বশেষ তারিখ: ১৮ এপ্রিল, ২০১৭।

সমাধান
শব্দ-ফাঁদ ১২৬

এ	স	পা	র	ও	স	পা	র
ক	ব	র	■	কা	■	ট	ং
হ	ল	■	সু	ল	তা	নি/শী	■
স্ত	■	চা	র	ত	লা	■	ঝা
প	দ	ক	■	না	■	কা	ল
রি	ং	■	কা	মা	ন	ল	■
মি	শ	না	নি/শী	■	জ	না	ব
ত	ন	য়	■	স	র	গ	ম

শব্দ-ফাঁদ ১২৬-এ যাঁরা পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন:

১। **সামসুর রহমান**
দেওভোগ, নারায়ণগঞ্জ।

২। **আকলিমা বেগম**
সৈয়দপুর, নীলফামারী।

৩। **রাসেদ খান**
কলাবাগান, ঢাকা।

হায়, লোভ!

মনি অধিকারী

ডাক্তার সাহেব ভর্ৎসনা করলেন, 'রোগীর এ অবস্থায় সঙ্গে আবার মিষ্টি নিয়ে এসেছেন কেন?'

ভারতের বিভিন্ন স্থান ঘুরে গতকাল কলকাতা পৌঁছেছি, দু'এক দিনের মধ্যেই দেশে ফিরব। আজকে এসেছি শেওড়াকুলি। যাওয়ার আগে মাসিমার সঙ্গে দেখা করে যাওয়া আর কী। তা ছাড়া, মাধুরী এবং অশোকও এসেছে। তাদের সঙ্গেও দেখা হবে। আর জয়ন্তী, সে তো এত দিন আমার সঙ্গেই ছিল। মাসিমার একমাত্র ছেলে কমলেশ ছিল আমার বাল্যবন্ধু। কয়েক বছর আগে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। মাধুরী তারই বোন। যৌতুকের অভিশাপে মাধুরী-অশোকের বিয়ে প্রায় ভেঙেই যাচ্ছিল, আমিই কোনওভাবে জোড়া লাগিয়ে দিয়েছি। সেই থেকে মাধুরী-অশোক দু'জনেই আমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে। আর কমলেশের বিধবা স্ত্রী জয়ন্তী রায় তো আমার ভ্রমণসঙ্গিনী। বছরে একবার করে হলেও জয়ন্তীকে সঙ্গে নিয়ে ভারতের কোথাও না কোথাও বেড়াতে বের হই। এবার আমরা ঘুরেছি মধ্য প্রদেশের বিভিন্ন জায়গায়।

বাড়িতে বিরাট আয়োজন, মাধুরী-অশোক অনেক খাদ্যসামগ্রী এবং মিষ্টি এনেছে। মাধুরী আমাকে ভাইফোঁটা দেবে। এর আগেও সে আমাকে ভাইফোঁটা দিয়েছে। এবারের আয়োজনটা আরও ব্যাপক। ভাইফোঁটা দেয়া ছাড়াও আছে তাদের একমাত্র ছেলের অন্নপ্রাশন।

আমরা সবাই খেতে বসেছি। সব শেষে মিষ্টি খাচ্ছি। মাসিমা বললেন, 'নাহ্, এসব মিষ্টি খেয়ে কোনও তৃপ্তি পাইনে। মিষ্টি ছিল সুধীরদার তৈরি মিষ্টি। কত কাল আগে ওদেশ ছেড়ে চলে এসেছি। কিন্তু সুধীরদার মিষ্টির কথা এখনও ভুলতে পারিনে। আচ্ছা, সুধীরদার মিষ্টির দোকানটা কি এখনও আছে?'

'মিষ্টির দোকান ঠিকই আছে, দোকান চালাচ্ছে সুধীর কাকার ছেলে মাখন। কাকা তো অনেক আগেই মারা গেছেন।'

'সামনের বছর আসার সময় কিছু মিষ্টি নিয়ে এসো ওদের দোকান থেকে। কখন মরে যাব, শেষবারের মত একটু মিষ্টি খেয়ে মরি।

মিষ্টি আনলে দেখবে ওখানকার মিষ্টি আর এখানকার মিষ্টির মধ্যে পার্থক্য কতটা। আহা, মিষ্টি দেখলেই যেন মনটা ভরে যায়। এমন কী ওদের তৈরি মাঠাটাই (ঘোল) না খেতে কত ভাল লাগত!'

জয়ন্তী-মাধুরী দু'জনেই মাসির কথা শুনে হাসছে আর বলছে: 'হায়, মা, ওদেশের সবই ভাল আর এখানকার সবই খারাপ? এই যে মনিদা যেহেতু বাংলাদেশ থেকে এসেছে, তাই কত ভাল, না, মা?'

মাসিমা রেগে গেলেন। 'ঠাট্টা করছিস? মনি, মিষ্টি এনে আগে ওদের খাওয়াও, তারপর ওরাই বলবে কোন্‌টা ভাল আর কোন্‌টা খারাপ!'

মাসিমার জন্য কখনও-কখনও কিছু-কিছু জিনিস, যেমন–ডাল, মাছ, আচার, খেজুরের গুড় দেশ থেকে নিতে হয়।

এবারের ফেব্রুয়ারি মাস।

আজকে কলকাতা যাচ্ছি। সঙ্গে যাচ্ছে তিন কেজি খেজুরের গুড়ের সন্দেশ। তিন কেজি অন্য মিষ্টি আর এক ভাঁড় দই। এসব কিছু দেশ থেকে আনা হয়েছে। এ ছাড়াও, আমার একটা ঢাউস ব্যাগ আছে। এক মাস ব্যবহারের মত কাপড়চোপড় ছাড়াও ব্যাগে আছে জয়ন্তীর জন্য এক ডজন স্যাণ্ডেলিনা সাবান, কয়েকটি শাড়ি আর কিছু পারফিউম।

অধিকাংশ সময়ই আমি প্লেনে যাতায়াত করি। এবার যাচ্ছি মৈত্রী ট্রেনে। অনেকেই বলেছে ট্রেনের জার্নি নাকি আরামদায়ক। যদিও সময় একটু বেশি লাগে।

আমার কম্পার্টমেন্টে আমি ছাড়া আর আছে একটা পরিবার। তারা স্বামী-স্ত্রী আর তাদের কলেজ পড়ুয়া ছেলে বাবুল। ওঁরা এসেছেন ভালুকা থেকে। মি. মতিন গুরুতর অসুস্থ বলে তাঁর চিকিৎসার জন্যই ভেলোরে যাচ্ছেন। ভদ্রলোকের হার্টের সমস্যা। তা ছাড়া, আছে ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপ। মালপত্র রেখে বসতে না বসতেই ট্রেন ছেড়ে দিল।

লম্বা পথ ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েই বর্ডার পর্যন্ত চলে এলাম। মালপত্র নিয়ে নামতে হলো। চেকিং হবে এপাশ-ওপাশ দু'দিকেই। শুধু মিষ্টির প্যাকেটগুলো গাড়িতে রেখে আর সবকিছু নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়েছি।

লম্বা লাইন।

আমার সঙ্গেই আছেন ভদ্রমহিলা এবং তাঁর ছেলে। তাঁরাও লটবহর নিয়ে লাইনে আছেন চেকিঙের জন্য। মি. মতিন গাড়িতেই আছেন তিনি স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারেন না। প্রয়োজন হলে হুইল চেয়ারে করে তাঁকে নামাতে হবে।

দাঁড়িয়ে আছি তো আছিই।

অফিসাররা ধীরস্থিরভাবে চেকিঙের কাজ করে যাচ্ছেন। দালাল ঘুরছে: টাকা দেন, পাঁচ মিনিটেই চেকিং শেষ করে দিই।

মালসামান সব তন্নতন্ন করে দেখছে। সন্দেহ হলে জামাকাপড়, জুতো খোলাচ্ছে। হাত দিয়ে মেশিন দিয়ে শরীরের বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করছে। এই বিরক্তিকর কাজ শেষ করে যখন কম্পার্টমেন্টে ফিরলাম, তখন তিন ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। আরও প্রায় এক ঘণ্টা পর গাড়ি ছাড়ল। মালসামান রেখে শুয়ে পড়লাম।

কিছুক্ষণ পর শুনি ঘড়ঘড় আওয়াজ আসছে। ভদ্রলোক আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলে মনে হচ্ছে। ঘড়ঘড় আওয়াজের সঙ্গে মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছে। ভদ্রমহিলা এবং ছেলে–দু'জনে মিলে চেষ্টা করছেন মতিন সাহেবকে সামাল দিতে, কিন্তু পেরে উঠছেন না।

ঘুম থেকে জেগে গেছি। মা-ছেলের পাশে এসে দাঁড়ালাম। কিন্তু কিছুই করতে পারছি না। সঙ্গে প্রেশার মাপার যন্ত্র ছিল, মিসেস মতিন প্রেশার চেক করে দেখেন, রক্তের চাপ অনেক বেড়ে গেছে। সঙ্গে নিয়ে আসা কিছু ওষুধ খাওয়ানো হলো, কিন্তু তেমন কোনও কাজ হলো না।

মিসেস মতিন আমাকে বললেন, 'ভাইয়া, যদি কিছু মনে না করেন, তো একজন ডাক্তার পাওয়া যায় কি না একটু খোঁজ করে দেখবেন?'

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে ট্রেন। সেই একেবারে শিয়ালদহ গিয়ে থামবে। কম্পার্টমেন্ট থেকে কম্পার্টমেন্ট খুঁজতে থাকলাম। অনেক খুঁজে একজন ডাক্তার পাওয়া গেল। তাকে বলতেই তিনি ছুটে এলেন। সঙ্গে ডায়াবেটিস এবং রক্ত

মাপার যন্ত্র ছিল।

তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন ডায়াবেটিস অত্যধিক বেড়ে বিপদসীমা ছাড়িয়ে গেছে। রক্তচাপও অনেক উঁচুতে। তিনি মিসেস মতিনের সঙ্গে কথা বলে জানলেন, মতিন সাহেবের ডায়াবেটিস এবং রক্তচাপ দুটোই আছে, তবে এতটা নয়।

তা হলে হঠাৎ এতটা বেড়ে গেল কেন?

তিনি কি এমন কিছু খেয়েছেন, যেটা বাড়িয়ে দিল তাঁর রোগ?

ভদ্রমহিলা কিছু বলতে পারলেন না। তিনি তো ছেলেসহ বাইরে চেকিঙের জন্য তিন ঘণ্টা কাটিয়ে এসেছেন। তখন রোগী তো এখানে একাকীই ছিল।

আমার সন্দেহ হলো। জানি মিষ্টি খেলে ডায়াবেটিস বাড়ে। আমি মিষ্টির প্যাকেটের দিকে হাত বাড়ালাম। দেখি গুড়ের সন্দেশের প্যাকেট প্রায় অর্ধেকটা খালি! দইয়ের হাঁড়িরও অনেকখানি ফাঁকা!

ডাক্তার সাহেবকে জানালাম, 'মতিন সাহেব আমাদের অনুপস্থিতিতে প্রচুর মিষ্টি খেয়ে নিয়েছেন।'

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'আমি এমনই কিছু ভাবছিলাম। মিষ্টি দেখে লোভ সামলাতে পারেননি। বাধা দেয়ার কেউ ছিল না, তাই ইচ্ছেমত মিষ্টি খেয়েছেন।' ডাক্তার সাহেব ভর্ৎসনা করলেন, 'রোগীর এ অবস্থায় সঙ্গে আবার মিষ্টি নিয়ে এসেছেন কেন?'

কী জবাব দেব আমি, যেন বোকা বনে গেলাম।

ছেলেকে দেখলাম রাগত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু এখানে আমার অপরাধটা কোথায়? মিষ্টির উপরে যে ভদ্রলোকের সর্বনাশা লোভ, সেটা আমি কী করে জানব?

ডাক্তার সাহেব কিছু ওষুধ দিলেন এবং বললেন, 'অতি সত্বর তাঁকে হসপিটালে নিয়ে যান, নতুবা কিন্তু বিপদ হতে পারে।'

কিন্তু কীভাবে তাকে হাসপাতালে নেব?

ট্রেন তো কোথাও থামছে না!

রাত দশটায় ট্রেন শিয়ালদহ স্টেশনে ঢুকল। আমরা তাড়াতাড়ি নেমে গাড়ি নিয়ে হাসপাতালে ছুটলাম।

পিয়ারলেস হাসপাতাল বিরাট। ওখানে ইমার্জেন্সিতে ভর্তি করা হলো মতিন সাহেবকে। সারারাত্রি যমে আর মানুষের টানাটানি চলল।

সকালে ডাক্তার বললেন, 'রোগীর জ্ঞান ফিরছে। তবে অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। হার্টের অবস্থা খুবই খারাপ। এখনই অপারেশন করতে হবে। কিন্তু ডায়াবেটিস যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, তাতে অপারেশন করার মত অবস্থা নেই। আপনারা রোগীকে বরং ভেলোরে নিয়ে যান।'

কিন্তু নিয়ে যান বললেই তো আর নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না। রোগীর যে অবস্থা, তাতে হঠাৎ করে মুভ করালে বিপদও হতে পারে। তবুও চেষ্টা করতে হবে। মিসেস মতিন বারবার আমাকে বলছেন: 'ভাইয়া, আপনি আমাদের সঙ্গে ভেলোরে চলেন। আপনি তো বেড়াতে এসেছেন। না হয় এবার ওদিকেই বেড়াবেন।'

নিজেকে কিছুটা অপরাধী মনে হচ্ছে। আমার মিষ্টি খেয়েই তো ভদ্রলোকের এই বেহাল অবস্থা। মিষ্টি না খেলে হয়তো এ পর্যায়ে পৌঁছাত না। যদিও তাঁর সীমাহীন লোভই তাঁকে মৃত্যুর দুয়ারে নিয়ে গেছে। বেশ চিন্তায় পড়লাম। আমি তো একা নই, সঙ্গে আছে জয়ন্তী রায়। এক বছর সে অপেক্ষা করে আছে কখন আমি আসছি। মিসেস মতিনকে বললাম, 'আমি একটু ভেবে দেখি।'

এদের যে অবস্থা তাতে মানবিক কারণে হলেও আমার সাহায্য করা উচিত।

রাতে শেওড়াকুলি পৌঁছলাম। জয়ন্তীকে সব বললাম: 'চলো, ওদের সঙ্গে আমরা ভেলোরে যাই।'

'সেটা কী করে হবে? আমরা তো এবার যাব কেরালা!'

তবুও আমার পীড়াপীড়িতে রাজি হলো সে। মাদ্রাজ থেকে কেরালা বরং কাছেই হবে। দু'দিন পরেই আমরা মাদ্রাজ হয়ে ভেলোরে পৌঁছে গেলাম। ডাক্তার একই কথা বললেন: হার্টের অবস্থা খুবই খারাপ। এখনই অপারেশন

করা দরকার। তবে ডায়াবেটিস এতটা বেড়ে গেছে যে অপেক্ষা করা ছাড়া কোনও পথ নেই। ওষুধ দিয়ে ডায়াবেটিস স্বাভাবিক পর্যায়ে আনতে হবে।

মতিন পরিবারের সঙ্গে আরও দু'দিন ভেলোরে থেকে আমরা আমাদের পথে যাত্রা করলাম। আমার এবং জয়ন্তীর দু'জনেরই মোবাইল নম্বর দিয়ে বললাম, 'কোনও অসুবিধা হলেই জানাবেন। আমরা চলে আসব।'

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় আমরা আমাদের চলার পথে পরিচিত লোকজনকে বিশেষ করে মহিলাদেরকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করি। কারণ তাদের মধ্যে অন্যের ভিতরের খবর জানার আগ্রহ এত বেশি, অধিকাংশ সময়টা তারা ব্যয় করে আমাদেরকে জানতে। অদম্য কৌতূহল নিয়ে আমরা কী করছি, কী বলছি, কোথায় কীভাবে থাকছি এসব নিয়েই তারা ব্যস্ত থাকে। অনেক সময় এমন সব অবান্তর কথা বলে, যাতে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। আমার আর জয়ন্তীর বন্ধুত্বের মধ্যে একটা সীমারেখা বেঁধে দেয়া আছে। খুব সূক্ষ্ম একটা গণ্ডি। আমরা কেউই সেই গণ্ডির বাইরে এক পা ফেলতেও রাজি নই।

মাদ্রাজ সেন্ট্রাল স্টেশন থেকে ত্রিবান্দ্রম এক্সপ্রেসে উঠলাম। আমাদের কেরালা পর্বের যাত্রা শুরু হলো এখান থেকেই।

সারারাত ধরে চলল গাড়ি। পরদিন ভোরবেলা চোখ মেলতেই সারি-সারি নারকেল গাছ দেখলাম। সংখ্যায় কত হবে? লক্ষ? কোটি?!

রেলগাড়ির সঙ্গে-সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নারকেল গাছগুলোও ছুটছে। মাঝে-মাঝে দেখা যাচ্ছে আচমকা জলরাশি। ভিতরে ঢুকে খাঁড়ি তৈরি করেছে সমুদ্রের পানি। ভারতের দক্ষিণে আরব সাগরের কূল ঘেঁষে কেরালা সরল-সবুজ সৌন্দর্যে ভরা দেশ।

তীর্থ যাত্রীদের কাছেও কেরালা পুণ্যস্থান। মসজিদ, মন্দির, গির্জা রয়েছে সর্বত্র। প্রচুর নারকেল, রাবার, চা, কাজু বাদাম, গোল মরিচ এখানে উৎপন্ন হয় এবং বিদেশে রপ্তানি হয়।

ত্রিবান্দ্রম থেকে তেরো কিলোমিটার দূরে বিশ্বখ্যাত কোভালম বিচ। বাসে আধঘণ্টার পথ। বাস থেকে নেমে সারি-সারি নারকেল গাছের মধ্য দিয়ে পাকা রাস্তা ধরে পনেরো মিনিটের হাঁটাপথে এ সমুদ্রতীর। সমুদ্র এখানে মোটামুটি শান্ত। মনোরম বেলাভূমি সোনালি বালুতে ঢাকা। ঝিরঝির হাওয়ার মাঝে সুনীল জলরাশি, নারীপুরুষের সমুদ্রস্নান-রৌদ্রস্নান চলছে পাশাপাশি। সাদা-কালো সব ধরনের মেয়ে-পুরুষ সমুদ্রের পানিতে উথালপাতাল করছে। বেলাভূমিতে রঙবেরঙের অজস্র ঝিনুক। আরব সাগর এখানে ধনুকের মত বেঁকে গেছে।

কোভালম বিচে কয়েক দিন কাটালাম। প্রাণভরে দেখলাম সমুদ্র, বেলাভূমিতে হেঁটে বেড়ালাম। বেলাভূমির ওপারে টিলা বেষ্টিত পাহাড়ি পরিবেশ। সবুজে ছাওয়া চোখ জুড়ানো নারকেল বীথি আর কলাগাছের সারি।

এরপর আমরা ঠিক করলাম দেখতে যাব ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি পেরিয়ার অভয়ারণ্য।

ওই জায়গাটা কেরালার ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের অধীনে। সারা দিনের যাঁত্রাপথ।

ঘুরে-ঘুরে পাহাড়ি পথে চলল ট্যাক্সি।

অল্প কিছু খেয়ে গাড়িতে উঠেছি। পেটপুরে খেলে পাহাড়ি পথে অসুবিধা হতে পারে। আবার স্টমাক খালি থাকলেও বিপদ। প্রথম দিকে কিছুটা সমতল ভূমি থাকলেও এখন গাড়ি ছুটছে ওপরে।

পথ সুন্দর, মসৃণ। দু'দিকের সবুজ নিবিড় পাহাড়গুলো মনে হচ্ছে আমাদের সঙ্গে-সঙ্গেই ছুটছে। মাঝে-মাঝে চা-কফি আর রাবারের বাগিচা, পাহাড়ের গায়ে-গায়ে সুতোর মত অজস্র ঝরনা। পথের পাশে মাঝে-মাঝে চা-কফির দোকান।

গাড়ি ক্রমশ উঁচুতে উঠতে থাকল। আমরাও কথাবার্তা বন্ধ করে উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়ে থাকলাম। ড্রাইভারও গম্ভীর। পাহাড়ি পথে ড্রাইভারদের কিছু জিজ্ঞেস করলে গাম্ভীর্যভরা উত্তর আসে।

রাস্তায় চলতে-চলতে দেখতে পাচ্ছি দূরে-দূরে একটা করে গির্জা। প্রতিটি গির্জার ভিন্ন-ভিন্ন

গড়ন। মাঝে-মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে, আবার রোদও হচ্ছে। তবে যত বেলা গড়িয়ে আসছে বৃষ্টির বেগও বাড়ছে। পাহাড়ি পথে মেঘের গর্জন, অঝোরে বৃষ্টি, হৃৎস্পন্দন অনেকখানি বাড়িয়ে দিল।

অনেক পথ পাড়ি দিয়ে এসে দু'একটা বাড়ি দেখতে পাচ্ছি। তার সঙ্গে আলো। মনে হচ্ছে, আমরা এসে পড়েছি।

ত্রিবান্দ্রম থেকে হোটেল বুক করে রেখেছি। ঘরে ঢুকে খুশি হলাম। শোবার খাটে পরিষ্কার ধবধবে বিছানা। ঘরে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র। বড়-বড় জানালা। দামি পর্দা ঝোলানো। চারদিকে গাছপালা। বৃষ্টির পরই ডানাভেজা পাখিদের কলকাকলিতে বনভূমি মুখরিত। নানারকম পাখি, যেমন–বুলবুলি, ঘুঘু, ময়না, মৌটুসি, তিতিরদের ডাকাডাকি ছোটাছুটি চলছে। ঝাঁকে-ঝাঁকে টিয়া আসছে ট্যা-ট্যা শব্দ করতে করতে। চারদিকে ঘন অরণ্যজুড়ে গাছের পাতায়-পাতায় রঙের বর্ণালি মোহময় করে তোলে মনকে।

রাতে এক ঘুম দিয়ে চেতনা ফিরল পাখির ডাকে। সকাল আটটার আগেই বেরিয়ে পড়লাম।

সামনেই পেরিয়ার লেক। লঞ্চ ছাড়ার ঘাট।

টিকেট কেটে উঠে পড়লাম স্টিম লঞ্চে। একটু পর চলতে শুরু করল ওটা। লঞ্চটা মোটামুটি বড়। ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে চারদিক দেখছি। দু'দিকে ঘন কালচে সবুজ পাহাড়। মাঝখান দিয়ে জলের রুপোলি রাস্তা। জল কেটে-কেটে লঞ্চ এগিয়ে যাচ্ছে। চোখে পড়ল অসংখ্য শুকনো পাতাহীন গাছ। জলের মধ্যে হাত-পা ছেড়ে মাথা উঁচু করে বিচিত্র ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। সবই শুকনো কাঠ। একটাতেও পাতা নেই। এর উপর কাঠঠোকরা, মাছরাঙা, চিল, পানকৌড়ি, পাহাড়ি ময়না, ধনেশ পাখিরা বসে আছে। মনে হয় বিশ্রাম নিচ্ছে। পাইলট লঞ্চ থামিয়ে আঙুল দিয়ে দেখালেন বিরাট-বিরাট গোটা দশেক বাইসন লেকের ধারে লম্বা-লম্বা ঘাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। লাল-লাল চোখ, গম্ভীর মুখ। কিছু দূরে একদল হরিণ। কারও গায়ে গোল-গোল দাগ, আবার কোনওটার ডালপালাওয়ালা বাঁকানো শিং। লেকের ধারে এসে কান নাড়তে-নাড়তে পানি খাচ্ছে।

আরও কিছু দূর এগিয়ে পাইলট আঙুল তুলে দেখাল, একদল ভোঁদড় দু'পায়ে ভর করে দুটো ছোট হাত বুকের উপর ঝুলিয়ে রেখেছে। গায়ের লোম সাদাটে, মাছ খাওয়ার জন্য পানির কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছে। লঞ্চ দেখে ঝুপঝাপ করে পানিতে পড়ে পালাতে থাকল।

ফিরে এলাম হাতি বা বাঘ দেখতে না পাওয়ার দুঃখ নিয়ে।

পাইলট বললেন, কাল আসুন, হয়তো দেখতে পাবেন।

পরদিন সকাল বেলা আবার লঞ্চে উঠলাম। লঞ্চ ভর্তি লোক।

কিছু দূর এগোতেই দেখলাম দশ-বারোটা হাতি একেবারে পানির কাছে চলে এসেছে। এসময় নাকি ওরা পানি খেতে আসে। বড় দুটো হাতির পায়ের কাছে দুটো বাচ্চা হাতি। সবাই পেটভরে পানি খেল। একটা হাতি শুঁড় দিয়ে পানি ছিটিয়ে বাচ্চা দুটোকে ভিজিয়ে দিচ্ছে।

পেরিয়ার লেকে কয়েক দিন কাটিয়ে আমরা চললাম কোচিন-এ।

জনপথে কেরালার তোরণদ্বার এই কোচিন।

সমুদ্রবন্দর।

কোচিন হারবার থেকে সাগর জলে ভেসে চলা দেশি-বিদেশি বিশাল-বিশাল জাহাজ দেখলাম। ভাল লাগল শান্ত পানিতে মাছ ধরার দৃশ্য দেখতে।

আমরা পর্যটকদের সঙ্গে মিলে দ্বীপ থেকে দ্বীপে পৌঁছে দর্শনীয় স্থানগুলো দেখতে থাকলাম।

প্রশস্ত সেতু দিয়ে দ্বীপের সঙ্গে দ্বীপের সংযোগ। পর্যটকদের জন্য বোট সার্ভিসও রয়েছে দ্বীপ থেকে দ্বীপে। কোচিন মসলাপাতির জন্য বিখ্যাত। চলতে-চলতে মৌ-মৌ করা মসলাপাতির গন্ধ পাচ্ছি।

তিন দিন হলো কোচিন এসেছি। এর মধ্যেই মিসেস মতিনের মোবাইল পেলাম–এখনি চলে আসেন। মতিন সাহেবের অবস্থা ভাল নয়।

কোচিন বেড়ানো অসমাপ্ত রেখে ফিরছি

১০/৪/১৭ তারিখে প্রকাশিত হচ্ছে

ওয়েস্টার্ন

দুঃস্বপ্ন

প্রান্ত ঘোষ দস্তিদার

বন্দুক সারাতে শহরে এসে গোলাগুলির মুখে পড়ে গেল নেভিল। একাই আতঙ্ক হয়ে উঠল তিন ব্যাঙ্ক ডাকাতের জন্য। ওর গুলিতে মারা পড়ল দুই ডাকাত, আরেকজন পালাল লেজ তুলে। কিন্তু সেখানেই থেমে রইল না ঘটনা। ক'দিন পর দুঃস্বপ্নের মতো হাজির হলো উড়ো চিঠি। বাপ-ভাই হত্যার বদলা নেবার হুমকি দিয়েছে পলাতক ডাকাত। ফিরে আসবে সে, অবশ্যই! দীর্ঘ আটটি বছর অদৃশ্য সেই হুমকি তাড়া করে ফিরল নেভিলকে। ততদিনে সংসারী হয়েছে ও, কাঁধে তুলে নিয়েছে স্থানীয় ব্যাঙ্কের গুরুদায়িত্ব। জীবনে হানা দিয়েছে নতুন সমস্যা। রাতারাতি উদয় হওয়া দুই প্রতারকের খপ্পর থেকে সরল মানুষদেরকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেই হয়ে উঠেছে সবার শত্রু। তারই মাঝে আবার ফিরে এল সেই পলাতক ডাকাত–চিঠির পাতা ছেড়ে, সশরীরে ওর দোরগোড়ায় উদয় হলো দুঃস্বপ্ন। প্রতিশোধ নেবে।

দাম ■ চুরাশি টাকা

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
mail: alochonabibhag@gmail.com
শো-রুম
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ভেলোরে। সময় কমানোর জন্য কোচিন থেকে প্লেনে করে মদ্রাজ পৌঁছলাম। জয়ন্তীর ইচ্ছে ছিল না এত তাড়াতাড়ি কেরালা থেকে ফিরে আসি। জয়ন্তী বলছিল, 'কিছু মনে কোরো না, তোমার মিসেস মতিনকে আমার ভাল লাগেনি। যে তিন-চার দিন আমরা একসঙ্গে ছিলাম, তিনি অহরহ আমাকে চোখে-চোখে রেখেছেন। স্বামী অসুস্থ, তবুও তিনি গোয়েন্দাগিরি ঠিকমত চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি কী করছি, তোমার সঙ্গে কোথায় যাচ্ছি, কী কথা বলছি সব তাঁর জানতে হবে। উপরন্তু যে সব অশালীন মন্তব্য তিনি করেন, কোনও ভদ্রমহিলার মুখে সেটা শোভা পায় না। জানি না এবার আবার কী মন্তব্য করেন। তুমি জানো না, প্রত্যেক বছরই আমার কিছু বান্ধবী বা কলিগ আমাদের সঙ্গে আসতে চায়। তাদের খুব ইচ্ছে তোমার-আমার সঙ্গে তারাও ঘুরবে, বেড়াবে। আমি নানা অজুহাত দেখিয়ে তাদেরকে অ্যাভয়েড করি। জানি, কাউকে যদি একবার সঙ্গে আনি, তা হলে তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব তো শেষ হবেই, হয়তো কলেজও ছাড়তে হতে পারে।'

ফিরলাম আমরা।

মতিন সাহেবের অপারেশন হয়েছে। ডাক্তার, ওষুধপত্র, নার্সিং কোনওটারই ঘাটতি নেই, তবুও রোগীর অবস্থা দিন-দিন খারাপের দিকেই চলেছে। মিসেস মতিন এবং ছেলে, দু'জনেই বেশ উৎকণ্ঠার মধ্যে আছেন।

এখানে আমার কিছু করার নেই। শুধু তাদেরকে একটু সাহস দেয়া বা সহানুভূতি দেখানো এই আর কী।

এক সপ্তাহ পরে মতিন সাহেব মারা গেলেন। এরপর ঝামেলা আরও বাড়ল। এখন এই ডেডবডি দেশে নিতে হবে।

মিসেস মতিন মেয়েমানুষ আর ছেলে তো ছেলেমানুষ।

সুতরাং সব দায়িত্ব আমাকেই নিতে হলো। অনেক ঝামেলা সহ্য করে আমরা ঢাকা পৌঁছলাম। জয়ন্তী তার জায়গায় ফিরে গেছে। আমাদের বেড়ানো পর্বের সমাপ্তি এবার এভাবেই শেষ করতে হলো। ■

কালচৈত্রীর বজ্রপাত

নাসির খান

পেটে হাত রেখে বমি করতে যাব, ঠিক তখনি সব থেকে পেছনের কুকুরটা ছুটে এসে কামড়ে ধরল আমার ডান পা।

চৈত্র মাসের তুমুল ঝড়কে কী বলা উচিত? অবশ্যই কালচৈত্রী ঝড়! অথচ গত কয়েক দিন ধরে পত্রপত্রিকায় লেখালেখি হচ্ছে:

'কালবৈশাখী ঝড়ের তাণ্ডবে বিপন্ন বাগমারা!'

'কালবৈশাখী ঝড়ে গৃহহীন ১৩ পরিবার!'

'বজ্রপাতে মৃত্যু ১৭ জনের; কালবোশেখীর বিভীষিকা!'

কোনও মানে হয়!

সারাদিন কাঠফাটা রোদে মাথার ঘিলু গলে যায়। আর সন্ধ্যার পর থেকে শুরু হয় ভয়ানক তাণ্ডব।

আজ ৯ এপ্রিল। তিন-চার দিন পর পহেলা বৈশাখ। এবারের পহেলা বৈশাখ একটু অন্যরকম করে কাটাব বলে এসেছি রাজবাড়িতে। আমার মেঝো আপার বাড়ি। অবশ্য পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপনই আমার মূল উদ্দেশ্য নয়। আপার ডেলিভারি ডেট পড়েছে এই দু'তিন দিনের ভেতর।

সপ্তাখানেক আগে আপা ফোন করে বলল, 'বাবু, আমার বাচ্চা হবে।'

এমনভাবে কথাটা ও আমাকে বলল, যেন জীবনে আমি এমন কথা প্রথমবার শুনছি। আমি কাটা কাটা গলায় বললাম, 'তো কী? আমি জানি না নাকি?'

বলে আর যাই কোথায়, ফোনে শোনা গেল আপার নাক টানার শব্দ। কণ্ঠে যথাসম্ভব নাকী-নাকী ভাব এনে আপা কাঁদতে লাগল: 'তার মানে তুই আসবি না? আমার আপন বলতে আর কে আছে?'

'কেন? বড় আপা আছে না? তা ছাড়া, ছোট খালাও তো আছে তোর ওখানে। কেন এত ভণিতা করিস, আপা?'

অবশেষে তার দু'দিন পর আমাকে রাজবাড়ি আসতে হলো। যে ক'দিন আছি, তার বেশিরভাগ সন্ধ্যা, রাতই ছিল দুর্যোগের। এমনিতেই আমার মেঝো আপার শ্বশুরবাড়ি এলাকা ভাল লাগে না। তার উপর আবার ঝড়-বৃষ্টি। এলাকার নামটিও আমার কাছে বেশ অপছন্দ। চরনারায়ণপুর। নামের মধ্যে 'নারায়ণ' শব্দটি আছে বলে সবসময় আমার চোখে দেব-দেবীর মূর্তি ভাসে। সারাদিন জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরি। সন্ধ্যা হলেই বিছানায় শুয়ে কড়াৎ-কড়াৎ মেঘের গান শুনি। জঙ্গলের কথা বললাম এ কারণেই, এলাকাটাকে সুন্দরবন বললে ভুল হবে না। চারদিকে এত পরিমাণে জংলা গাছপালা, দিনের বেলাতেও এখানে শেয়াল ডাকে। আমার ধারণা, এখানে কিছু বাঘ-ভাল্লুক ছেড়ে দিলে এটাও হবে ছোটখাটো একটা সুন্দরবন। অবশ্য আগের চেয়ে এখন অনেক বসতি গড়ে উঠেছে। এবার নিয়ে মোট চারবার এলাম আপার বাসায়।

সকাল থেকেই আজ ভাল না আপার শরীরটা, তামাটে হয়ে গেছে। মাথার চুলগুলো কুড়কুড়ে হয়েছে কেমন। ছোটবেলায় হাতের কাছে চুল পেলে বাতির আগুনে ধরলে যেমন দেখাত, তেমন। পুষ্টিহীনতায় ভুগছে কি না কে জানে!

দুপুরের দিকে আপা শুয়ে ছিল। গেলাম আপার কাছে। ফ্যাকাসে চোখে আপা আমার দিকে তাকাল। আমি হেসে ফেলে বললাম, 'আপা, তোকে দেখতে রোনালদোর মত লাগছে। হা-হা-হা!'

আপা নড়েচড়ে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। মুখ ফিরিয়েই বলল, 'উনি কে?'

'কে? কার কথা বলছিস?'

'ওই যে রোনালদো বললি যে।'

'বাদ দে, আপা, তোকে মরা মানুষের মত লাগছে কেন?'

আপা আমার দিকে আবার ফিরে তাকাল। বিড়বিড় করে বলল, 'বাবু, এখান থেকে যা। ভাল লাগছে না। মনে হচ্ছে আজকেই বাচ্চা হয়ে যাবে।'

সন্ধ্যা থেকেই আকাশ কালো হতে শুরু করেছে। নিশ্চিত আজও তুমুল ঝড়-বৃষ্টি হবে। আমি বিছানাতে কাঁথা গায়ে বসে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'প্রজাপতির মৃত্যু ও পুনর্জন্ম' বইটা পড়ছি। এতটুকুন একটা উপন্যাস শেষ করতে আমার ঝাড়া তিন ঘণ্টা লাগল। এর মাঝে একবার আপার বড় মেয়ে জেরিন এসেছে আমার কাছে। কথা নেই বার্তা নেই সোজা খাটে উঠে আমার কাঁথার নিচে। আমি বই থেকে মাথা না তুলেই বললাম, 'এখানে কী চাই, জেরিন?'

কাঁথা থেকে মুখ বের করে উঠে বসল মেয়েটা। আমার দিকে তাকিয়ে পটপট করে বলল, 'কিছু চাই না, মামা। আমি আজ তোমার এখানে ঘুমাব। আমার খুব ভয় লাগছে। আমাকে ডিস্টার্ব করবা না।'

বলেই আগের মত ধুপ করে শুয়ে পড়ল। মেয়েটাকে আমার পছন্দ হয়েছে। গ্রামে মানুষ হলেও এই মেয়েটা আদর্শ পাচ্ছে তার মামার মত। আমি ওর কথা শোনার জন্য বই বন্ধ করে ফেললাম। নরম কণ্ঠে বললাম, 'তুমি যেন কীসে পড়ো?'

কাঁথার ভেতর থেকে মুখ না বের করেই জেরিন উত্তর দিল, 'ফোরে। রোল এক।'

'তোমার সবচেয়ে অপছন্দের স্যার কে স্কুলে?'

'উঁহুঁ, স্যার না, ম্যাডাম। ঝর্না ম্যাডাম। সবাইকে শুধু শুধু ধমকায়।'

'তোমার বান্ধবীদের নাম বলো।'

'আমার কোনও বান্ধবী নেই। একজন আছে। বীথিকা। তবে ও একদিনও পড়া করে আসে না।'

'তুমি প্রতিদিন পড়া করো?'

'মামা, ডিস্টার্ব করছ কেন? আমি ঘুমাব।'

'আম্মুর কাছে গিয়ে ঘুমাও।'

'নাহ্। আম্মুর গা দিয়ে গন্ধ বের হয়।'

এবার শব্দ করে হেসে ফেললাম, বললাম,

'তাই নাকি? আমার গায়েও তো গন্ধ।'

এ কথায় জেরিন বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে বলল, মুরগির পা আগুনে পুড়িয়ে ছাল বের করার সময় যেমন গন্ধ হয়, তেমন পোড়া গন্ধ বেরোয় নাকি ওর মায়ের গা দিয়ে।

বই বন্ধ করে দরজা লাগিয়ে দিলাম। ঘুমানোর প্রস্তুতি নিতে নিতে রাত প্রায় দশটা বাজল। বৃষ্টির ঠাণ্ডা আমেজে চোখে কেবল ঘুম এসেছে, তখনি দরজা ধাক্কানোর শব্দ পেলাম। জেরিন উদ্বিগ্ন কণ্ঠে চেঁচাচ্ছে, 'মামা, দরজা খোলো! মা মরে যাচ্ছে, মামা!'

দরজা খুলে দেখি জেরিন থরথর করে কাঁপছে। আমি ওকে কোলে তুলে বললাম, 'ভয় নেই, জেরিন। আমি আছি।'

আমার গা শক্ত করে পেঁচিয়ে ভীতু কণ্ঠে কেঁদে ফেলল, 'মামা, দেখো, মা আজ মারা যাবে। আমার অনেক ভয় লাগছে।'

আপার কাছে এসে দেখি অবস্থা সত্যিই ভয়ানক। হঠাৎ করেই ব্যথা উঠেছে। আপা সহ্য করতে পারছে না। ওকে দেখতে কী যে বীভৎস লাগছে! সম্ভবত হাসপাতালে নিতে হবে। এদিকে ছয় মাস হলো দুলাভাই গেছে বিদেশে। ভবে কিছু বুঝে ওঠার আগেই আপার চাচাশ্বশুর একটা অটোরিকশা নিয়ে এল কোথা থেকে। সম্ভবত পাশের বাসার কারও হবে।

আপাকে ছাদওয়ালা অটোরিকশার লম্বা সিটে শুইয়ে দেয়া হলো। আপার সঙ্গে উঠল ছোট চাচা আর আপার শাশুড়ি-মা। আমাকে বলা হলো জেরিনকে নিয়ে বাড়িতে থাকতে। কী হয় না হয় আমাকে ফোনে জানানো হবে। অবশ্য ইলেকট্রিসিটি না থাকার কারণে আমার মোবাইলের চার্জ বিকাল থেকেই শেষ। ফোনও অফ করা। তারপরও কোনও চিন্তা করলাম না। ছোট চাচীর ফোনে যোগাযোগ করা হবে। উনিও কিছু দিন ধরে অসুস্থ, তাই তাঁর উপর ভরসা না করে আমাকে থাকতে বলা হলো বাড়িতে।

রাত এগারোটার দিকে ছোট চাচী চিঁ-চিঁ করে আমাকে কী যেন বলার চেষ্টা করলেন। আমি তাঁর কথা কিছুই বুঝলাম না। উনি তাঁর মোবাইল ফোনটা আমার হাতে ধরিয়ে দিতেই বেজে উঠল ফোনটা। আশ্চর্য, রিসিভ করেই আপার কণ্ঠ শুনলাম, 'হ্যালো, বাবু, একটা কাজ কর...'

'আপা, তুই কি সুস্থ আছিস? বল, কী করব?'

'আলমারির নিচের ড্রয়ারে পাঁচ হাজার টাকা আছে। নিয়ে চলে আয় হাসপাতালে। চাবি আমার বিছানার তোশকের নিচে আছে।'

ঝড়-বৃষ্টির রাতে রিকশা পাওয়ার আশা নেই, তাই আমি হেঁটেই রওনা দিলাম। বৃষ্টি নেই। কেবল ঘুটঘুটে অন্ধকারে দমকা বাতাস বইছে। হেঁটে যেতে তেমন ভরসা পাচ্ছি না। রাস্তাঘাট তেমন পরিচিত নয়। মাত্র চারবার এসেছি রাজবাড়িতে। চারবারে সবকিছু চিনে ফেলা যায় না। যেবার জেরিনের জন্ম হলো, সেবার প্রথম হাসপাতালে গিয়েছি। মনে হচ্ছে না হেঁটে গেলে হাসপাতাল চিনব। ভাবলাম হেঁটে স্টেশন পর্যন্ত গেলে সেখানে রিকশা, ভ্যান যে-কোনও কিছু পাব নিশ্চয়ই।

প্রবল ঠাণ্ডা বাতাসে গা শিউরে উঠছে বারবার। এই বাতাসের মধ্যেই হেঁটে ড্রাই-আইস ফ্যাক্টরি পার হলাম। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ভেঙে বড় বড় ফোঁটায় শুরু হলো বৃষ্টি। বুঝলাম, নির্ঘাত ভিজে যাব। আমি ভিজলে তেমন সমস্যা নয়। আমার কাছে পাঁচ হাজার টাকা আছে এই একটা বড় সমস্যা। ডান পাশে মোটামুটি ঝাঁকড়া একটা পাকুড় গাছ দেখলাম। তাতে মনে সায় পেলাম না। পাকুড় গাছ বৃষ্টির পানি ঠেকাতে পারবে না। মাঝে মধ্যে যে বিদ্যুৎ ঝলকানির আলো, তাতে দেখলাম একটু সামনে বিরাট একটা কড়ই গাছের নিচে একটা বাড়ি। চারপাশ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা হলেও মনে হলো, সদর গেট একদম হাঁ করে খোলা। ত্রিশ-চল্লিশ সেকেণ্ড দৌড়ে গেট দিয়ে সোজা ঢুকে পড়লাম। সামনে ছোটখাটো বারান্দামত এক ছাদওয়ালা জায়গা। সেখানেই আশ্রয় নিলাম। বারান্দার পিছনে কাঁচিগেট। ভিতরের সব দেখা যায়। লম্বা প্যাসেজের মত জায়গা। দু'পাশে সম্ভবত আবাসিক হোটেলের মত অনেকগুলো রুম বা এরকম কিছু। সারা বাড়িতে কোনও লাইট জ্বলছে না। কোনও সাড়াশব্দও নেই।

বাড়িটাকে পরিত্যক্ত ভাবতে পারছি না।

কারণ, পুরো বাড়িতেই করা হয়েছে নতুন রঙ। ধবধবে সাদা। আমি হাত দিয়ে মাথা ঝাড়ছি, আর খোলা গেট দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছি। পাঁচ-দশ মিনিট পার হতে না হতে আমার গা কেমন ভারি হয়ে উঠল। মনের ভেতর লাগল ভয়। কেন জানি মনে হচ্ছে, অসংখ্য চোখ প্রাচীর ঘেরা এই বাড়িতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আমাকে লক্ষ করছে।

ঝড়-বৃষ্টির রাত।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। তার মধ্যে নির্জন বাড়ির সামনে একা। ভয় লাগাটাই স্বাভাবিক। সান্ত্বনা দিয়ে একটু ধাতস্থ করছি নিজেকে, ঠিক তখনি পেছনের কাঁচিগেট সশব্দে এক হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেলল কে যেন!

চমকে পেছন ফিরে তাকালাম। অন্ধকারে কাউকে দেখলাম না। তবে বিশ্রী একটা গন্ধ এসে আছড়ে পড়ল নাকে।

খুব শীতল অথচ খ্যাসখ্যাসে গলায় কেউ বলল, 'ভিতরে আহেন।'

আমি সাহস করে বললাম, 'কে!'

লোকটি উত্তর না দিয়ে বলল, 'কইলাম ভিতরে আহেন। বিজলী বহুত খারাপ, ঠাডা পড়ব।'

কথা না বাড়িয়ে সম্মোহিতের মত ভিতরে ঢুকলাম। বাধ্য হলাম নাকে হাতচাপা দিতে। যা বিশ্রী গন্ধ!

প্যাসেজের কাছে একবার বিদ্যুৎ ঝলকানির আলো পেলাম। দু'এক সেকেণ্ডের আবছা আলোয় দেখলাম খেজুর পাতার তৈরি পাটি গায়ে জড়িয়ে থাকা লুঙ্গি পরনে লোকটিকে। ফস্ করে বলে ফেললাম, 'আপনার গায়ে পাটি কেন?'

প্রশ্ন শেষ হওয়ার আগেই উত্তর পেলাম। যেন লোকটি জানত কী প্রশ্ন করব। 'বড্ড শীত করে গো, ভাইসাব। সোজা যায়া পুবের ঘরডায় বসেন, ভাইসাব। কপাট খোলা আছে।'

ভাবলাম ঝড়-বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত রুমে গিয়ে বসি। লোকটা হয়তো কেয়ারটেকার হবে এ বাড়ির। অন্ধকারে আস্তে আস্তে পা ফেলে সোজা এলাম। যখন হাতড়ে হাতড়ে খোলা দরজাটা পেলাম, ঠিক তখনি আমার কানে এল একটা শব্দ। চপচপ করে কিছু চেটে খাওয়ার আওয়াজের মত। যথেষ্ট ভয় পেলেও ভড়কে গেলাম না। রুমের ভেতর ঢুকে পড়লাম। ঢুকেই আমার সারা গায়ে কাঁটা দিল। দেখলাম, ঘুটঘুটে অন্ধকারে দশ-বারোটা জ্বলন্ত চোখ আমার দিকে ফিরে তাকাল। চোখগুলো মেঝে থেকে উচ্চতায় আমার উরু পর্যন্ত হবে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই জ্বলে উঠল রুমে বিশ ভোল্টের একটা হলুদ লাইট। সে আলোয় দেখলাম পুরো ঘরটাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তিন-চারটা মানুষের লাশ। কোনওটা বুক থেকে পিঠ পর্যন্ত মসৃণভাবে কেটে ফাঁক করা। কোনওটার মাথা বিধ্বস্ত। আর সেগুলো ঘিরে আছে পাঁচ-ছয়টি কুকুর (আমার মনে হলো শেয়াল। কিন্তু শেয়ালের গায়ের রং তো কালো হয় না)। আমাকে দেখে লাশগুলো খাওয়া বাদ দিয়ে স্থির হয়ে গেছে কুকুরের দল। ওদের তাকানো দেখে মনে হলো ওদের আমি প্রচণ্ড বিরক্ত করে ফেলেছি। আতঙ্কে গুরু হলো আমার পেটের মধ্যে কাঁপুনি। মনে হলো বুঝি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না। বীভৎস লাশগুলোর গন্ধে পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি উল্টে আসছে আমার।

পেটে হাত রেখে বমি করতে যাব, ঠিক তখনি সব থেকে পেছনের কুকুরটা ছুটে এসে কামড়ে ধরল আমার ডান পা। কুকুরটার ধারাল দাঁত বসে গেল জিন্স প্যান্টে। দাঁতগুলো পায়ের চামড়া তখনও স্পর্শ করেনি। কোনওরকম প্রতিরোধ করতে পারছি না। সমস্ত শরীর যেন অবশ হয়ে আসছে। তখনই আতঙ্কিত দৃষ্টিতে লক্ষ করলাম, হিংস্রভাবে আমার দিকে এগিয়ে আসছে কুকুরগুলো।

তখনই খুব কাছে কোথাও আকাশ কাঁপিয়ে বাজ পড়ল। মনে হলো বাজ পড়ার শব্দে যেন শরীরে শক্তি ফিরে পেলাম। এক ঝটকায় পা কামড়ে থাকা কুকুরটাকে লাথি মেরেই ঝেড়ে দৌড় দিলাম।

ভেবেছিলাম পেছনে পেছনে কুকুরগুলোও আসবে। কিন্তু আশ্চর্য, হুট করে উধাও হলো সবক'টা কুকুর!

আমি এসব নিয়ে মাথা ঘামালাম না। দৌড়ে কাঁচিগেট পার হওয়ার সময় কোনও কিছুতে পা বেধে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। যখন

আমি রুমে ঢুকি, তখনই চলে এসেছিল ইলেকট্রিসিটি। তাই আলোয় দেখলাম যেটাতে পা বেধে পড়ে গেছি, সেটা হচ্ছে সেই পাটি দিয়ে পেঁচানো লোকটির লাশ। যার পাটির অর্ধেক কিছুতে ছিঁড়ে খেয়ে নিয়েছে।

বিদ্যুদ্গতিতে দৌড়ে রাস্তায় এলাম। তারপর সোজা রাস্তা ধরে দৌড়ে সরকারি কলেজ, গির্জাঘর পার হয়ে এক দৌড়ে আর. এস. কে.।

ইনস্টিটিউশনের সামনে দিয়ে স্টেশনে এসে ধপ করে বসে পড়লাম। মোটামুটি দশ-পনেরো মিনিট রেস্ট নিয়ে টিকেট কাউন্টারের সামনে বসে থাকা কয়েকজন উৎসুক জনতার প্রশ্নের উত্তর দিলাম। এর মধ্যে একজন ভ্যানচালক। বাড়ি নাকি মেঝো আপার বাসার কাছেই। তিনি সব শুনে তাঁর ভ্যানে আমাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে রাজি হলেন। তখন রাত প্রায় একটা।

ভ্যানে সামনের দিকে বসলাম। আমার পেছনে দুটি বস্তা বোঝাই কী যেন। চাচামিয়াকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, বস্তা ভর্তি আলু। হাসপাতালে পৌঁছাতে আমার দশ থেকে পনেরো মিনিট মত লাগল।

হাসপাতালটা কেমন জনশূন্য মনে হলো আমার কাছে। হয়তো রোগী কম বলেই এমন। জানি না আপা কোথায় আছে। আমাকে প্রত্যেক ওয়ার্ড আর কেবিন খুঁজতে হবে হয়তো। না, অত কষ্ট করতে হলো না আমার। দোতলায় সিঁড়ির মাথায় অ্যাপ্রন পরা মধ্যবয়সী এক ডাক্তারকে দেখলাম। রোগীর ব্যাপারে সম্পূর্ণ খুলে বলে তার অবস্থান জানতে চাইলে তিনি মুখে কোনও উত্তর দিলেন না। তবে অদ্ভুতভাবে জানিয়ে দিলেন। পশ্চিম দিকে সোজা তর্জনী তুলে খাড়া করলেন বৃদ্ধ আঙুলটি।

অর্থাৎ সোজা শেষপ্রান্তে গিয়ে বাঁয়ের কেবিনে আপা আছে।

সোজা হেঁটে যাচ্ছি। একদম ফাঁকা প্রত্যেকটা বেড। আজকাল মানুষের অসুখ হয় না নাকি? হলেও তারা হাসপাতালে আসে না নাকি? ওয়ার্ডের শেষ প্রান্তে পৌঁছালাম। বাঁ-পাশের কেবিনটি খোলা। ভিতরে লাইট জ্বলছে কম পাওয়ারের।

সোজা ভিতরে ঢুকলাম। দেখলাম আপার শাশুড়ি, ছোট চাচা বা ডাক্তার-নার্স কেউ নেই ভিতরে। তবে বেঢপ পেটওয়ালা একজনকে দেখলাম, যার সমস্ত শরীর সাদা নোংরা চাদরে ঢাকা। এমন কী মুখটাও। লাশ যেভাবে ঢেকে রাখে, তেমন। আমার মেঝো আপার অভ্যাস আছে এমন করে ঘুমানোর।

নিশ্চয়ই এটা আপা। আমি সাহস করে মুখ থেকে চাদর সরিয়েই ভয়ে জমে গেলাম। দেখলাম আপার মুখ আর চুল পোড়া। কদাকার দেখাচ্ছে ওকে। মুখের সমস্ত অংশ পোড়েনি বলে বোঝা যাচ্ছে এটা আমার মেঝো আপা।

সত্যি সত্যি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। আমার পা জমে গেল যেন। এক পর্যায়ে ধক করে চোখ খুলে আমার দিকে তাকাল আপা। ফ্যাঁসফ্যাঁস করে বলল, 'বাবু, ভয় পাচ্ছিস?'

বিড়বিড় করে বললাম, 'তোর কী হয়েছে? ছোট চাচা কোথায়? মাওই মা কোথায়?'

আমার প্রশ্নের উত্তরে আপা যা বলল, তাতে আমি আকাশ থেকে পড়লাম। মনে হলো দুঃস্বপ্ন দেখছি। আপা ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে বলল, 'বাবু, আমি তো মারা গেছি গতকাল ভোরে। ভোরবেলা অনেক ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছিল, মনে আছে তোর? আমি বাথরুম করতে বাইরে এলাম। বাথরুম থেকে ঘরে আসব, ঠিক তখনি আমার মাথায় বজ্রপাত হলো। সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলাম। আর মারা যাওয়ার পরও দেখলাম আবার জীবিত হয়ে গেছি। আমার পেটের সন্তান জীবিত আছে। আমার কানে কানে শত শত মানুষ বলে গেল—চৈত্র মাসের ঝড়ের বজ্রপাতে তোমার মৃত্যু। তুমি অসম্ভব ক্ষমতার অধিকারী এখন। তুমি এখনি মরছ না। তবে খুব শীঘ্রিই আমাদের কাছে চলে আসবে। আমার তখনি মনে হলো আমার পেটের বাচ্চাটাকে বাঁচাতে হবে। ও, বাবু, তুই ভয় পাচ্ছিস? অমন করছিস কেন? আয়, আমার কাছে আয়।'

বলেই আমার শার্টের এক কোনা টেনে ধরল আপা।

আমি হাসপাতাল কাঁপিয়ে বিকট চিৎকার দিয়ে পড়ে গেলাম মেঝেতে। যখন জ্ঞান ফিরল,

তখন আমার পাশে তিন-চারজন নার্স-ডাক্তার। একজন আমার মুখের উপর ঝুঁকে এসে বললেন, 'মর্গে কী করছিলেন আপনি?'

আপার কথা খুলে বললাম। ডাক্তার বলল, আপাকে অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়। অবস্থা সিরিয়াস দেখে সে অবস্থায় অ্যাম্বুলেন্সে করে ফরিদপুর মেডিকেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। আপা নাকি ফোনে কথা বলার মত কোনও অবস্থায় ছিল না। আমি কোনও ভুল করেছি, ডাক্তারদের ধারণা। মর্গে কোনও লাশ নেই।

মাথার চুল খামচে ধরলাম আমি। নিশ্চয়ই কিছু একটা হচ্ছে আমার সঙ্গে। আর এসব নিয়ে মাথা ঘামালাম না। ভাবলাম রাত দুটো-তিনটে যা-ই বাজুক, এখন বাসায় যাব, যদি হাসপাতালের সামনে গাড়ি পাওয়া যায়। না পেলে আজ রাত আমাকে হাসপাতালেই কাটাতে হবে।

হাসপাতাল গেটে এসে অবাকই হলাম। দেখলাম আরোগ্য ফার্মেসীতে ভ্যানওয়ালা চাচা বসে আছেন। রাস্তায় বস্তাসহ ভ্যান দাঁড় করানো। আমাকে দেখে উনি হাসলেন।

বাসায় ফিরতে চাই বললাম তাঁকে।

উনি বুঝলেন যে আমার উপর দিয়ে যথেষ্ট ধকল গিয়েছে। উনি আশ্বস্ত করলেন, ওঁর ভ্যানে আমাকে বাসায় পৌঁছে দেবেন। তাঁর বাড়িও ওদিকেই, তাই কোনও সমস্যা হবে না।

চাচার গ্রামের নাম গঙ্গাপ্রসাদপুর। চরনারায়ণপুরের একটু পাশেই। ভ্যানে উঠে বসলাম। ঝড়-বৃষ্টি থেমে গেলেও আকাশে যথেষ্ট মেঘ। রাস্তাঘাট জমাট অন্ধকার ঠাসা। ভ্যানের নিচে অস্পষ্ট আলোর হারিকেন পরিবেশকে করে তুলেছে আরও ভৌতিক।

ভ্যানচালক আর আমি দু'জনেই চুপচাপ আছি। কথা বলতে একটুও ইচ্ছা করছে না। কী মনে হতে উনি হুট করে বলে ফেললেন, 'বাবা, আপনি ঝড়ের মধ্যে যে ঘরডায় দাঁড়াই ছিলেন, ওইডা কিন্তুক কারও বাড়ি না। হেইডা আছিল লাশকাটা ঘর। ওইহানে পোস্টমর্টেম করা হয়।'

নড়েচড়ে বসলাম। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললাম, 'বলেন কী, চাচা?'

'হ, বাবা। আপনে যে জান নিয়া বাইর হইছেন ইহান থোন, এইডা আপনার ভাইগ্য। আল্লাহর অসীম দয়া। এইরম ঘটনা পেরাই ঘড়ে। যেইদিন পাহারাদার থাহে না, গুইনা গুইনা হেইদিনই ঘড়ে।'

'চাচা, আমি তিন-চারটা লাশ দেখলাম...'

'ঠিকই দেখছেন। গতকাইল দুই-তিনডা ঠাডা পড়া লাশ আইছে ঘরে।'

পুরো ঘটনা আবার মনে মনে জাবর কাটলাম। আমার গায়ের লোম সব দাঁড়িয়ে গেল। কী ভয়ানক অভিজ্ঞতার সামনে যে পড়েছি ভাবতেই পারছি না।

ভ্যান যখন সরকারি কলেজের সামনে, তখন চাচা কোমর থেকে বিড়ি বের করে ধরালেন। আমার দিকেও ধরানো একটা বাড়িয়ে দিলেন। আমি অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, 'চাচা, আমি সিগারেট পছন্দ করি না।'

চাচা সুন্দর শব্দ তুলে হাসলেন। ওঁর সশব্দ হাসি আমার ভয় অনেকখানি কাটিয়ে দিল। নিজেকে অনেক হালকা মনে হলো। ভাবলাম, এরকম ভৌতিক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হওয়া কোনও ব্যাপার নয়।

চাচা আবার বললেন, 'বিড়ি না খাইলেও ধইরা রাহেন। আগুন ঠিক রাহার জন্য মাঝে মইদ্যে দুই-এক টান দেন। ওইগুলান আগুনরে খুব ডরায়।'

চাচার কথা যৌক্তিক মনে হলো। বিড়ি নিয়ে টান দিলাম। আনাড়ির মত কাশতে লাগলাম।

যখন ভ্যান লাশকাটা ঘরের সামনে দিয়ে যাচ্ছে, তখন পুরো পরিবেশ স্বাভাবিক দেখলাম। খোলা গেট, চুপচাপ সবকিছু। উল্টাপাল্টা ভাবছিল আমার মস্তিষ্ক। মনে হলো পাটি জড়ানো লাশটি আমার মাথার মধ্যে বলে যাচ্ছে, 'পারলি না তো পিশাচগুলোর হাত থেকে আমাদেরকে বাঁচাতে। আমাদের জীবন্ত চামড়ায় দাঁত বসিয়ে খেয়ে গেল ওরা।'

চাচা ভ্যান চালিয়ে তালতলা মসজিদের কাছে এসে থেমে গেলেন। বিশাল একটা আম গাছ আড়াআড়িভাবে পড়ে আছে রাস্তার মাঝখানে, যে কারণে ওদিক দিয়ে ভ্যান নেয়া সম্ভব নয়।

চাচার অস্বস্তি দেখে বুঝলাম, তিনি অপারগ। তাঁর রাস্তা হলো মসজিদের পাশ দিয়ে রেল লাইনের দিকে যে রাস্তা গিয়েছে, সেটা। আর আপার বাসা তার বিপরীত দিকের রাস্তায় সোজা।

নীরবতা ভেঙে বললাম, 'চাচা, আমি এখন একাই যেতে পারব। পাঁচ মিনিট হাঁটলেই আপার বাসা। আপনি চলে যান।'

চাচা বুঝলেন আমার বলার মধ্যে অনেক আত্মবিশ্বাস আছে। তিনি কোমর থেকে দিয়াশলাইয়ের বাক্সটা বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'ম্যাচটা সাথে রাহেন, বাবা। আর কুনো বিপদ আইব না। কাঠি জ্বালাইলে সাহস পাইবেন।'

তাঁর হাত থেকে ম্যাচ নিলাম।

মসজিদ থেকে আসা আলোতে সেই প্রথম তাঁর চেহারা সচেতন মস্তিষ্কে লক্ষ করলাম। মুখে দাড়ি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নূরানী চেহারা তাঁর। আশ্চর্য, তখনই নাকে আতরের গন্ধ পেলাম। খুব হালকা অথচ মিষ্টি গন্ধ। আমি প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে বললাম, 'আপনার নাম কী, চাচা?'

আমার প্রশ্নের উত্তর পেলাম না। সুন্দর করে হাসি দিয়ে উনি ভ্যান নিয়ে বিপরীত দিকে রওনা দিলেন।

পা বাড়ালাম। আম গাছটা পার হওয়ার সময় ডান হাত একটা ডালে পেঁচিয়ে দেশলাইটা পড়ে গেল। কোন্ কোনায় পড়েছে কে জানে, পাঁচ মিনিট খোঁজ করার পরও পেলাম না।

অবশেষে যা পেলাম, তা কাদাপানিতে মাখামাখি হওয়া অকেজো দেশলাই। ওটা কাদাপানিতে বিসর্জন দিলাম। মনে আর ভয় নেই।

পাঁচ মিনিট হাঁটলেই আপার বাসা। আশপাশে বাড়িঘরও আছে কয়েকটা।

ডাক্তার বদরুল চাচার বাড়ি পেরিয়ে একটু সামনে এগোলাম।

নিথর ঘন কালো আকাশ। এখন কোনও বাতাসও নেই। গুম অবস্থা। রাস্তার পাশের খালে সম্ভবত পানি জমে গেছে। আমার মনে হলো সেই পানিতে ছপছপ শব্দ তুলে হাজার হাজার পায়ে দৌড়ে রাস্তায় উঠে আসছে কিছু।

খুবই ভয়ানক অবস্থা!

দেখলাম সত্যি সত্যি খাল থেকে অসংখ্য জ্বলন্ত চোখ জোনাকীর মত রাস্তায় এসে স্থির হচ্ছে। অসংখ্য চোখের দৃষ্টি আমার দিকে। কেঁপে কেঁপে উঠল আমার হৃৎপিণ্ড। সেইসঙ্গে অপ্রাসঙ্গিকভাবে শুরু হলো দমকা বাতাস ও মেঘের গর্জন।

হাজার চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো, আমি তাদের একসময় খুব বিরক্ত করেছি! সেই প্রতিশোধ ওরা নেবে!

একসময় উপলব্ধি করলাম, প্রবল আতঙ্কে আমার মুখ দিয়ে গোঁ-গোঁ আওয়াজ বের হচ্ছে। কারণ সেই হিংস্র চোখগুলো এগিয়ে আসছে আমার দিকে। মনে মনে এই প্রথম আল্লাহকে ডাকলাম: হে, আল্লাহ, আমার উপর বজ্রপাত ঘটাও। এত আতঙ্ক সহ্য করতে পারছি না। আমার মৃত্যু দাও।

বলা শেষ হতেই আমাকে অবাক করে দিয়ে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে প্রচণ্ড শব্দে কড়াৎ করে পড়ল বাজ।

তবে আমার মাথায় না পড়ে পড়ল ওই প্রাণীগুলোর উপর, যাদের গায়ের রঙ কালো, দেখতে শেয়ালের মত।

মুহূর্তেই উধাও হলো ওরা। রাস্তা ফাঁকা। প্রচণ্ড শব্দে আমার কানে তালা লেগে গেছে। জীবনে প্রথম নিজ চোখে বজ্রপাত দেখলাম। তা-ও আবার কালবৈশাখীর বজ্রপাত। কী চোখ ধাঁধানো আগুনের ফুলকি! দেখে মনে হয়েছে আসলেই এই বজ্রে অনেক রহস্য।

নির্বাক দাঁড়িয়ে আছি। নড়তে পারছি না ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও। একটু পরেই বুঝলাম, পেছন থেকে টর্চের আলো ফেলে কেউ একজন আসছে। কাছে এসেই অবাক হওয়া গলায় বলল, 'কে, বাবু না!'

দেখলাম বদরুল চাচা। যেন হুঁশ ফিরে পেলাম। বুঝলাম সারা শরীর ঘেমে ভিজে একাকার আমি।

তিনি আবার বললেন, 'তুমি জেরিনের মামা

প্রকাশিত হয়েছে

পিশাচ কাহিনি

অজ্ঞাতনামা লেখকের পাণ্ডুলিপি থেকে

বেউলফ

রূপান্তর: ডিউক জন

দানব গ্রেনডেলের মাকে হত্যা করতে এসে উল্টো সেই মায়াবিনীরই জালে আটকা পড়ল বীর যোদ্ধা বেউলফ। মদির গলায় শর্ত জানাল মায়াবিনী: তাকে আরেকটি সন্তান উপহার দিলে তবেই মিলবে মুক্তি। সুন্দরী পিশাচীর আহ্বানে সাড়া দিল রূপমুগ্ধ বীর যোদ্ধা। তারপর...

দাম ■ একশ' পনেরো টাকা

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

mail: alochonabibhag@gmail.com

শো-রুম

৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

না? তোমার আপার কী অবস্থা?'

তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলাম না। তিনি আমাকে ধরে বাসায় পৌঁছে দিলেন।

বাসায় পৌঁছে মোটামুটি ঘণ্টা দুই ঘুমালাম। সকালে ঘুম ভেঙে দেখি বাড়ি ভর্তি লোকজন। বড় আপা তার তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে হাজির। ছোট খালা এসেছে। দুলাভাইয়ের কিছু আত্মীয়-স্বজন এসেছে। সবারই আনন্দ চোখে পড়ার মত। মেঝো আপার ছেলে হয়েছে!

রাতের ঘটনা যে আমার জীবনে চরম দুর্বিষহ ছিল, তা কাউকে বললাম না। বদরুল চাচা সবাইকে বলেছেন, ভোররাতে দু'তিন শ' শেয়ালের পায়ের শব্দ শুনে ঘটনা কী বুঝতে রাস্তায় আসেন তিনি। আমাকে রাস্তায় মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সামান্য ভয় পেয়েছেন।

দুপুরের দিকে অ্যাম্বুলেন্সে করে মেঝো আপাকে আনা হলো। আমি বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে ছুটে গেলাম আপার কাছে। অ্যাম্বুলেন্সের ভিতর থেকেই আপা বলল, 'বেঁচে গেলাম রে, বাবু। মরিনি।'

আমি তেতে উঠলাম, 'মরবি কেন?'

'বাচ্চা হতে গিয়ে মানুষ মরে না? দেখ, আমার বাবুটা কী সুন্দর হয়েছে! আগুনের মত গায়ের রঙ। ওর নাম কী দেব, কী দেব... ওর নাম দিলাম বজ্র।'

আমি চারদিকে তাকিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললাম, 'এত নাম থাকতে বজ্র কেন?'

আমার অনুসন্ধানী চোখ দেখেই হয়তো আপা বলল, 'বাবু, যা তো এখান থেকে। আমার রাগ লাগছে।' বলেই আপা রহস্যময় এক হাসি হাসল।

আমি খেপে গিয়ে মেঝো আপার মাথা থেকে কাপড় ফেলে দিলাম চুলগুলো দেখার ইচ্ছায়। আমার ক্ষিপ্রতা হয়তো অস্বাভাবিক ছিল। দেখলাম বড় আপা ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে আর বলছে, 'ও, বাবু, অমন করিস কেন? কী হইছে? তোমরা কেউ পানি আনো, বাবুর মাথায় পানি দিতে হবে।'

আমার প্রচণ্ড হাসি পেল। ■

ভাগ্যচক্র

কাজী সারওয়ার হোসেন

মেষ

২১ মার্চ–২০ এপ্রিল

মাসের শুরু থেকেই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তেজিভাব বিরাজ করতে পারে। পারিবারিক সমস্যার সমাধানে আপনার উদ্যোগ ফলপ্রসূ হতে পারে। মামলা-মোকদ্দমা থেকে দূরে থাকুন। এ মাসে সার্বিকভাবে আপনার উপার্জন বৃদ্ধি পেতে পারে। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য মাসের শেষ দুই সপ্তাহ বিশেষ শুভ। যে কোনও ধাতব পদার্থের ব্যবসায়ে হাত দিলে সুফল পেতে পারেন। সৃজনশীল কাজের জন্য সম্মাননা পেতে পারেন। রাজনৈতিক তৎপরতা শুভ। জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি হতে পারে। বিশেষ শুভ তারিখ: ৩, ৯, ১৪, ১৭, ২৩, ৩০।

বৃষ

২১ এপ্রিল–২১ মে

যে কোনও বনজ সম্পদের ব্যবসায়ে হাত দিলে সুফল পেতে পারেন। মামলা-মোকদ্দমার রায় আপনার পক্ষে যেতে পারে। বেকারদের কারও-কারও জন্য মাসের শেষ দুই সপ্তাহ বিশেষ শুভ। পাওনা আদায়ে অন্যের সহযোগিতা পেতে পারেন। সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের সুবাদে বিদেশ যাত্রার সুযোগ আসতে পারে। কর্মস্থলে নতুন সহকর্মীর সঙ্গে আচরণে কুশলী হোন। শিক্ষাক্ষেত্রে কারও-কারও বৃত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। রাজনীতিতে আপনার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে পারে। তীর্থ ভ্রমণ শুভ। বিশেষ শুভ তারিখ: ৫, ৮, ১৫, ১৮, ২৪, ৩০।

মিথুন

২২ মে–২১ জুন

সুতা, কাপড় কিংবা তৈরি পোশাকের ব্যবসায়ে হাত দিলে সুফল পেতে পারেন। মামলা-মোকদ্দমায় জড়ানো উচিত হবে না। মাসের শুরু থেকে পাওনা আদায়ে তৎপর হোন। সৃজনশীল পেশায় আপনার সুনাম অন্যের ঈর্ষার কারণ হতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীদের কেউ-কেউ বিদেশে অধ্যয়নের সুযোগ পেতে পারেন। এ মাসে সার্বিকভাবে আপনার আয় বৃদ্ধি পেতে পারে। প্রেমের ব্যাপারে ইতিবাচক ঘটনা ঘটতে পারে। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকুন। বিশেষ শুভ তারিখ: ৫, ৯, ১৪, ১৭, ২৩, ২৯।

কর্কট

২২ জুন–২২ জুলাই

এ মাসে উপার্জনের নতুন উৎস খুঁজে পেতে পারেন। পাওনা আদায়ের জন্য মাসের শুরু থেকেই উদ্যোগ নিন। সামাজিক কর্মকাণ্ডের জন্য প্রশংসিত হতে পারেন। আপনি একজন চিত্রশিল্পী হয়ে থাকলে এ মাসে বিদেশ থেকে সম্মাননা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রেমের ব্যাপারে এ মাসেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। ফাটকা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে লাভবান হতে পারেন। রাজনৈতিক তৎপরতা শুভ। নতুন চাকরিতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। বিশেষ শুভ তারিখ: ১, ৮, ১৩, ১৭, ২২, ২৮।

সিংহ

২৩ জুলাই–২৩ আগস্ট

মাসের শুরুতেই আর্থিক বিষয়ে কোনও সুখবর পেতে পারেন। এ মাসে সার্বিকভাবে আপনার আয় বৃদ্ধি পেতে পারে। সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের সুবাদে বিদেশ যাত্রার সুযোগ আসতে পারে। যৌথ বিনিয়োগ শুভ। এ মাসে যে কোনও নতুন ব্যবসায়ে হাত দিতে পারেন। পারিবারিক দ্বন্দ্বের অবসান হতে পারে। আপনি একজন সংগীতশিল্পী হয়ে থাকলে এ মাসে একাধিক অনুষ্ঠানের জন্য চুক্তিবদ্ধ হতে পারেন। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য এখন সুসময় বিরাজ করছে। দূরের যাত্রা শুভ। বিশেষ শুভ তারিখ: ২, ৭, ১৩, ১৯, ১৫, ২৮।

কন্যা

২৪ আগস্ট–২৩ সেপ্টে

ধাতব পদার্থ কিংবা যন্ত্রপাতির ব্যবসায়ে হাত দিলে সুফল পেতে পারেন। ব্যর্থ প্রেমের সম্পর্কে নতুন সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে। আপনি একজন অভিনয়শিল্পী হয়ে থাকলে এ মাসে নতুন কোনও অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হতে পারেন। পারিবারিক দ্বন্দ্বের অবসান হতে পারে। এ মাসে সার্বিকভাবে আপনার আয় বৃদ্ধি পেতে পারে। দূরের যাত্রায় অচেনা সহযাত্রীর ব্যাপারে চোখকান খোলা রাখুন। প্রেমে ব্যর্থ হয়ে থাকলে আবারও চেষ্টা করুন, এ ব্যাপারে

সাফল্যের জোর সম্ভাবনা আছে। যাবতীয় কেনাকাটা শুভ। বিশেষ শুভ তারিখ: ৫, ১০, ১৫, ১৮, ২৪, ২৯।

তুলা

২৪ সেপ্টে–২৩ অক্টো

কর্মস্থলে আপনার উপর বসের সুনজর পড়তে পারে। বেকারদের কারও-কারও কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা আছে। মামলা-মোকদ্দমার রায় আপনার অনুকূলে যেতে পারে। যে কোনও তরল পদার্থের ব্যবসায়ে হাত দিলে সুফল পেতে পারেন। বিদেশ যাত্রার ক্ষেত্রে হাতছাড়া হয়ে যাওয়া সুযোগ ফিরে আসতে পারে। আপনি একজন সংগীতশিল্পী হয়ে থাকলে এ মাসে বিদেশে অনুষ্ঠান করার সুযোগ পেতে পারেন। রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে আপনার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে পারে। বিশেষ শুভ তারিখ: ৩, ৮, ১৫, ২১, ২৪, ৩০।

বৃশ্চিক

২৪ অক্টো–২২ নভে

বিদেশ যাত্রায় প্রবাসী আত্মীয়ের সহায়তা পেতে পারেন। পাওনা আদায়ে কুশলী হোন। এ মাসে সার্বিকভাবে আপনার আয় বৃদ্ধি পেতে পারে। মামলা-মোকদ্দমায় জড়ানো উচিত হবে না। বেকারদের কেউ-কেউ মাসের মাঝামাঝি সময়ে বিদেশ যাত্রার সুযোগ পেতে পারেন। এ মাসে ফাটকা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে লাভবান হতে পারেন। প্রেমের ব্যাপারে ইতিবাচক সাড়া পেতে পারেন। সৃজনশীল পেশায় আপনার সুনাম ছড়িয়ে পড়তে পারে। দূরের যাত্রা শুভ। বিশেষ শুভ তারিখ: ৬, ১২, ১৮, ২১, ২৫, ৩০।

ধনু

২৩ নভে–২১ ডিসে

ব্যবসায়ে নতুন বিনিয়োগ আশার সঞ্চার করবে। কর্মস্থলে আপনার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে পারে। প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবসান হতে পারে। পাওনা আদায়ের জন্য মাসের আগাগোড়াই সুসময় বিরাজ করবে। এ মাসে উপার্জনের নতুন মাধ্যম খুঁজে পেতে পারেন। ছাত্র-ছাত্রীদের কারও-কারও বৃত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। রাজনীতিতে আপনার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে পারে। সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের সুবাদে বিদেশ যাত্রার সুযোগ আসতে পারে। তীর্থ ভ্রমণ শুভ। বিশেষ শুভ তারিখ: ৩, ৮, ১২, ১৮, ২১, ২৭।

মকর

২২ ডিসে–২০ জানু

কর্মস্থলে আপনার উপর বসের সুনজর পড়তে পারে। আপনি একজন চিত্রশিল্পী হয়ে থাকলে কোনও প্রদর্শনীতে আপনার আঁকা ছবি পুরস্কৃত হতে পারে। বিদেশ যাত্রার ক্ষেত্রে হাতছাড়া হয়ে যাওয়া সুযোগ ফিরে আসতে পারে। পাওনা আদায়ের জন্য মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে উদ্যোগী হোন। এ মাসে উপার্জনের নতুন মাধ্যম খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবসান হতে পারে। রাজনীতিতে আপনার অবস্থান সুসংহত হতে পারে। দূরের যাত্রা শুভ। বিশেষ শুভ তারিখ: ৪, ১১, ১৭, ১৯, ২৫, ৩০।

কুম্ভ

২১ জানু–১৮ ফেব্রু

শিক্ষার্থীদের কারও-কারও বৃত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এ মাসে আকস্মিকভাবে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। পাওনা আদায়ে অন্যের সহযোগিতা পেতে পারেন। ব্যর্থ প্রেমের সম্পর্কে নতুন সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে। চাকরিতে কারও-কারও আটকে থাকা পদোন্নতির বিষয়ে নিষ্পত্তি হতে পারে। যে কোনও জলজ প্রাণীর ব্যবসায়ে হাত দিলে সুফল পেতে পারেন। রাজনীতিতে আপনার অবস্থান সুসংহত হতে পারে। দূরের যাত্রায় অচেনা সহযাত্রীর ব্যাপারে চোখকান খোলা রাখুন। বিশেষ শুভ তারিখ: ১, ৮, ১৩, ১৯, ২২, ২৮।

মীন

১৯ ফেব্রু–২০ মার্চ

বিদেশ যাত্রার ক্ষেত্রে হাতছাড়া হয়ে যাওয়া সুযোগ ফিরে আসতে পারে। এ মাসে আপনার আয় বৃদ্ধি পেতে পারে। পারিবারিক সমস্যার সমাধানে আপনার উদ্যোগ ফলপ্রসূ হতে পারে। যাবতীয় কেনাকাটা শুভ। প্রেমের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। ফাটকা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে লাভবান হতে পারেন। দূরের যাত্রা শুভ। কর্মস্থলে আপনার উপর বসের সুনজর পড়তে পারে। জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি হতে পারে। স্বাস্থ্য ভাল যাবে। বিশেষ শুভ তারিখ: ৩, ১১, ১৬, ২০, ২৫, ৩০।

আপনার প্রশ্ন ও সমাধান

মাসাদ্দেক হোসেন
চাঁপাছা, যশোর।
● জন্ম: ১৭-১-৮৬। ভবিষ্যতে আমি কি বিদেশ যেতে পারব?
●● আগামী বছরের মাঝামাঝি সময়ে সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

...নির হোসেন
...াঙা, ফরিদপুর।
● জন্ম: ১০-৮-৮১। আমার সার্বিক উন্নতির জন্য কী পাথর পরব?
●● ডান হাতের অনামিকায় ৬-... রতি ওজনের কাট্ রুবি (রুপোয়) পরলে উপকার পেতে পারেন।

...য়লা ইয়াসমিন
...রপুর, কুমিল্লা।
● জন্ম: ৮-১২-৯০। যে কাজেই ...তে দিই না কেন, বাধা আসবেই; প্রতিকার কী?
●● ডান হাতের মধ্যমায় কমপক্ষে ৬ রতি ওজনের ...নীলা (রুপোয়) পরলে উপকার পেতে পারেন।

...রজানা আক্তার
...বপুর, নরসিংদী।
● জন্ম: ১৫-১২-৯৬। যাকে ভালবাসি তার জন্মতারিখ: ৩-৩-...০। এক্ষেত্রে ফলাফল কী হতে পারে?
●● এ সম্পর্ক বিয়েতে গড়াতে পারে।

...শা খন্দকার
...নানী, ঢাকা।
● জন্ম: ৭-১০-৯৫। ভবিষ্যতে আমি কি একজন সংগীতশিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাব?
●● পারিবারিক প্রতিবন্ধকতা ...কা সত্ত্বেও চর্চা চালিয়ে যেতে পারলে মোটামুটি পরিচিতি লাভে সক্ষম হবেন।

আজিজুল হক
হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ।
● জন্ম: ১৩-৭-৭২। আমার প্রায়ই অন্যের সঙ্গে শত্রুতার সৃষ্টি হয়...
●● ডান হাতের মধ্যমায় ৮ রতি ওজনের ক্যাট'স আই (রুপোয়) পরলে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটতে পারে।

মৌসুমী
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।
● জন্ম: ২৮-১১-৯০। আমার সার্বিক উন্নতির জন্য কী পাথর পরা উচিত?
●● ডান হাতের কনিষ্ঠায় ৭-৮ রতি ওজনের ব্রাজিলিয়ান পান্না (রুপোয়) পরলে উপকার পেতে পারেন।

কামাল আহমেদ
বকশীগঞ্জ, জামালপুর।
● জন্ম: ১৫-২-৯১। ভবিষ্যতে আমি কি বিদেশে যেতে পারব?
●● খুব শীঘ্রি না হলেও তিন বছরের মধ্যে এক্ষেত্রে ভাল সুযোগ আসতে পারে।

আশিকুর রহমান
বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।
● জন্ম: ২৫-৯-৭২। শারীরিক সুস্থতার জন্য কী পাথর পরা উচিত?
●● ডান হাতের কনিষ্ঠায় ৮ রতি ওজনের রক্তপ্রবাল (রুপোয়) পরলে উপকার পেতে পারেন।

চান্দা মেহজাবীন
ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।
● জন্ম: ১৭-৩-৮৮। আমার কবে নাগাদ বিয়ে হতে পারে?
●● আগামী বছরের মাঝামাঝি সময়ের আগেই বিয়ের সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে।

আলমগীর হোসেন
গাচিহাটা, কিশোরগঞ্জ।
● জন্ম: ৩০-১১-৮৫। ব্যবসায়ে মার খাচ্ছি, প্রতিকার কী?
●● কমপক্ষে ১০ রতি ওজনের অ্যামিথিস্ট ডান হাতের মধ্যমায় (রুপোয়) পরলে উপকার পেতে পারেন।

মিলা মোমতাজ
লোহাগড়া, চট্টগ্রাম।
● জন্ম: ১৯-৪-৮৮। আমার কবে নাগাদ আর্থিক সচ্ছলতা আসতে পারে?
●● ৩০ বছর বয়স থেকে ধীরে ধীরে আর্থিক অবস্থার উন্নতির সম্ভাবনা দেখা যায়।

মেরিনা আলম
মজমপুর, কুষ্টিয়া।
● জন্ম: ২৫-১০-৯২। ভবিষ্যতে আমি একজন সাংবাদিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে চাই...
●● বিশ্লেষণধর্মী লেখালেখিতে আগ্রহ আছে আপনার; সুতরাং এক্ষেত্রে সফল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

তুষার
বিরল, দিনাজপুর।
● জন্ম: ২৪-১২-৮৯। যাকে ভালবাসি তার জন্মতারিখ: ১২-৩-৯৪। এক্ষেত্রে ফলাফল কী হতে পারে?
●● এ সম্পর্ক বিয়েতে গড়াতে পারে।

শ্রমণা
নিকেতন, ঢাকা।
● জন্ম: ১-৮-৯৬। ভবিষ্যতে আমি কি সংগীতে সুনাম অর্জন করতে পারব?
●● আগামী দু'বছরের মধ্যে এক্ষেত্রে মোটামুটি পরিচিতি লাভে সক্ষম হবেন বলে আশা করা যায়।

এ বিভাগে চিঠির উত্তর পেতে হলে ইংরেজিতে সঠিক জন্মতারিখ, পুরো ঠিকানা ও এক কপি ছবি সহ লিখতে হবে।

মনস্তাত্ত্বিক গল্প

লাশের গন্ধ

মনিজা রহমান

ডাইনিংরুমে এসে দেখি তখনও লাশের গল্প চলছে।

বোধ হওয়ার পর থেকেই আমি একটা বোটকা গন্ধ পেতাম। ছোটবেলায় এজন্য সারাক্ষণ নাক চেপে রাখতাম। কীসের গন্ধ বুঝতাম না। এক সময় ওই গন্ধ নাকে সয়ে এল। একটু বড় হয়ে ওঠার পরে বুঝলাম গন্ধটা লাশের।

বলে রাখা ভাল, আমাদের পরিবারটা বেশ অস্বাভাবিক। আমার মায়ের মধ্যে অস্বাভাবিকতার মাত্রাটা বেশি। পাড়াপড়শীদের কাছে উনি একজন সমাজসেবক। সবার বিপদ-আপদে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বিশেষ করে আশপাশে কোন মহিলার মৃত্যু হলে আমার মায়ের ডাক পড়বেই। তিনি লাশের গোসল করাতে খুব দক্ষ। এটা একটা ভাল কাজ মানি। কিন্তু আমার জন্য ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। আমি সারাক্ষণই মায়ের শরীরে লাশের গন্ধ পাই।

বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, অন্য কেউ এই গন্ধ পায় না।

আমার বাবা বাসায় থাকেন কম। উনি ফরিদপুরে একজন পীরের সাগরেদ। মাসের বেশিরভাগ দিন উনি পীরের আখড়াতে কাটান। বাসায় কম থাকেন বলেই ওঁর রুম আলাদা। আমাদের দুই বোনের যাবতীয় দেখাশোনা মায়েরই করতে হয়। আমার সাত বছর বয়সী বোন অনুভূতি কথা বলতে পারে না একা, আপন মনে থাকে। মাঝেমধ্যে প্রচণ্ড উত্তেজিত আচরণ করে। আম্মু বাসায় না

থাকলে তখন কেউ ওকে শান্ত করতে পারে না।

আজও সকালে যেমন, অনুভূতি ড্রইংরুমের সোফায় বসে আপন মনে কাগজ কুটি-কুটি করছে। আম্মু বাইরে গেছেন। লাশের গোসল করাতেই মনে হয়।

আমি টেবিলে নাস্তা বাচ্ছিলাম। দ্রুত খাওয়ার চেষ্টা করছি। দুটো কারণে। একটু পরে কোচিংয়ে যেতে হবে। জেএসসি পরীক্ষা আর মাত্র এক মাস পরেই। আরেকটা কারণ হলো, আম্মু বাসায় নেই। উনি বাসায় থাকলেই বোটকা গন্ধটা মারাত্মক নাকে লাগে। খেতে গেলে বমি চলে আসে। কলিংবেলের আওয়াজ শুনে দ্রুত জগ থেকে গ্লাসে পানি ঢালি। তাড়াতাড়ি খেতে গিয়ে কাশি চলে আসে। বুয়া দরজা খোলার সঙ্গে-সঙ্গে বাইরের এক ঝলক হাওয়ার সঙ্গে বোটকা গন্ধটা নাকে এসে ধাক্কা দেয়। আমার গা গুলাতে থাকে। দ্রুত বেসিনে গিয়ে বমি আটকানোর জন্য কুলি করতে থাকি।

'আমার কলিজা-সোনা কী করছে? খেয়েছ, মা?' অনুভূতিকে কোলে নিয়ে আদর করেন আম্মু।

আমার আম্মু বেশ লম্বা ও চওড়া। অনেকটা পুরুষালি ধরনের। ওঁর বিশাল শরীরের সঙ্গে লিকলিকে অনুভূতি পারলে সারাদিন লেপ্টে থাকে। এটা প্রতিদিনের চিত্র। আম্মু বাসায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতি মাকে গিয়ে জড়িয়ে ধরবেই। এমনিতে বাসার কোন ব্যাপারে ওর মধ্যে কোন আগ্রহ দেখা যায় না। আব্বু বা আমি সামনে দিয়ে হাজার বার হেঁটে গেলেও অনুভূতি ফিরে তাকায় না। আর মাকে পেলে এমন খুশি হয় যে বলার মত না। ও কি বোটকা গন্ধটা পায় না? হয়তো ওই গন্ধটাই ওর খুব ভাল লাগে।

যেহেতু অনুভূতি কথা বলতে পারে না, তাই ওর মনের অনুভূতি জানার সুযোগ আমাদের হয় না।

ছোটবেলা থেকে আমার এই দূরে-দূরে থাকার কারণে আম্মুর সঙ্গে আমার স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। আমি যে তাঁকে পছন্দ করি না, উনি সেটা খুব ভালভাবেই বোঝেন। আমার সঙ্গে আম্মুর সম্পর্কটা তাই শুধু দায়িত্ব-কর্তব্যের।

'স্পর্শ, তোমাকে কোচিং সেন্টারে দিয়ে আসতে হবে?' আম্মু টেবিলে বসে গ্লাসে পানি ঢালতে-ঢালতে জানতে চান।

আমি মাথা নেড়ে না বলি। আমার স্কুল ব্যাগে থাকা বডি স্প্রেটা বের করে সারা গায়ে মাখি।

জানি না আম্মু বিষয়টা খেয়াল করেন কি না!

'তা হলে কীভাবে যাবে? নওরীনের সঙ্গে?' আম্মু জানতে চান।

আমি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলি।

'কী ব্যাপার, তোমার মুখে কী হয়েছে? মুখে কথা বলতে পারো না। স্কুলে পড়াশোনা করে এই শিখেছ? কীভাবে গুরুজনের সঙ্গে কথা বলতে হয় জানো না?' রেগে গিয়ে আম্মু একের পর এক প্রশ্নবাণ ছুঁড়তে থাকেন। নওরীন এসে আমাকে বাঁচিয়ে দেয়। কলিংবেলের আওয়াজ শুনে আমি দ্রুত গিয়ে দরজা খুলি।

'কীরে, রেডি?' নওরীন দরজার বাইরে থেকে জানতে চায়।

আমি হ্যাঁ সূচক মাথা নেড়ে দ্রুত ঘরে ঢুকি ব্যাগ নেবার জন্য। ও ঘরের দরজায় পা রেখে আম্মাকে সালাম দেয়। অনুভূতির দিকে তাকিয়ে হাসে। অনুভূতির মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। আমি চলে যাবার মুহূর্তে নিরাবেগ তাকিয়ে থাকে অনুভূতি। অথচ আম্মু ওর চোখের সামনে কোথাও গেলে কেঁদেকেটে মূর্ছা যাবার মত অবস্থা হয় ওর।

নওরীনদের গাড়ির নরম সিটে পুরো শরীর এলিয়ে দিয়ে বড় করে শ্বাস নিই। চোখের কোনা দিয়ে দেখি নওরীন আমাকে লক্ষ করছে কি না। না, ও মোবাইলের স্ক্রিনে আরেকটা কিছু দেখছে। ফেসবুক হয়তো। ও কয়েক মাস হলো ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট খুলেছে। নতুন-নতুন তো, তাই সারাক্ষণ বুঁদ হয়ে থাকে। আমি এখনও খুলিনি। আমার পীরের মুরীদ বাবার কড়া নিষেধ এ ব্যাপারে। ক্লাস এইটের ছাত্রী হয়েও খুব সস্তার

একটা মোবাইল ব্যবহার করি আমি। ইন্টারনেটের কোন বালাই নেই। বাসায় কম্পিউটার থাকলেও তাতে ইন্টারনেট কানেকশন দেয়া নেই। তবে কম্পিউটারে সুযোগ পেলেই ভিডিও গেমস খেলি। আম্মু-আব্বু বাইরে গেলেই গেমস খেলি আমি। ঠিক এই সময়টা অনুভূতি আমার খুব কাছে এসে দাঁড়ায়। এমনিতে ও আমাকে তেমন পছন্দ করে না। কিন্তু ভিডিও গেমস খেলার সময় পারলে আমার কোলে চড়ে বসে। মাঝে মাঝে আমি খেলা বন্ধ করতে চাইলে অনুভূতি আমাকে আরও খেলার জন্য জোরাজুরি করে।

আম্মু-আব্বু দু'জনেই আমার চেয়ে অনুভূতিকে বেশি আদর করেন। এ নিয়ে আমার অবশ্য কোন অভিযোগ নেই। ওর মত অস্বাভাবিক শিশুর প্রতি বাবা-মায়ের বেশি টান থাকবেই। কিন্তু আমার খুব রাগ লাগে মাঝেমধ্যে, অনুভূতি কেন আমাকে দেখতে পারে না! আমি তো ভাল কোন খাবার বা কিছু পেলেই আগে ওর সঙ্গে শেয়ার করি। তবে কেন ও এমন করে?

'কীরে, কী ভাবছিস? রাইয়াদের কথা?' নওরীন আমাকে চুপ থাকতে দেখে প্রশ্ন করে।

'ধ্যাৎ! রাইয়াদের কথা ভাবব কেন? আমার না তোদের মত এই লাভ-রোমান্স নিয়ে আলোচনা করতে একদম ভাল লাগে না।' আমি মুখ বাঁকিয়ে উত্তর দিই।

রাইয়াদ আমাদের কোচিঙের এক ছাত্র। টেনে পড়ছে। দুই দিন আগে সে নওরীনকে বলেছে, ও আমার জন্য পাগল। শুনে আমার এমন হাসি পেয়েছে যে বলার মত না। আমি এমন কী যে ও পাগল হতে যাবে? রাইয়াদের কথা ওঠায় আবার হাসি পেল। মনটা বেশ ফুরফুরে হলো তাতে।

'তোর কী ভাল লাগে রে? ভিডিও গেমস খেলতে? তুই না আসলে জটিল একটা ক্যারেক্টার।' নওরীন মন্তব্য করে।

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস। দে না, দোস্ত, তোর মোবাইলটা। একটু ভিডিও গেমস খেলি। দে না...'

নওরীনের দামি মোবাইলে অনেক ভিডিও গেমস আছে, আমারটায় কিছুই নেই।

'আমি এখন অনলাইনে বিপুর সঙ্গে চ্যাট করছি। মোবাইল দেয়া যাবে না।' নওরীন উত্তর দেয়।

আমি ঝুঁকে ওদের কনভারসেশন দেখি। নওরীন শুধু ওর বয়ফ্রেণ্ড বিপু না, আরও কয়েকজনের সঙ্গে চ্যাটিং করছে। বুঝলাম-এখন আর কোনভাবে মোবাইল পাওয়া সম্ভব নয়।

'আচ্ছা, নওরীন, তোকে একটা প্রশ্ন করি?' প্রশ্নটা করার আগে সামান্য প্রস্তুতি নিই আমি।

'কী প্রশ্ন বল?' আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে নওরীন।

'না, মানে তুই যে আজ আমাদের বাসায় গেলি, কোন বিশ্রী স্মেল পেয়েছিস?' আমি জানতে চাই।

'কীসের স্মেল?' আরও অবাক হয় নওরীন।

'না, মানে খুব জঘন্য বোটকা একটা গন্ধ।' আমি ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করি।

'না তো। কোন গন্ধ তো পাইনি। কেন এটা জিজ্ঞেস করলি?' মোবাইল রেখে নওরীনের সমস্ত মনোযোগ এখন আমার দিকে।

'এমনি জিজ্ঞেস করলাম। চ্যাটিং থেকে তোর মনোযোগ সরিয়ে আনার জন্য,' বলেই হাসতে শুরু করি।

মনে-মনে বেশ স্বস্তি বোধ করি। আবারও নিশ্চিন্ত হলাম, ওই বিশ্রী লাশের গন্ধটা শুধু আমি একাই পাই। আর কেউ পায় না।

বাসায় ফিরতে ইচ্ছা করে না। তবু ফিরতে হয়। বাসায় ফিরেই বুয়ার কাছে জানতে পারি, আম্মু বাসায় নেই। দ্রুত টেবিলে রাখা ভাত খেয়ে ফেলি। বুয়া কথা শোনায়। বাইরে থেকে ফিরে কেন কাপড় না পাল্টে, হাত-মুখ না ধুয়ে খাচ্ছি আমি? আম্মুকে নালিশ করার হুমকি দেয়। আমি জানি বুয়া এই কাজ করবে না। আর করলেও খুব বেশি কাজ হবে না। সামনে পরীক্ষা বলে আম্মু আমাকে বকাবকি অনেক কমিয়ে

দিয়েছেন।

ছাত্রী হিসেবে আমি ভালই। যার বাবা সারা বছর পীরের আখড়ায় পড়ে থাকে আর মা সমাজসেবা করে বেড়ায়, তাদের সন্তান হয়ে আমার উচ্ছন্নে যাবার কথা ছিল! তা না হয়ে আমি নিয়মিত ক্লাসে প্রেস করছি, এজন্য আব্বু-আম্মু আমার ওপর বেশ সন্তুষ্ট। মুখে না বললেও আমি ওঁদের মুখ দেখে বুঝতে পারি। যদিও তাঁদের সব ভালবাসা অনুভূতির জন্য।

সন্ধ্যা নামতেই সবাই বাসায় চলে আসে। অনুভূতিকে নিয়ে আম্মু পাড়া বেড়াতে গিয়েছিলেন। তিনি বাসায় ফিরে মাগরেবের নামাজ পড়ে রান্নাঘরে ঢোকেন। বুঝতে পারি আজ রাতে আব্বু আসছে।

অনুভূতিকে লিভিংরুমে রেখে টিভি ছেড়ে দিয়ে আম্মু কাজ করতে থাকেন। আর আমি পড়াশোনায় ডুবে যাই। তবে একটা দুর্ভাবনা মাঝেমধ্যে ভাবিয়ে তোলে। আব্বু এলে সবাই মিলে ডাইনিং টেবিলে একসঙ্গে খেতে বসতে হবে। খাবার টেবিলে আম্মু থাকবে। আর সেই সঙ্গে বিশ্রী আঁষটে গন্ধ। পড়তে-পড়তে ঘুমিয়ে পড়লে কেমন হয়? না, আব্বু আসছেন। উনি যেভাবে হোক আমাকে তুলে খাওয়াবেনই। পথে আসার সময় দুই বোনের জন্য কী কিনে এনেছেন তাই দেখাবেন। অনুভূতির এ নিয়ে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া নেই। উচ্ছ্বসিত প্রতিক্রিয়া দেখাতে হবে আমাকেই।

যা আশঙ্কা করেছিলাম, ঠিক তাই হলো।

'ময়নার লাশের গোসল করাতে গিয়ে আমার যে খারাপ লেগেছে বলার মত না।' খাবার টেবিলে বসতেই আম্মুর কথা কানে আসে। সারা ঘরে লাশের গন্ধ। খেতে বসেছি, সেখানেও লাশের গল্প। চারদিকে কেবল লাশ আর লাশ। আর যেন কোন গল্প নেই।

'ইস, ময়না মেয়েটা এভাবে মারা গেল! আল্লাহ ওকে বেহেস্ত নসিব করুক।' আব্বু ভাত নিতে-নিতে বললেন।

'আল্লাহ মেয়েটাকে কোন সুখের স্বাদ দিল না, বেহেস্তে তো নেবেই।' আম্মুর খেদ।

দু'দিন আগে আম্মুর পাতানো কন্যা ময়না মারা গেছেন। এইরকম কন্যা আম্মুর আরও কয়েকজন আছে। আমি তাদের কাউকে সহ্য করতে পারি না। তবে ময়না আপা মানুষ হিসেবে বেশ ভাল ছিলেন। স্কুলে চাকরি করতেন। সকাল বেলা স্কুলে যাবার সময় রেললাইন পার হতে গিয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে মারা যান। খুব স্বাভাবিকভাবে ময়নার লাশের গোসল আম্মুকেই করাতে হয়।

'জামান কাঁদে নাই ময়নার জন্য?' আব্বু জানতে চান।

'এখন আর কেঁদে কী লাভ? বিয়ের পরে তো এক মুহূর্ত শান্তি দেয়নি। বাপের বাড়ি থেকে এটা দাও, ওটা আনো, জামানের একার দোষ দিয়েও লাভ নেই। ওর মা তো একটা খাণ্ডারনি। এত লালচ! এবার মেয়েটা মরে ওদের শান্তি দিয়ে গেছে।' আম্মু কথা বলার ফাঁকে আবার অনুভূতিকে খাওয়াচ্ছেন। সে হাতে একটা খেলনা নিয়ে অন্যমনস্কভাবে খেয়ে যাচ্ছে।

অনুভূতির খাওয়া শেষ হলে আম্মু ওর প্লেটেই খেয়ে নেবেন। আব্বু ভর্তা দিয়ে শুরু করেছেন। তারপর রুই মাছের ঝোল, কই মাছের দোপেঁয়াজা, এরপর মুরগীর মাংস, সঙ্গে সালাদ...সব শেষে আম-দুধ দিয়ে আয়েশ করে ভাত খাবেন। কাজ-কামহীন বেকার লোকদের খাওয়া-দাওয়া হয় রাজকীয়। আমার দাদা এই বাড়িটা বাবাকে দিয়ে না গেলে ওঁর ভিক্ষা করে খেতে হত। বাপের দেয়া বাড়ি ভাড়ার টাকা দিয়েই এমন ভূরিভোজ।

এদিকে লাশের গন্ধে আমার গলা দিয়েই খাবার নামে না। ডাল দিয়ে ভাত মাখিয়ে চলেছি, খেতে পারছি না। ময়না আপার লাশ দাফনের গল্পে মশগুল আব্বু-আম্মুর আমার দিকে চোখ পড়ে না।

'ট্রেন এসে মেয়েটাকে তিন টুকরো করে দিয়েছিল। কী যে কষ্ট হয়েছে লাশটাকে গোসল করাতে। টেপ দিয়ে কোনমতে শরীর জোড়া দিয়েছি। বার-বার খুলে যাচ্ছিল। ওজু করাতে গিয়ে দুইজন ধরে রাখতে হয়েছে। তারপরেও

আল্লাহর রহমতে সব কিছু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দিয়েছি।' আম্মু গল্প শেষ করেন।

সব কিছু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নের কথায় আমার বমি ভাব আবার বেড়ে যায়। দ্রুত প্লেট হাতে নিয়ে ছুটে যাই রান্নাঘরে। প্লেট ধোয়ার কলের নিচেই বমি করি। বুয়া অবাক হয় না, কারণ এই ঘটনা আমি প্রায়ই করি। তার ধারণা আমার জণ্ডিস আছে। তাই খাওয়ায় রুচি নেই। এই কথাটা সে আম্মাকে অনেক বার বলেছেও।

ডাইনিংরুমে এসে দেখি তখনও লাশের গল্প চলছে। আজ সকালে পাশের ফ্ল্যাটের যে বয়স্ক মহিলা মারা গেছেন, তার কাহিনি চলছে এখন।

আমাকে দেখে আব্বু বলেন, 'কীরে, খাওয়া শেষ হয়ে গেল?'

'হুম' জাতীয় একটা উত্তর দিয়ে আমি নিজের রুমে ঢুকে যাই। ভাব দেখাই আমার এখন প্রচণ্ড পড়াশোনার চাপ। আব্বু একটু পরে শনপাপড়ি আর চানাচুরের একটা প্যাকেট নিয়ে আমার কাছে আসেন। ফরিদপুর থেকে আসার সময় ফেরিতে কিনেছেন।

'থ্যাংকস, আব্বু!' কথাটা বলে ওঁকে আমি হালকাভাবে জড়িয়ে ধরি। আসলেই খুব ভালো লাগে। ভালমত খাওয়া হয়নি বলে জানি একটু পরে খুব খিদে লাগবে। তখন দরজা লাগিয়ে এসব খাওয়া যাবে।

আম্মু আমাকে এসব বাইরের খাবার খেতে দিতে চান না। আবার অনুভূতি আবদার করলে না করেন না।

আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আব্বু অনুভূতিকে ডাকা শুরু করেন। 'আমার সোনামণি মা, কলিজার টুকরা কোথায় গেল? দেখি নতুন কী শিখেছ?' অনুভূতি নতুন কিছু শেখেনি। তবে ও যেটা ভাল পারে সেটা হলো আব্বুর বুকের মধ্যে চুপ করে শুয়ে থাকতে। আব্বু এভাবে অনুভূতিকে নিয়ে অনেকক্ষণ শুয়ে থাকবেন আর মেয়ের সুস্থতার জন্য দোয়া দরুদ পড়বেন।

আব্বু-আম্মুর দু'জনেরই অনুভূতির প্রতি এত বেশিরকম ভালবাসাটা আমার কাছে অসহ্য লাগে। এই পুরো বাড়িটাই আমার কাছে অসহ্য মনে হয়

আজ খুব ভোরে অনুভূতি মারা গেছে। আমি তখন ঘুমিয়ে ছিলাম। রাত জেগে পড়ার জন্য ঘুমোতে দেরি হয়ে যায়। ডাইনিংরুমের লম্বা প্যাসেজে ম্যাটের ওপর অনুভূতিকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। অনুভূতির মৃত্যু কীভাবে হলো আমি বুঝতে পারছি না। জন্মের পর থেকেই ওর নানা ধরনের সমস্যা ছিল। তার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক ছিল খিচুনি। আমি মৃত্যুর কারণ জানতে আব্বু-আম্মুকে খুঁজতে থাকি। আব্বুর কান্না কানে আসে। খুব চিৎকার করে উনি কাঁদছেন না। মানুষের মৃত্যুতে উচ্চশব্দে কান্নাকাটি করার বিষয়ে ওঁর পীরের নিষেধ আছে। তবে আব্বুর গুমরে-গুমরে কান্না আমার চোখে পড়ে। এবং হঠাৎ করে আবিষ্কার করি যে আমার ভালও লাগছে। এবার মনে হয়, দুই মেয়ের মধ্যে তাঁর এই পক্ষপাতের শাস্তি তিনি পেয়ে গেছেন।

আমার প্রধান প্রতিপক্ষকে কেন যে কোথাও দেখছি না, উনি কি মেয়ের লাশের গোসলের জন্য জোগাড়-যন্তর করছেন? আমার শৈশব, আমার কৈশোরকে একটা বোটকা গন্ধ দিয়ে আচ্ছন্ন করে রেখেছেন যে মানুষটি, তিনি আমার আম্মু। আমার জন্মদাত্রী। সারাদিন লাশের সঙ্গে যাঁর বসবাস। আশপাশে কোন মেয়ে বা মহিলা মারা গেলে যিনি বিকৃত আনন্দ পান। লাশের গোসল করানোর জন্য যিনি সব ফেলে ছুটে যান। আর ফেরেন একরাশ বীভৎস গন্ধ নিয়ে।

নিজের প্রিয় কন্যার লাশের গোসল কীভাবে করান আম্মু, আমার জানতে ইচ্ছা হয়। তখন হঠাৎ করে চোখে পড়েনি। ওই তো অনুভূতির লাশের পাশেই বসে আছেন আম্মু। স্তব্ধ, পাথরের মত। মনে হয় তাঁর আত্মাও যেন চলে গেছে অনুভূতির সঙ্গে! আম্মুর ফ্যাকাসে চেহারা রক্তশূন্য হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে তিনিও যেন একটা লাশ। তাঁর শরীরের বীভৎস পচা গন্ধ আরও মারাত্মক হয়ে ছড়াচ্ছে সারা ঘর জুড়ে।

ভয়ঙ্কর এই গন্ধের জন্য আমি বহুবার আম্মুর মৃত্যু চেয়েছি। এবার মনে হচ্ছে আরও বড় জয় আমার হয়েছে।

মৃত্যুর চেয়ে বড় শাস্তি আম্মু পেয়ে গেছেন। ■

জলবিভাজিকা

যে উঁচু ভূমি বিভিন্ন নদী শাসিত এলাকাকে পৃথক করে তাকে জলবিভাজিকা বলে। আল্পীয় অঞ্চল ইউরোপের প্রধান জলবিভাজিকা। এই জলবিভাজিকা হতে মিউজ, রাইন উত্তর দিকে এবং রোন, পো, প্রভৃতি নদী দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে।

চ্যাপরাল

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু প্রভাবিত অঞ্চলের এক প্রকার কাঁটাঝোপ অরণ্য। এই অরণ্য খরা সহিষ্ণু এবং এখানকার গাছপালা শুষ্ক মাটিতে বাঁচতে পারে। ফাঁকা-ফাঁকা এ কাঁটাঝোপগুলো ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

ফ্লোর লিডার

ফ্লোর লিডার বলতে এমন একজন নেতাকে বোঝায় যাঁকে আইন পরিষদে তাঁর দলকে নেতৃত্ব দেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তিনি আইন পরিষদে দলীয় শৃঙ্খলা ও ঐক্য বজায় রাখেন, দলীয় কর্মসূচী বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেন এবং পরিষদের ভিতরে দলের কে কখন কথা বলবেন তা নির্দেশ করেন। এগুলোই প্রধানত ফ্লোর লিডারের কাজ। ■

সংগ্রহে: শাহরীন সোনিয়া

জহির বুক হাউস
নিউ মার্কেট প্রথম গেট, ঢাকা।
ইস্টার্ন মল্লিকা, ২/৯৬-এ।
এখানে সেবা প্রকাশনী ও প্রজাপতি প্রকাশনের নতুন ও সমস্ত রিপ্রিন্ট বই পাওয়া যায়।
মোবাইল: ০১৭১৫-৩৫২৪৭১

বসতি

স্নিগ্ধা আফসানা রোশনী

বেশ কিছুদিন ধরে এই সমস্যা শুরু হয়েছে। ঘুমানোর জন্য চোখ বন্ধ করলেই মনে হয় মুখের উপর হাজার-হাজার পোকা-মাকড় হাঁটাহাঁটি শুরু করে।

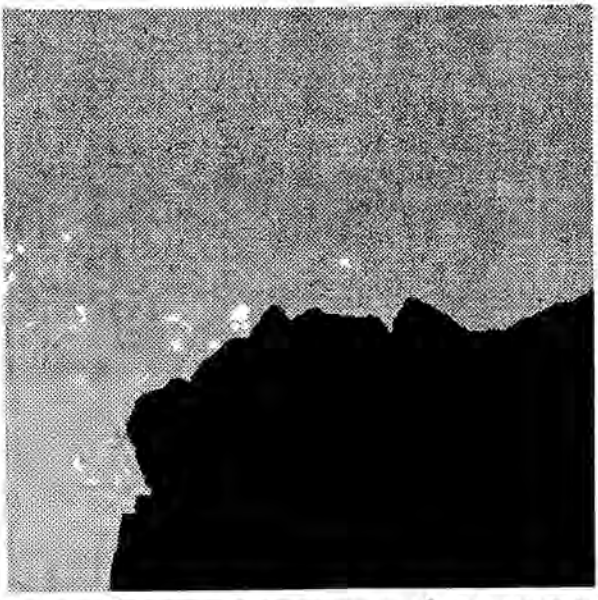

রাতে ঠিকঠাক ঘুম না হলে পরের দিন স্বপনের খুব খারাপ যায়। সারাদিন মেজাজ খারাপ থাকে। কাজ-কর্মে মন বসে না। দিনের বেলা ঘুমানোর চেষ্টা করে দেখেছে সে। লাভ হয় না। ঘুম-ঘুম একটা ভাব ঠিকই হয়, কিন্তু ঘুম আর হয় না। শূন্য দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে থাকা ছাড়া তার আর কিছুই করার থাকে না। তাকিয়ে থেকে যে বিশেষ কিছু দেখে, তা না, সে একটা ঘোরের মধ্যে থাকে।

রাতে ঘুমানোর জন্য অনেক কিছুই সে করেছে। বিছানার চাদর বদলে পরিষ্কার নতুন চাদর পেতেছে। নিউ মার্কেট থেকে অরিজিনাল শিমুল তুলার বালিশ ডাবল দাম দিয়ে কিনে এনেছে। স্বপনের আগের বালিশগুলো ছিল শক্ত। একসময় এই বালিশে মাথা রেখেই তার চমৎকার ঘুম হয়েছে। এখন কেন হচ্ছে না কে জানে। বালিশগুলোকে তার একেকটা ইটের টুকরো মনে হতে থাকে। মাথায় বালিশ দিয়ে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয়া যায় এমন। তার ধারণা এই ইটের টুকরোগুলোর কারণে তার ঘুম হয় না। কাজেই সে নতুন বালিশ কিনে এনেছে।

নতুন চাদর-বালিশে মাথা রেখে স্বপন ঘুমানোর চেষ্টা করল। একটা ঘোরের মত তৈরি হলো, আবার কেটেও গেল। আর ঘুমের দেখা নেই। স্বপন সারারাত বারান্দায় এমাথা-ওমাথা হাঁটাহাঁটি

করে কাটিয়ে দিল।

সেদিন টিভিতে কী একটা তেলের বিজ্ঞাপন দেখাচ্ছিল। কদুর তেল সম্ভবত। লম্বা চুলের এক মেয়ে নাকী সুরে তেলের সুনাম করে যাচ্ছে। তেল মাথায় মাখো, নিশ্চিন্তে ঘুমাও।

স্বপন ঠিক করল সে এই তেল কিনবে। খুঁজে পেতে এক দোকানে পেয়েও গেল। তেল কেনার সময় সে খানিকটা চিন্তায় পড়ে গেল। এই তেল কি ছেলে-মেয়ে সবাই ব্যবহার করতে পারবে? বিজ্ঞাপনে তো শুধু মেয়ে দেখিয়েছে। দোকানদার অবশ্যি দাঁত বের করে বলেছে, 'নিয়ে যান, স্যর, জব্বর ঘুম হবে,' বলে চোখ টিপে দিয়েছে। চোখ টিপে সে কী বোঝাতে চেয়েছে কে জানে! তা নিয়ে স্বপন মাথা ঘামাচ্ছে না। তার ঘুম হওয়া নিয়ে কথা।

রাতে বাসায় ফিরে সাবান দিয়ে খুব ভাল করে গোসল করল সে। গোসল করলে নাকি ঘুম ভাল হয়। মাথা মুছে জবজবে করে কদুর তেল দিয়ে সে বিছানায় সটান হলো।

আহ্, তেলটা তো খুব কাজের, বিজ্ঞাপনের মেয়েটা তাহলে মিথ্যা বলেনি। বিজ্ঞাপনের গালভরা কথা শুনে সে আগেও ঠক খেয়েছে। এবার একটু চিন্তায় ছিল। যাক, চিন্তার কিছু নেই তাহলে।

মাথাটা বেশ হালকা লাগছে ওর। আরামে চোখ বন্ধ করল স্বপন।

চোখ বুজেই আবার খুলে ফেলল ও। বিছানায় উঠে বসল। তেলে কিছু হবে না, বুঝে গেছে সে। দারুণ হতাশ ও। বেশ কিছুদিন ধরে এই সমস্যা শুরু হয়েছে। ঘুমানোর জন্য চোখ বন্ধ করলেই মনে হয় মুখের উপর হাজার-হাজার পোকা-মাকড় হাঁটাহাঁটি শুরু করে। পিলপিলে, ভেজা পায়ে। হেঁটেই তারা ক্ষান্ত হয় না। মাঝে-মাঝে কুটুস করে কামড়ও বসিয়ে দেয়। সে কী কামড়! মুখ জ্বলে যায় এমন অবস্থা!

ঘুম ভেঙে যায়, স্বপন লাফ দিয়ে উঠে বসে। কোথায় পোকা, কীসের কী! কোথাও কিছু নেই।

একদিন-দু'দিন-তিনদিন। সপ্তাহ, মাস পার হয়ে যাচ্ছে, স্বপন এই অদৃশ্য পোকা-মাকড়ের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে না। চোখের নিচে গাঢ় হয়ে কালি জমেছে। একরাত না ঘুমালেই তার কালি পড়ে, সেখানে কতগুলো রাত পেরিয়ে গেল না ঘুমিয়ে। কাউকে বলবে কি না সেটাও বুঝতে পারছে না। বললে নিশ্চিত হাসবে সবাই। হাসার ব্যাপার হলে লোকে তো চুপ থাকবে না। তাদের দাঁত আছে, হেসে তারা দাঁত দেখাবেই। আর ঘটনা যা ঘটেছে তা তো হাসার মতই। কোথাও কিছু নেই, সে পোকা-পোকা করে বেড়াচ্ছে।

অদৃশ্য পোকার কুটুস কামড়ে ঘুম ভাঙে স্বপনের। সে বাথরুমে গিয়ে চোখে-মুখে পানির ঝাপটা দেয়। তাতে জ্বলুনি কমে না। ঘরে এসে ক্রিম ঘষে গালে-মুখে। এতে একটু আরাম লাগে তার!

স্বপন কিছুতেই বুঝতে পারছে না এই অশুভ সমস্যার সমাধান কী? সে কি পাগল হয়ে যাচ্ছে? বংশে পাগল থাকলে নাকি পরিবারের অন্য কেউ পাগল হতে পারে। স্বপনদের বংশে পাগল হওয়ার ঘটনা আছে। তার নিজের বাবাই পাগল ছিলেন। ভাল মানুষ টাইপ, বাইরে থেকে বোঝা যায় না। মাঝে-মাঝে সেই ভাল মানুষ তাদের সবাইকে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে কামড় দিতে আসতেন। অনেকদিন পর মৃত বাবার কথা মনে করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

কাউকে ঘটনা বলবে না বলবে না করেও স্বপন তার বন্ধুকে খুলে বলল। মানিক তার একদম ছেলেবেলার বন্ধু। তার কাছে স্বপনের লুকানোর কিছু নেই।

ঘটনা মন দিয়ে শুনল মানিক, বন্ধুকে মনের রোগে ধরেছে এটা সে পরিষ্কার বুঝতে পারছে। একা থাকলে মানুষের অদ্ভুত-অদ্ভুত মনের রোগ হয়। বিয়ে দেয়া দরকার স্বপনের। যাই হোক, তা পরে দেখা যাবে। আপাতত বন্ধুকে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিল মানিক সে নিজেও সাথে যেত, কিন্তু জরুরী কাজ পড়ে গেছে তার। বন্ধুর মলিন মুখটার দিকে তাকিয়ে মায়া লাগছে ওর!

শেষমেশ পাগলের ডাক্তার! মানিক ছাড়া

আর কেউ এটা নিয়ে পরামর্শ দিলে স্বপন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠত। মানিক তার খারাপ চায় না ও জানে। তবুও তার এই ব্যাপারটা ঠিক ভাল লাগছে না। সাইকিয়াট্রিস্টকে তার পাগলের ডাক্তার ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। তার বাবার অসুখের সময় এমন মোড়ে-মোড়ে ডাক্তার ছিল না। থাকলে খারাপ হত না। একজনকে দেখিয়ে বাবার চিকিৎসা করানো যেত।

এক সন্ধ্যায় ডাক্তারের চেম্বারের উদ্দেশে রওনা হলো স্বপন। ঘণ্টাখানেক বিরস মুখের এক ডাক্তারের সামনের চেয়ারে বসে লেকচার শুনে সে বাড়ি ফিরল। হাতে একগাদা ওষুধ। ডাক্তার ব্যাটা লিখে দিয়েছে। কথাবার্তা নেই কিছু না, খসখস করে দুনিয়ার ওষুধ ধরিয়ে দিয়েছে। আরে, বাবা, মনের ব্যাপার কি আর ওষুধে সারে! তাহলে জগতের সব মানুষ ওষুধ খেতে থাকত, মনের দুঃখ সারিয়ে নিত! এ ব্যাটা কেমন ডাক্তার বোঝাই যাচ্ছে।

এক মাসে এতগুলো টাকার ওষুধ! মনের রোগ নাকি দামী রোগ। দামী রোগের দামী ওষুধ। টাকা-পয়সা খরচ করতে স্বপনের তেমন ভাল্লাগে না। অবশ্যি টাকা তার আছে। ছোটবেলায় তাদের টাকা ছিল না। সেই থেকে তার মনে টাকার খিদে। যেভাবেই হোক তার টাকা চাই!

তার ইচ্ছা পূরণ হয়েছে। যেভাবে পেরেছে দু'হাতে টাকা কামিয়েছে। গত কয়েক বছরে বেশ কয়েক লাখ টাকার মালিক হয়েছে সে। নতুন-নতুন লাইনে কাজ করে সে। এই লাইনটা ভাল টাকা কামানোর জন্য। কাঁচা পয়সা আসছে বেশ। লেগে থাকতে পারলেই হবে। কোটিপতি হওয়ার স্বপ্ন তার।

সেসব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা পরে করা যাবে। আগে জীবন তো বাঁচানো চাই। এই পোকা-মাকড় তাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। বাবার মত পুরো পাগল হওয়ার আগেই। তার বাবাও অদৃশ্য কী যেন দেখতেন। দু'হাত দিয়ে সেগুলো তাড়ানোর বৃথা চেষ্টা করতেন।

স্বপনের হাতে নীল রঙের দুটো ট্যাবলেট। ঘুমের ওষুধ। ডাক্তার বলেছে রাতে খাওয়ার পর এ দুটো খেতে। হাই-পাওয়ারের এ ওষুধে নাকি চমৎকার ঘুম হয়। স্বপন আশায় বুক বাঁধল।

রাতের খাবার খাওয়া শেষ হতেই ট্যাবলেট দুটো গিলে ফেলল স্বপন। পানি ছাড়াই। তার আর তর সইছে না। ভেতো ওষুধে তার মুখ সামান্য বিকৃতও হলো না। সে ঘুমোতে চায়। একবার ঘুমোতে পারলে পোকা-মাকড় কই যাবে!

'খোকা?'

স্বপন চমকে চোখ মেলল। বাসায় তো সে একা থাকে। এখানে তাকে কে ডাকবে! তার নাম যে খোকা এটাও সে ভুলতে বসেছিল। একমাত্র বাবাই তাকে 'খোকা' ডাকতেন!

'বাবা, আপনি এখানে কী করেন?'

'তোর ঘুম হয় না রে, বাপধন?'

স্বপন দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সে কি ঘুমিয়ে পড়েছে? ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে? স্বপ্নে আবার দীর্ঘশ্বাসও ফেলছে। সেটা খারাপ না। পোকা-মাকড়ের কামড় খাওয়ার চেয়ে বাবার কথা শোনা অনেক ভাল।

'এখন ঘুমিয়ে আছি মনে হয়, বাবা, তা না হলে আপনি কেমন করে কথা বলছেন?'

বাবা মাথা চুলকালেন।

'হ্যাঁ, এটা ভুল বলিসনি, বাপ। স্বপ্নেই এসেছি মনে হয়।'

'আচ্ছা, বাবা, আপনি এখন যান। আমি অনেকদিন ঘুমাতে পারছি না। এখন আরাম করে ঘুমাব।'

'কিন্তু, বাপধন, তুই তো ঘুমাতে পারবি না।'

স্বপনের রাগ লাগছে। এত দামী, হাই-পাওয়ারের ওষুধ খেয়ে সে ঘুমাচ্ছে। স্বপ্ন দেখছে। আর বাবা কী যে বলেন। মরার পরেও পাগলামি গেল না মানুষটার।

'আব্বা, বিরক্ত কইরেন না আর!'

'চোরা লাইনে কাজ করা ছেড়ে দে, বাপ।'

চমকে গেল স্বপন।

'এসব আপনি জানলেন কেমন করে?'

'সব জানি রে, বাপ। এসব ভাল না। ছেড়ে দে, বাপ আমার। দেখবি কত ভাল ঘুম হবে।'

'ঘুম এমনিও ভাল হবে, অমনিও ভাল হবে। ওসব মনের ভুল ছিল। রোগ সারিয়েছি।'

'লোভে লাভ হয় না, খোকা। লোভে সবাই ধ্বংস হয়।'

'আপনি তো সারাজীবনে লোভ করেননি। আপনি কী করেছেন জীবনে? পাগল হয়ে শেষ হয়েছেন!'

বাবার মুখটা কেমন কালো দেখাল। স্বপন মুখ ঘুরিয়ে নিল। স্বপ্নে আর কথা বলতে ইচ্ছা করছে না।

'এই পথ থেকে সরে না গেলে এই পোকারা তোকে বাঁচতে দেবে না। বাপধন, ফিরে আয়, বাপ। এখনও সময় আছে।'

স্বপন জোর করে চোখ মেলল। বাবা নেই। পুরো ঘর ফাঁকা। ডিমলাইটের নীলচে আলোতে সব কেমন যেন রহস্যময় লাগছে। প্রচণ্ড তৃষ্ণা পাচ্ছে স্বপনের। বিছানার পাশের ছোট্ট টেবিলটায় রাখা পানির গ্লাস খালি। সে নিজেই রাতে পানি ভরে রেখেছে। কখন খেয়েছে সে পানি? মনে পড়ছে না। তার মাথা ঝিমঝিম করছে।

নীল ট্যাবলেট এখন দুটোর বদলে তিনটে করে খায় স্বপন। চোখ বুজলেই পোকারা হাজির। বাবার মলিন মুখটাও চোখে ভাসে। বাবা কেমন করুণ গলায় বলেছেন, 'এই কাজ করিস না, বাপ। বাঁচতে পারবি না।'

ওষুধের বাক্সটা খুঁজে সব ক'টা ট্যাবলেট হাতে নিল ও। ঘুমের জন্য শরীর আঁকুপাঁকু করছে। সে শান্তিতে ঘুমোতে চায়। সামান্য পোকার কাছে সে হারবে না।

নতুন চাদর, বালিশে মাথা দিয়ে স্বপন ঘুমিয়ে আছে। কতদিন পর কে জানে! তাঁর শরীর শীতল হতে শুরু করেছে। পোকাগুলোর মন আজ বড্ড খারাপ। তারা শরীরময় ছড়িয়ে পড়েছে। পিলপিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটু পরেই এই শরীর ছেড়ে দিতে হবে। নতুন বসতি খুঁজতে হবে। তাদের মন বড় খারাপ। ■

প্রকাশিত হয়েছে
মাসুদ রানা
মাস্টারমাইণ্ড
কাজী আনোয়ার হোসেন
সহযোগী
কাজী মায়মুর হোসেন

কিডন্যাপড্ বাঙালি প্রত্নতাত্ত্বিক ডক্টর লাবনী আলমকে ফেরত চাইলে অমূল্য স্টাডা কোডেক্স লুঠ করতে হবে ইউএন-এর দুর্গম ভল্ট থেকে! তাই করল রানা! লাবনী ভারতে বন্দি জেনে চলল ওখানেই। দর্শকভরা স্টেডিয়ামে ওকে খুন করবে ভারতীয় কোটিপতি, নাকি নিরস্ত্র অবস্থায় ছেড়ে দেবে ক্ষুধার্ত বাঘের অভয়ারণ্যে? বহু কষ্টে মেয়েটিকে উদ্ধার করে পৌঁছুল রানা বরফ-ছাওয়া হিমালয়ে মহাদেবের প্রাচীন গুহায়! বুঝে গেছে, কারা ধ্বংস করবে মানব-সভ্যতা! একদিকে শিবের বেদ রক্ষাকারী সশস্ত্র সাধু, অন্যদিকে মাস্টারমাইণ্ড অনুপম মঙ্গলকার, তার পাষাণী স্ত্রী মাধুরী ও নিষ্ঠুর মার্সেনারিরা। বড় বিপদে আছে রানা বেচারা!

দাম ■ একশ' বাহাত্তর টাকা

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
mail: alochonabibhag@gmail.com
শো-রুম
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ফলেট প্যাপিলাইটিস জিভের সমস্যা

কেউ যদি সারাক্ষণ মানসিক চাপে থাকে তবে সে ক্ষেত্রে অ্যাপথাস আলসার বারবার হতে পারে।

ডা. মোঃ ফারুক হোসেন
মুখ ও দন্তরোগ বিশেষজ্ঞ

মুখের ভিতরে বিভিন্ন স্থানের আলসার বা ঘায়ের মত জিভে আলসার বা ঘা দেখা যায়। মুখের ভিতরে সবচেয়ে বেশি যে আলসার দেখা যায় তার নাম অ্যাপথাস আলসার। অ্যাপথাস আলসার সাধারণত এমনিতেই ভাল হয়ে যায়। তবে সমস্যা বেশি হলে ভিটামিন বি-২ ট্যাবলেট একটি করে তিনবার ১৫ দিন খাওয়া যেতে পারে। সঙ্গে পোভিডন আয়োডিন ১% মাউথ ওয়াশও ব্যবহার করা ভাল। তবে কোনও রোগী বেশি দুশ্চিন্তা করলে বা কেউ যদি সারাক্ষণ মানসিক চাপে থাকে তবে সে ক্ষেত্রে অ্যাপথাস আলসার বারবার হতে পারে। এ ছাড়া রোগীর যক্ষ্মা হলেও মুখে ঘা দেখা যেতে পারে। এ ধরনের আলসারকে টিউবারকুলাস আলসার বলা হয়। জিভের পিছনের দিকে একধরনের ঘা দেখা যায়। অনেক সময় ফোলাভাব লক্ষ করা যায়। তবে এই ফোলাভাব জিভের পিছনের একপাশেও হতে পারে, আবার উভয় পাশেও হতে পারে। সাধারণত যেসব রোগীর জিভে পিছনের দিকে একপাশে ফোলাভাব আছে, কিন্তু অন্যপাশ স্বাভাবিক তাদের ক্ষেত্রে রোগীরা তো বটেই, নবীন ডাক্তাররা পর্যন্ত মুখের ক্যান্সারের প্রাথমিক অবস্থা ভেবে ভুল করে থাকেন।

আসলে এই অবস্থাটির নাম ফলেট প্যাপিলাইটিস। জিভের পিছনের অংশে ফলেট প্যাপিলা থাকে। ধূমপান, পান সেবন, অ্যালকোহল গ্রহণ অথবা নেশা জাতীয় যে-কোনও দ্রব্য সেবনে ফলেট প্যাপিলার প্রদাহ হলে জিভের পিছনের এই অংশে আলসারের মত লালচে ভাব দেখা যায় এবং সামান্য ফুলে যেতে পারে। ফলেট প্যাপিলাইটিস-এর ক্ষেত্রে আক্রান্ত স্থানে স্থানীয়ভাবে প্রয়োগকারী মলম ১৫ দিন ব্যবহার করা যেতে পারে।

সঙ্গে-সঙ্গে স্টেরয়েড ইনহেলার প্রতিদিন এক পাফ পরিমাণ সকালে এবং রাতে মুখে সীমাবদ্ধ রেখে ব্যবহার করা যেতে পারে। এ ছাড়া সবধরনের নেশা জাতীয় দ্রব্য বর্জন করতে হবে। আশা করা যায় এভাবে চিকিৎসা নিলে রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে। তবে এর পরও সুস্থতা না এলে অবশ্যই বায়োপসি করা উচিত। সর্বোপরি যে-কোনও রোগীর উচিত নিজে ওষুধ না খেয়ে অভিজ্ঞ ডেন্টাল সার্জনের পরামর্শ নেয়া। ■

মোবাইল: ০১৮১৭-৫২১৮৯৭
ই-মেইল: dr.faruqu@gmail.com

জলভূতের খপ্পরে

জাহাঙ্গীর আলম সুজন

'নাল-বাতি তো পাওয়া গেল, এখন কেরাসিন কেনার টাকা কোথায় পাই?' ভাবছে নয়ন।

নয়ন ছেলেটা দুরন্ত স্বভাবের। স্কুলে যেতে মন চায় না ওর। মাছ ধরাই ওর বড় নেশা। গ্রামের জলাশয়গুলোতে যেন মাছের মেলা বসেছে। তাই গ্রামের ছেলে-বুড়োরা কোমর বেঁধে নেমেছে মাছ ধরা প্রতিযোগিতায়। কে কার চেয়ে বেশি মাছ ধরবে। তাই নিয়ে চলে হুল্লোড়। নয়ন তো মাছ ধরায় রীতিমত ওস্তাদ। বড়দেরও হার মানিয়ে দেয়। বর্ষা এলে নয়নদের ধানখেতে পানি জমে। বর্ষার ঢলে নদী থেকে মাঠে উঠে আসে টেংরা, পুঁটি, কৈ মাছের ঝাঁক।

আগের রাতে নয়নদের ধানখেত সেঁচে দুই ঝাঁচি মাছ পেয়েছে ওপাড়ার জগুমালোরা। বন্ধু হোসেন এসে খবরটা দেয় নয়নকে। 'কাল তোদের খেত সেঁচে জগুমালো অনেক মাছ পেয়েছে। তুই চুপ করে বসে আছিস কেন?'

'কী, আমাদের খেতে পানি জমেছে আর আমি জানি না?' অবাক হয় নয়ন। 'আজ রাতেই খেত সেঁচে সব মাছ ধরে নেব। তুই থাকবি আমার সাথে। রাতের মধ্যেই সেঁচতে না পারলে সকালে হয়তো দেখব আমাদের আগেই মালোরা সব মাছ ধরে নিয়েছে।'

হোসেন রাজি হয়ে যায়।

পানি জমা ধানখেতগুলোতে মাছ ধরতে গিয়ে প্রায়ই মারামারি বাধিয়ে দেয় গ্রামের লোকজন। পরের জমিতে মাছ ধরতে গেলে যা হয় আর কী। যার জোর বেশি কিংবা যে আগে পৌঁছয় সে-ই জমি সেঁচে। নয়নের অবশ্য এসব ঝামেলা নেই। ওদের নিজেদের খেত, তাই কারও সাথে ঝগড়া

লাগার কথা নয়।

রাতে মাছ ধরার জন্য বিকেল থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দেয় নয়ন আর হোসেন। জাল, দড়ি, বালতি, হাঁড়ি, খাঁচি–কত কী জোগাড় করে হোসেন বাইড় আর কোদাল নিয়ে সন্ধ্যারাতেই হাজির হয় নয়নদের বাড়িতে। সব প্রস্তুতি শেষ।

এবার মায়ের অনুমতি নিতে যাবে। অমনি মনে পড়ল, আরে, আলোটাই তো নেয়া হয়নি। হারিকেনের আলোয় রাতে মাছ ধরা যায় না। দরকার নাল-বাতির। কিন্তু নয়নদের নাল-বাতি নেই। এখন কী করা যায়?

হোসেন বলে, 'বাতেন মিয়াদের নাল-বাতি আছে। কিন্তু বউটা যে দজ্জাল, তার উপর হাড় কিপটে। নাল-বাতি পাওয়া যাবে বলে তো মনে হয় না।'

'সে আমি দেখব,' বলে নয়ন। 'চল তো আগে তাদের বাড়ি।'

বাতেন মিয়ার বউকে কি অত সহজে পটানো যায়? ধর্মের ষাঁড় ডেকে, পাঁচ সের মাছ দেয়ার কিরে কেটে অবশেষে সফল নয়ন। নাল-বাতি ধার পায়।

'নাল-বাতি তো পাওয়া গেল, এখন কেরাসিন কেনার টাকা কোথায় পাই?' ভাবছে নয়ন।

বাড়ি গিয়ে দেখে বাবার পাঞ্জাবি আলনায় ঝোলানো রয়েছে। দেখে নেয় বাবা ধারে কাছে আছেন কিনা। তারপর পকেট থেকে বিশ টাকা হাত সাফাই করে। এখন মায়ের অনুমতির পালা। মা কি একমাত্র ছেলেকে রাত-বিরাতে মাছ ধরতে পাঠান? মায়ের অনুরোধ-উপরোধ তুচ্ছ করে হোসেনকে নিয়ে মাছ ধরতে বেরিয়ে পড়ে নয়ন। সাথে চলে ওদের কালো কুকুরটা।

বাড়ি থেকে ধানখেতের দূরত্ব মাইল তিনেক। পায়ে হেঁটে যেতে রাতদুপুর। কৃষ্ণপক্ষের ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত। ঝোপঝাড়ের মাথায় থোকায়-থোকায় জোনাকি জ্বলছে। কিন্তু নাল-বাতির আলোর ঝলকে জোনাকির সেই ঝিলিমিলি দেখতে পাচ্ছে না নয়ন আর হোসেন। নাল-বাতির আলোয় ধানখেতের আশপাশে অনেকদূর পর্যন্ত আলোকিত হয়ে উঠেছে। সেই আলোর বন্যায় কাজে লেগে পড়ে নয়ন আর হোসেন।

সব প্রস্তুতি শেষ। পানি সেঁচতে যাবে–ঠিক সে সময় নয়নের নাকে আসে মাছ ভাজার গন্ধ। নয়ন অবাক হয়। দু'তিন মাইলের মধ্যে জনবসতি নেই, অথচ স্পষ্ট মাছ ভাজার গন্ধ আসছে। নয়ন হোসেনের দিকে তাকায়। ওর ভেতর কোনও ভাবান্তর নেই। কিন্তু কুকুরটা ঠিকই গন্ধ পেয়েছে। কুঁই-কুঁই শব্দ করে এখানে-সেখানে মাটি শুঁকে বেড়াচ্ছে। নয়ন নীরবতা ভেঙে বলে, 'মাছ ভাজার গন্ধ পাচ্ছিস, হোসেন?'

'মাছ ভাজা!' যেন আকাশ থেকে পড়ে হোসেন। 'কই, না তো! এখানে মাছ ভাজার গন্ধ আসবে কোত্থেকে? সারাদিন মাছের চিন্তা করতে-করতে মাছটা ভেজেই ফেললি! হা-হা...'

'তুই হাসছিস? আমি কিন্তু সত্যি বলছি। ওই দেখ কুকুরটাও পাচ্ছে। কেমন শুঁকে-শুঁকে বেড়াচ্ছে!' নয়নের চোখে-মুখে ভয়ের রেখা ফুটে উঠেছে।

হোসেন ওকে সাহস দেয়, 'আরে, বাদ দে তো গন্ধ-টন্ধ। সব মনের দোষ। চল কাজ করি।'

নয়ন জোর করে গন্ধ ঝেড়ে ফেলে পানি সেঁচায় মন দেয়। সেঁচতে সেঁচতে ধানখেতের অর্ধেক পানি ফুরিয়ে এসেছে। বাঁধের পাশে পাতা জালে আটকা পড়েছে কয়েক সের ছোট মাছ। এমন সময় মোচড় মেরে ওঠে হোসেন, 'নয়ন আমার পেটের ভেতর না মোচড় মারছে। আমি একটু ইয়ে করে আসি?'

'তোর আর ইয়ে করার সময় হলো না! এমনিতেই মাছ ভাজার গন্ধটা বড্ড জ্বালাচ্ছে। যা, তবে বেশি দূর যাস না কিন্তু!'

হোসেন কিছুদূর গিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে হারিয়ে যায়। নয়নের গা ছমছম করছে। মাছ ভাজার গন্ধটা আরও ঝাঁঝাল হয়ে ওঠে। ভয়ের শীতল শিহরণ বয়ে যায় মেরুদণ্ড বেয়ে। ভয় তাড়ানোর জন্য বালতি, দড়ি রেখে গামলা নিয়ে একা-একাই পানি সেঁচতে শুরু করে। সেঁচছে তো সেঁচছেই। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর মনে পড়ে হোসেনের কথা। এত দেরি হচ্ছে কেন? প্রকৃতির কাজ সারার জন্য বড় জোর দশ মিনিট সময় লাগে। এবার সত্যি-সত্যিই ভয় পেয়ে যায় সে। হাঁক ছাড়ে–'হোসেন! হোসেন! কোথায় তুই?'

হোসেনের সাড়া নেই। নয়ন গলা উঁচু করে দেখার চেষ্টা করে। কোথাও নেই হোসেন। ভয় আরও বেড়ে যায়। ভাবে, হোসেনের কি কিছু হলো? নাকি ওকে ভয় দেখানোর জন্য ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে। ঠিক তখন ধানখেত থেকে মস্ত একটা গজার মাছ এক লাফে বাইড়ের

ওপাশে গিয়ে পড়ে। নয়ন অবাক হয়–এতবড় গজার সে কখনও দেখেনি। কী করবে ভেবে পায় না। হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে ওর কুকুরটা তেড়ে যায় গজার মাছটার দিকে কামড় বসিয়ে দেয় মাছটার ঘাড়ে।

তারপর হঠাৎ একটা ঘূর্ণিঝড় এসে উল্টে ফেলে দেয় নাল-বাতিটা ধানখেতের পানির ভেতর তলিয়ে যায় ওটা। নিকষ কালো অন্ধকার এসে ভর করে চারদিকে। ভয়ে আধমরা হয়ে যায় নয়ন। ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে। হোসেনকে ডাকার শক্তিও অবশিষ্ট নেই। আবার কুকুরের চিৎকার কানে আসে। ঘেউ-ঘেউ গর্জন নয়–কান্নার মত। তারপর গলা ফাটিয়ে তীক্ষ্ণ ভয় মেশানো চিৎকার। মনে হয়, কেউ বুঝি কুকুরটাকে গলা টিপে মারতে চাইছে। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না নয়ন। ধানখেতের আইলের ওপর লুটিয়ে পড়ে।

ওদিকে ছেলে ফিরছে না বলে ভোর রাতে নয়নকে খুঁজতে বেরোয় ওর বাবা। সাথে আট-দশজন লোক। তারা দেখে, ধানখেতের পাশে পড়ে রয়েছে নয়নের অজ্ঞান দেহ। কুকুরটার অবস্থা আরও করুণ। মরে পড়ে আছে আইলের পাশে। সারা গা পানি-কাদায় মাখামাখি। চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। জিভটা সম্পূর্ণ বেরিয়ে আছে বাইরে। মনে হয় কেউ যেন গলা টিপে, পানিতে ঠুসে নিষ্ঠুরভাবে মেরেছে ওকে।

নয়নের অজ্ঞান দেহটা বাড়িতে নিয়ে আসে তারা। দু'দিন পর জ্ঞান ফেরে। বাবা-মা জানতে চান ঘটনা কী ঘটেছিল। নয়ন সব খুলে বলে।

হোসেন পাশেই বসে ছিল।

সব শুনে সে অবাক! 'সেদিন সন্ধ্যায় আমি তোর সাথে মাছ ধরতে যাইনি তো। এটা ঠিক যে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সন্ধ্যায় হঠাৎ করে ছোট বোনটা অসুস্থ হয়ে পড়ে। ওকে নিয়ে হাসপাতালে যেতে হয়। সারারাত হাসপাতালেই ছিলাম।'

নয়ন ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে হোসেনের দিকে। ভেবে কূল-কিনারা পায় না, তবে তার সাথে কে গিয়েছিল। বাইড় আর কোদালই বা কে এনেছিল? নয়ন জিজ্ঞেস করে সে কথা। হোসেন মুখ খোলার আগেই বাবা বলেন, 'আমরা ধানখেতে কোনও বাইড়-কোদাল পাইনি।' ■

প্রকাশিত হয়েছে
হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর
দ্য গোস্ট কিংস
রূপান্তর: সাইফুল আরেফিন অপু

পাহাড়ি ঢল যখন র‍্যাচেলকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে ঠিক তখন ঈশ্বর প্রেরিত দূত হয়ে ওকে বাঁচাতে এল রিচার্ড ড্যারিয়েন। প্রেমের দেখা পেল ও। প্রমত্তা নদী, পাহাড়ি ঢল আর হিংস্র সিংহের থাবা এড়িয়ে বেঁচে যাওয়ায় নেটিভরা ওর নাম দিল ইনকোসাজানা অর্থাৎ স্বর্গীয় কন্যা। জুলুল্যাণ্ডে ইনকোসাজানার উপস্থিতি চাইল রাজা ডিনগান। বোয়েরদের সাথে লড়াইয়ে যাবে কিনা, ইনকোসাজানার কাছে তা জানতে চাইল ডিনগান। ওদিকে প্রথম দর্শনেই র‍্যাচেলের প্রেমে পড়ল নিশাচর ইসমাইল। ডিনগানের সাথে ষড়যন্ত্র করে র‍্যাচেলের বাবা-মাকে হত্যা করল ইসমাইল। চাইল বন্দি করে ওকে দখল করতে। একই সময় সবার চোখে মৃত হিসেবে উপস্থাপন করা হলো রিচার্ডকে। শেষ আশ্রয় রিচার্ডকে হারিয়ে উন্মাদ হয়ে গেল র‍্যাচেল। এখন, ডিনগান কি তার প্রশ্নের উত্তর পাবে? র‍্যাচেল কি ফিরে পাবে নিজেকে? আবার কি ফিরবে রিচার্ড? এসব প্রশ্নের উত্তর জানতে র‍্যাচেলের সাথে আমাদেরও যেতে হবে বামুনভূত জাতির এলাকায়, বিশাল মহীরুহের বনে। চলুন তা হলে রওনা হওয়া যাক অন্ধকার আফ্রিকার গহীনে।

দাম ■ একশ' ছেচল্লিশ টাকা

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
mail: alochonabibhag@gmail.com
শো-রুম
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

শীতপ্রধান দেশে পানি জমে বরফে পরিণত হয়। পানির পাইপের ভেতর পানি ঠাণ্ডায় বরফ হলে আয়তন বেড়ে যায়।

শীতপ্রধান দেশে পানির পাইপ ফেটে যাওয়া

শীতপ্রধান দেশে পানি জমে বরফে পরিণত হয়। পানির পাইপের ভেতর পানি ঠাণ্ডায় বরফ হলে আয়তন বেড়ে যায়। ফলে পাইপের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে, তাতে পাইপ ফেটে যায়।

হারিকেনের গরম চিমনির উপর পানি পড়লে ফেটে যায়

হারিকেনের গরম চিমনির উপর পানি পড়ার কারণে তা শীতল হয়ে সঙ্কুচিত হয়, কিন্তু কাচ তাপ কুপরিবাহী বলে ভেতরে সঙ্কুচিত হতে পারে না। ফলে, সঙ্কোচনের তারতম্যের কারণে চিমনি ফেটে যায়।

ইলিশ মাছ লবণ দিয়ে সংরক্ষণ

খাদ্যলবণ একটি পানিগ্রাসী পদার্থ। এটি জলীয় বাষ্প শোষণ করে নেয়। ইলিশ মাছ লবণ মেখে সংরক্ষণ করা হলে, লবণ মাছের কোষ থেকে পানি শোষণ করে। এতে প্রয়োজনীয় আর্দ্রতার অভাবে মাছ পচে যেতে পারে না। এছাড়া লবণ জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। ■

সংগ্রহে: তারেকুর রহমান

বুক পয়েন্ট

প্রো: চন্দন

এখানে সেবা প্রকাশনী ও প্রজাপতি প্রকাশনের সব বই বিক্রি করা হয়।

৯ নং গোল্ডেন প্লাজা, সোনাদিঘীর মোড়, রাজশাহী।

মোবাইল: ০১৫৫৮-৮৬০৭৭০

সর্বনাশ

মোঃ সাজিদুল ইসলাম সাজিদ

তোমাকে দেখে আমি খুশি হলেও তুমি যে এমন করে আমার সর্বনাশ করবে, তা কিন্তু কখনও ভাবিনি।

যে আমি, প্রতিদিন প্রভাত থেকে শুরু করে সাঁঝ পর্যন্ত তোমার একটু ভালবাসার পরশ পাবার আশায় উদ্বিগ্ন হয়ে থাকি, সেই তুমি আমার এত বড় সর্বনাশ করবে, তা কখনও ভাবতেও পারিনি।

আজ অনেক দিন যাবৎ একটি চাকরির আশায় হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিন্তু চাকরি–সে তো সোনার হরিণ! আজকাল তো স্বপ্নেও এর দেখা মেলে না। কত শত ধাপ যে পেরোতে হয় একটা চাকরি পাবার জন্য, তা একমাত্র চাকরি প্রত্যাশী ব্যক্তিরাই বোঝে। এখন তো আবার চাকরি পাবার জন্য জোরের প্রতিযোগিতায় নামতে হয়। বুদ্ধির জোর, মেধার জোর, মামার জোর, টাকার জোর, ক্ষমতার জোর–আরও কত জোরের যে প্রয়োজন–তা বলাই বাহুল্য।

সে যাই হোক, অনেক কষ্টে একটা প্রতিষ্ঠানের সন্ধান পেলাম, যেখানে চাকরি পাবার জন্য শুধু মেধার জোর ছাড়া আর কোনও জোরের প্রয়োজন পড়ে না। তাই প্রতিষ্ঠানটিতে চাকরি পাবার জন্য জোর প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম। ফলও পেলাম হাতেনাতেই, লিখিত পরীক্ষায় প্রথম স্থান। চাকরি পাবার প্রত্যাশা এবার এক ধাপ বেড়ে গেল। এখন শুধু মৌখিক পরীক্ষায় টিকলেই–ব্যস! যেহেতু মেধার ভিত্তিতে চাকরি, তাই চাকরি পাবার ক্ষেত্রে আমার অগ্রাধিকার একটু বেশি বলতে হয়।

প্রকাশিত হয়েছে
কিশোর থ্রিলার
তিন গোয়েন্দা
ভলিউম-১৪০/২
শামসুদ্দীন নওয়াব

ক্যামেলটের জাদুকর/শামসুদ্দীন নওয়াব: নতুন লাইব্রেরি সহকারী মিস্টার মার্লি আসলে কে? রাজা আর্থারের সেই বিখ্যাত জাদুকর মার্লিনের সঙ্গে তাঁর চেহারার এত মিল কেন? বিশাল মাছের ট্যাঙ্কের ওটা কি সত্যিই গোল্ডফিশ, নাকি...? এসব প্রশ্নের জবাব পেতে চাইল তিন গোয়েন্দা।

কয়েন-রহস্য/শামসুদ্দীন নওয়াব: শেলী আন্টির সঙ্গে টিম্বারউলফ লেকে ক্যানু ট্রিপে বেরিয়েছে তিন গোয়েন্দা। জঙ্গলে প্রকাণ্ড এক পাথরের গায়ে লেখা রহস্যময় এক ধাঁধা আবিষ্কার করল ওরা। ধাঁধাটার সঙ্গে কি বছর খানেক আগে চুরি যাওয়া দুষ্প্রাপ্য কয়েনগুলোর কোন যোগসূত্র আছে? সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে তদন্ত শুরু করল তিন গোয়েন্দা।

মৃত্যুকূপ/শামসুদ্দীন নওয়াব: গণ্ডগোল বেধেছে হিরু চাচার সোনার খনিতে। সরেজমিনে তদন্ত করতে কিশোরকে নিয়ে প্লেনে করে রওনা দিল সে। শুরু হলো পদে-পদে বিপদ। স্বর্ণখনির ভিতরে দস্যুদলের মুখোমুখি হলো চাচা-ভাতিজা। ডাকাতদের টেক্কা দিয়ে, রুদ্ধশ্বাস অভিযান শেষে, জলদস্যুর বহুমূল্য মুকুটটা কি উদ্ধার করতে পারল ওরা?

দাম ■ আটাশি টাকা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

আগামী মাসের রবিবার ভাইভার জন্য ডাকা হলো। নির্ধারিত দিনে খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে নামাজ পড়ে একটু ফিটফাট হলাম। তারপর হাতে সময় নিয়েই ভাইভা দেয়ার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। সেখানে পৌঁছে দেখলাম অফিস তখনও খোলা হয়নি। তাই উদ্দেশ্যহীনভাবে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। কিছুদূর যেতেই আমার এক মামার সঙ্গে দেখা। অনেক দিন পর দেখা বলে তিনি কিছুতেই আমাকে কিছু না খাইয়ে ছাড়তে চাইছেন না। তাই পাশের এক রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়লাম। আর তখনি তোমার সঙ্গে দেখা হবে, ভাবতেও পারিনি। তোমাকে দেখে আমি খুশি হলেও তুমি যে এমন করে আমার সর্বনাশ করবে, তা কিন্তু কখনও ভাবিনি। তোমার আকস্মিক আক্রমণের কবলে পড়ে মুহূর্তের মধ্যে যাচ্ছেতাই অবস্থা হয়ে গেল আমার।

তাই যতটা সম্ভব, দ্রুত সেখান থেকে কেটে পড়লাম। পুনরায় ঠিকঠাক হতে অনেকটা সময় লেগে গেল। এদিকে ঘড়িতে তাকিয়ে দেখি আর মাত্র দশ মিনিট বাকি ভাইভা শুরু হতে। কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। দ্রুত একটা অটো নিয়ে গন্তব্যের উদ্দেশে ছুটলাম। কিন্তু বাদ সাধল জ্যাম। তাই কোনও কিছু না ভেবেই দৌড়াতে শুরু করলাম। কিন্তু ভাইভা বোর্ডে যখন পৌঁছলাম, ততক্ষণে সর্বনাশের ঘণ্টা বেজে গেছে। আমাকে না পেয়ে ততক্ষণে অন্য আরেকজনকে নিয়োগ দেয়া হয়ে গেছে। অনেক সাধনার চাকরিটাও শুধু তোমারই জন্য হারাতে হলো।

তাই তো সবাইকেই বলি, আমার মত কেউ যেন ইন্টারভিউ দেয়ার আগে তাড়াহুড়ো করে চা খেতে যাবেন না। নইলে আমার মত আপনাদেরকেও এর আকস্মিক আক্রমণের কবলে পড়ে আপনার প্রিয় সোনার হরিণ চাকরিটাকে হারাতে হতে পারে। আর তখন আফসোস করেও আর লাভ হবে না!

একটি সংগ্রাম

অর্পণ দাশগুপ্ত

সবাই বলত আত্মহত্যা করতে, সবার থেকে
লুকিয়ে থাকতে, মুখ ঢেকে রাখতে।

ছবিটি লিজি ভালসাকেজের। জন্মেছিলেন টেক্সাসের অস্টিনে ১৯৮৯ সালে। দেখতে তিনি রীতিমত কুৎসিত, একটি চোখ অন্ধ। রঙিন সভ্যতা স্বীকৃতি দিয়েছিল: তিনি বিশ্বের সবার চাইতে কুৎসিত মেয়ে!

সবাই বলত আত্মহত্যা করতে, সবার থেকে লুকিয়ে থাকতে, মুখ ঢেকে রাখতে। কিন্তু সেসব কিছু কানে না নিয়ে তখনই নিজের জীবনের চারটি লক্ষ্য স্থির করে ফেলেছিলেন লিজি।

প্রথমত: একজন সুবক্তা হওয়া।

দ্বিতীয়ত: নিজের লেখা বই প্রকাশ করা।

তৃতীয়ত: স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করা।

চতুর্থত: নিজের ক্যারিয়ার ও পরিবার তৈরি করা।

সেই থেকেই নিরলস কাজ করে গেছেন তিনি।

এরপর গত সাত বছরে দু' শ'র বেশি ওঅর্কশপে বক্তৃতা দিয়েছেন। কীভাবে অভিনবত্বকে স্বীকৃতি দিতে হয়; বাধা, বিঘ্ন পেরিয়ে কীভাবে জীবনকে গ্রহণ করতে হয়; প্রতিকূল পৃথিবীতে ঘুরে দাঁড়াতে হয়; ভালবাসতে হয়, সাত বছর ধরে এসব বিষয়ের ওপরই বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন লিজি।

২০১০-এ লিজি লিখে ফেলেন তাঁর আত্মজীবনীমূলক বই: Lizzie Beautiful, ২০১২ সালে দ্বিতীয় বই: Be Beautiful, Be You, যা ব্যাপক সাড়া পায় বিশ্বে।

বইটির শুরুতে লিজি বলেন: 'অ্যাপিয়ারেন্স নয়, মানুষকে মূল্যায়ন করতে হবে অর্জিত গুণ দিয়ে।'

এই বছরই প্রকাশিত হতে চলেছে তাঁর তৃতীয় বই।

লিজির এক বন্ধু বলেছে: 'This young woman is a very good example of what it means to be truly beautiful.'

আরেক বন্ধু বলেছে: 'লিজি কুৎসিত নয়। কুৎসিত হলো লিজিকে দেখার আমাদের চোখ।'

লিজির মা বলেছেন: 'I love Lizzie, I would be proud to be her mom.'

অথচ সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষ হয়েও আমরা অল্পে হতাশ হয়ে পড়ি। নিজের রূপ-চেহারা আমাদেরকে ভোগায়। Fair & Lovely, Lux-এর বিজ্ঞাপন দেখে হীনম্মন্যতায় ভুগি! রঙিন কর্পোরেট বিশ্বে নিজেকে অসহায় ভাবি ভাবি, চেহারাই সব!!

রূপ দিয়ে কখনও সাজানো যায় না ভবিষ্যৎকে। যার-যার কর্মই পারে ভবিষ্যৎকে সাজাতে। ■

(অনলাইন নিবন্ধ অবলম্বনে)

শিকার

মূল ▮ লরেন্স ব্লোক
রূপান্তর ▮ আফরানুল ইসলাম সিয়াম

'ততক্ষণে সব শেষ। একটা নিষ্পাপ জীবন! একটি জীবনের অপচয়, একটা প্রাণের মৃত্যু।'

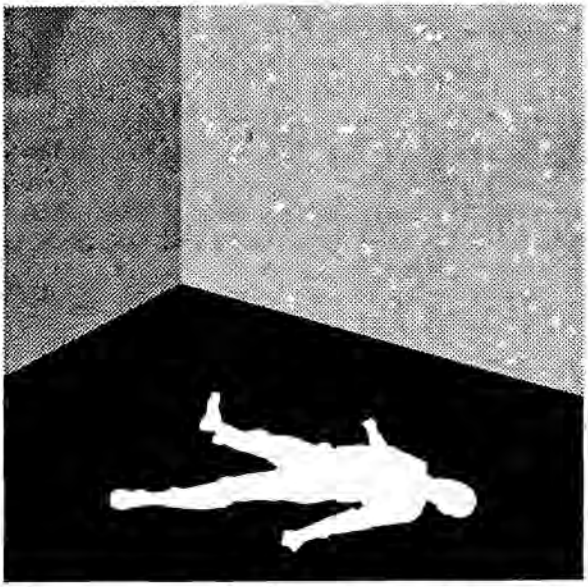

শুষ্ক পাহাড়ি বাতাস, জুতোর নিচে শুকনো পাতার মর্মরধ্বনি, মনে ছায়া ফেলে বিষণ্নতা। পশ্চিম আকাশে গোধূলির লাল আলোয় রাঙা, সেদিকে একবার চেয়ে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল ড্র্যানডিজ। লজে ফিরতে-ফিরতে প্রায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। রুমে ঢুকে বেশি দেরি করল না, হাতের জিনিসপত্র চেয়ারে আর উজ্জ্বল কমলা রঙের ক্যাপটা হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে আবার বের হলো। দ্রুত পা চালিয়ে এল লবিতে, তারপর লবি হয়ে বার-এ।

বার কাউন্টারের পাশে খালি এক টুলে আরাম করে বসতেই, ড্র্যানডিজের দিকে এগিয়ে এল বারটেণ্ডার এডি।

'শুভ সন্ধ্যা, এডি।'

'শুভ সন্ধ্যা। সারাদিন কেমন কাটল?'

'মন্দ নয়। তবে পরিশ্রম হয়েছে প্রচুর। চাঙ্গা হওয়া প্রয়োজন।'

'কোন্‌টা দেব?'

'রোজকার মতই। যে সুধা দাও সবসময়।'

ড্র্যানডিজ হুইস্কি খেতে ভালবাসে। বারটেণ্ডারেরও তা অজানা নয়। প্রথমে শুরু করে নির্জলা

হুইস্কি দিয়ে, তারপর বরফ আর সোডা মিশিয়ে পান করে। নিয়মিত যাতায়াত থাকায় সখ্য গড়ে উঠেছে এডির সঙ্গে।

বারটেণ্ডার দুই পেগ হুইস্কি গ্লাসে ঢালতেই তা এক ঢোকে গিলে নিয়ে খালি গ্লাসটি রাখল টেবিলে। এডি বোতল হাতে তৈরিই থাকে, গ্লাসের হুইস্কি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার তা ভরে দেয়। পেটে হুইস্কি পড়তেই সারাদিনের ক্লান্তি যেন এক নিমেষে উধাও হলো।

'আহ! কী শান্তি! এই সুধার জন্যেই তো বেঁচে থাকা! কি বলো, এডি?'

অন্য কেউ না চাইলেও, এই বারের মালিক আর বারটেণ্ডার চায় ড্রানডিজ বেঁচে থাকুক। বহাল তবিয়তেই বেঁচে থাকুক এবং নিয়মিত এই সুধা পান করুক।

ড্র্যানডিজের কথার সম্মতি জানাতেই যেন এডি বরফ ও সোডা মিশিয়ে পরের পেগ পরিবেশন করল। গ্লাসের তরলে ছোট-ছোট চুমুক দেয়ার ফাঁকে বারের ভিতরে একবার চোখ বুলিয়ে নিল সে। খেয়াল করল, ও ছাড়া বারে রয়েছে মাত্র একজন ব্যক্তি। সেদিকে তাকাতেই ছোটখাট লোকটা তার দিকে ফিরে চাইল। দৃষ্টি বিনিময় হলো দু'জনের। মৃদু হাসি উপহার দিল সে।

ড্র্যানডিজ এগিয়ে গিয়ে অচেনা লোকটার পাশের টুলে বসল।

'শুভ সন্ধ্যা।'

'শুভ সন্ধ্যা।'

অপরিচিত লোকটার হাতে জ্বলন্ত সিগারেট আর গ্লাসে ভদকা মার্টিনি। ড্র্যানডিজের দিকে এক নজরে কিছুক্ষণ তাকিয়ে, মনে-মনে কী যেন ভাবল। অচেনা লোকটার পোড় খাওয়া চেহারা, পরনে ভারী লাল-কালো ডোরাকাটা জ্যাকেট, উলের প্যান্ট এবং হাঁটু অবধি চামড়ার জুতো।

'আমার ধারণা ভুল না হলে আপনি সম্ভবত শিকারে গিয়েছিলেন। অন্তত আপনার বেশভূষা তাই বলছে।'

ড্র্যানডিজ হাসিমুখে উত্তর দিল, 'অনেকটা সেরকমই বলতে পারেন।'

'অনেকটা! ভাল বলেছেন। আশা করি আপনার সময়টা বৃথা যায়নি?'

'একদম না। এমন মোহনীয় দিন কি সচরাচর পাওয়া যায়? আবহাওয়া ছিল চমৎকার। সকালে যাও একটু বাতাস ছিল; বেলা গড়াতেই সূয্যি মামা মাথার উপর অগ্নিবর্ষণ শুরু করল। কাঠফাটা রোদে চোখ খুলে রাখাই দায়। সারাদিন ঘুরেও কোনও পশু-পাখির টিকির দেখা পেলাম না। তারপরও যদি বলতে হয়, তা হলে অবশ্যই বলব দিনটা ভাল কেটেছে। খুব আরামেই কেটেছে।'

'হা-হা-হা-হা। ভাল রসবোধ আছে আপনার।'

'আমার জীবন বীমা করা। কিন্তু আফসোস, রসের বীমা ব্যাংকে করানোর সুযোগ নেই। প্রতিদিন এই পাহাড় আর জঙ্গল চষে বেড়ানোর পর কতটুকু রসই বা অবশিষ্ট থাকে, বলুন।'

অচেনা লোকটা এক গাল হেসে তার হাতের গ্লাসে চুমুক দিল।

'ভালই মজা করতে পারেন আপনি। কিন্তু এই দিনে তো আপনার শিকার না পাওয়ার কথা নয়। কোনও পশুকে অনুসরণ করেছিলেন আজ?'

'হ্যাঁ, করেছি। শিকার যে একদমই পাইনি, তা নয়। পেয়েছি বৈকি। যা পাই, তা নিয়েই এই অভাগাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।'

'আগেই বলেছিলাম, এই আবহাওয়া শিকারের জন্য ভাল। চলুন, আপনার সাফল্য উদ্‌যাপন করা যাক।' দু'জনেই গ্লাস টোস্ট করল তারা। একসঙ্গে বলে উঠল, 'বিজয়ের জন্য।'

'আমি হোমার ড্র্যানডিজ।'

'আমি রজার ক্রাল।'

নানান কথাবার্তার মাঝখানে, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই দু'জনের হাতের গ্লাস খালি হয়ে গেল। ড্র্যানডিজের ইশারায় বারটেণ্ডার আবার গ্লাসদুটো ভরে দিয়ে গেল।

'আমার তরফ থেকে,' সে বলল। 'আমার মনে হচ্ছে আপনি নিজেও একজন শিকারি, মি. ক্রাল।'

ক্রাল তাকিয়ে আছে নিজের গ্লাসের দিকে। কিছুটা অন্যমনস্ক।

'ভুল বলেননি। আমিও আপনারই মত শিকারি। অনেক বছর ধরেই শিকার করি এবং এখনও করছি। শিকারই আমার ধ্যান জ্ঞান। কিন্তু...'

'কিন্তু কি?'

ক্রাল কিছু বলার জন্য নিজেকে গুছিয়ে নিল।

'আগের সেই স্বাদটা এখন আর নেই।'

'ব্যাপারটা আর আগের মত রোমাঞ্চকর মনে হচ্ছে না আপনার কাছে?'

'আসলে ঠিক আগের সেই উৎসাহটা আর পাই না। আগের সেই উন্মাদনা, রোমাঞ্চ.., কোনও কিছুই আজ অবশিষ্ট নেই। শিকারের সেই টানটান উত্তেজনা খুঁজে পাই না। আগে শিকারে বের হলেই রক্তে উন্মাদনা জাগত। সেসব দিনের কথা ভাবলে গায়ের রোম খাড়া হয়ে যায়। খুব মনে পড়ে সেই দিনগুলো। তবে বর্তমান প্রেক্ষপটটা আলাদা। শিকার এখনও করি। আগের মতই অনুসরণ, শিকারকে ধাওয়া করা এসব ভাল লাগে। শিকারের পেছন-পেছন ছুটে চলা, গান-সাইটে শিকারের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা, আমার কাছে একই রকম রোমাঞ্চকর মনে হয়। তারপর সঠিক সময়ের অপেক্ষা এবং মোক্ষম সময় বুঝে ট্রিগার টিপে দেয়া। গুলিটা ঠিকমত লাগলেই...'

'কেল্লা ফতে।'

ক্রাল শ্রাগ করল। 'কেল্লা ফতে। কিন্তু শিকার মাটিতে লুটিয়ে পড়ার পর আবিষ্কার করবেন... আবিষ্কার করবেন যে... নিজেকে বড় একা মনে হয়। বারুদের গন্ধ আর গুলির বিকট আওয়াজ! তারপর চোখের সামনেই মাটিতে লুটিয়ে পড়বে শিকার, তরতাজা অসহায় একটা প্রাণ। মনে হবে, আপনি একটা জীবন ধ্বংস করে ফেলেছেন। হতাশা ঘিরে ধরবে আপনাকে, নিজের প্রতি আসবে ঘেন্না! শুধু মনে হবে, একটা জীবন আমি কেড়ে নিলাম! একটা জীবন, যেটা কেড়ে নেয়ার মালিক তো আমি নই। তা হলে? কিন্তু... ততক্ষণে সব শেষ। একটা নিষ্পাপ জীবন! একটি জীবনের অপচয়, একটা প্রাণের মৃত্যু।'

ড্র্যানডিজ চুপ করে তার গ্লাসে চুমুক দিল অন্যমনস্কভাবে। একটু পর বলল, 'আপনি অতীতে কখনও এই ব্যাপারটাকে এভাবে ভেবে দেখেননি, তাই না?'

'তখন এসব বুঝলে কি আর জীবিকা হিসেবে শিকার বেছে নিতাম? আগে কখনওই এভাবে ভাবিনি। শিকার সবসময়ই আমার কাছে রোমাঞ্চকর, কখনও অন্য চিন্তা মাথায় আসত না। কিন্তু গত কয়েক বছর... আসলে গত দুই বছর ধরে এসব চিন্তা মাথায় আসছে। এককালে সবচেয়ে পছন্দের কাজ ছিল শিকার করা, আর আজ শুধুই কাজটা করে যাওয়া। আগের সেই আবেগ-অনুভূতি কিছুই অবশিষ্ট নেই।' ক্রালের গ্লাসের ভদকা প্রায় শেষের দিকে। 'দুঃখিত। আমার হয়তো এসব কথা বলা উচিত হয়নি। আপনার সুন্দর সময়টুকু নষ্ট করলাম আজেবাজে কথা বলে।'

'একদমই নয়, মি. ক্রাল। আপনি ভুল কিছু বলেননি।' ড্র্যানডিজের ইশারায় এডি আবার দু'জনের গ্লাসদুটো ভরে দিল। 'আপনি যা বলেছেন, তা আসলে ঠিকই। এর জন্য দুঃখপ্রকাশ করবেন না। আমি আপনার মনোভাব জানতে পেরে বরং খুশিই হয়েছি।'

'সত্যি?'

'অবশ্যই।' ধূসর চুলে আঙুল দিয়ে চিরুনি চালিয়ে ড্র্যানডিজ জিজ্ঞেস করল, 'মি. ক্রাল, নাকি রজার বলে আপনাকে সম্বোধন করব?'

'একই কথা, হোমার।'

'রজার, আমার যতদূর ধারণা, আমি আপনার থেকেও বেশি সময় ধরে শিকারের সঙ্গে জড়িত। বিশ্বাস করুন, আপনি যে হতাশার কথা বলেছেন, তার সঙ্গে আমি নিজেও পরিচিত, আমিও একটা সময় এমন পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছি, যেমনটা আপনি এখন করছেন। একটা পর্যায়ে আমি এতই হতাশ হয়ে গিয়েছিলাম, যে এসব ছেড়ে দিতে চেয়েছিলাম।'

'তারপর? কীভাবে নিজেকে বোঝালেন?'

'ভুল করলেন, নিজেকে আমি কিছুই বোঝাইনি।'

'তা হলে?'

ড্র্যানডিজের মুখে ফুটে উঠল হাসি। 'আমি আপনাকে বলছি, কীভাবে সেই সময়টা পার করলাম। আমি হাল ছাড়িনি। প্রাণী হত্যা করাকে ঘৃণা করতে শুরু করলাম। কিন্তু যখন ভাবতাম, এই পাহাড়, এই জঙ্গল, এখানে আর আসা হবে না, তখন পীড়া দিত মন। শিকার না করলেও যে ওখানে যেতে পারব না, তা তো নয়। কিন্তু বনে-জঙ্গলে শিকারকে ধাওয়া করা, পাহাড়ে-পাহাড়ে শিকার খুঁজে বেড়ানো, গাছের ছায়ায়-ছায়ায় শিকারকে অনুসরণ, শিকারের ধূর্ততা আর সহজাত প্রবৃত্তিকে নিজের বোধ-বুদ্ধি দিয়ে পরাজিত করা–এসব কিছুই আমি ভালবাসি। আমার কাছে এসবই শিকারের আনন্দ।'

'হ্যাঁ, তা তো অবশ্যই,' বিড়বিড় করে বলল ক্রাল।

'তো আমি কি করলাম, আমার কৌশল পাল্টে ফেললাম। তারপর থেকে আর বন্দুক ব্যবহার করি না। শিকারকে ফ্রেমে বন্দি করে ফেলি।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

'এখনও আমি শিকার করি। কিন্তু আওয়াজ হয় ক্লিক-ক্লিক।'

ক্রাল ভ্রুকুটি করল। ব্যাপারটা ধরতে পারেনি এখনও। বোঝার চেষ্টা করছে।

তার দিকে ফিরে ক্যামেরায় ছবি তোলার মত ভঙ্গি করল ড্র্যানডিজ। 'ক্লিক-ক্লিক। ছবি শিকার।'

'এখন বুঝতে পেরেছি। ফটোগ্রাফি।'

'এটাকে ফটোগ্রাফি বলব না। এটা ছবি শিকার।'

'ছবি শিকার?'

ড্র্যানডিজ মাথা নাড়ল। 'তখন যে শিকারের কথা জিজ্ঞেস করলেন, তখন আমি উত্তরটা কেন এভাবে দিয়েছিলাম, তা এখন বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই। কেউ হয়তো আমাকে শিকারি হিসেবে মেনে নেবে না। বলবে, আমি একজন সাধারণ ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফার। কিন্তু আমি নিজেকে শিকারি ভাবতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। ভাবব না-ই বা কেন, পশু শিকার করা থেকে ছবি শিকার করা কোনও অংশেই কম কষ্টের নয়। আমি এমন একজন শিকারি, যার হাতে বন্দুকের বদলে ক্যামেরা শোভা পায়।'

ক্রালের সময় লাগল এইসব কথাবার্তা হজম করতে। 'আমি আপনার কথা বুঝলাম। আপনি সবার থেকে আলাদা।'

'ছবি তোলা আর শিকার, দুটোর অনুভূতি আমার কাছে একইরকম। বরং কিছু ক্ষেত্রে ছবি শিকার করা আরও বেশি ভাল। একটায় আপনি শিকারকে ফ্রেমে বন্দি করবেন, আরেকটায় শিকারকে হত্যা করবেন। শিকারকে হত্যা না করে ফ্রেমে বন্দি করার মধ্যেই মজাটা বেশি। যে শিকারি হরিণ মেরে একবেলা মাংস খাবে, সে তো আর চিরকালের জন্যে আটকে রাখতে পারছে না ওটাকে ফ্রেমে।' কথার ফাঁকে ড্র্যানডিজ খেয়াল করল আবারও খালি হয়ে এসেছে গ্লাস। এডিকে গ্লাস ভরে দিতে বলে আবার শুরু করল: 'যা বলছিলাম, আপনি কি আমার কথা বুঝতে পারছেন, মি. রজার?'

বারটেণ্ডার আসাতে কথায় ছেদ পড়ল।

'এটা কিন্তু আমার তরফ থেকে, এডি।'

গ্লাসে মদ ঢালা শেষ হওয়া পর্যন্ত দু'জনেই অপেক্ষা করল।

'আপনি কি সত্যি-সত্যি সেই একই আনন্দ পান, হোমার?'

'দ্বিগুণ আনন্দ পাই। আমার গুরু, যিনি আমাকে শিকার করা শিখিয়েছেন, তিনি সবসময় একটা কথাই বলতেন: শিকার মানে আনন্দ। শিকার করা সার্থক হবে কখন, জানেন? যখন শিকার করে শিকারি নিজে আনন্দ পাবে। সেই হিসেবে, বন্দুক দিয়ে শিকার করার সময় বছর দুই আগেই শেষ হয়ে গেছে আমার। ক্যামেরায় শিকারকে ফ্রেমবন্দি করার মধ্যে যে আনন্দ, যে রোমাঞ্চ আছে, তা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। শিকারকে গুলির আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে দেখে যে হতাশাটুকু কাজ করে, সেই হতাশা ফ্রেমে বন্দি করলে তাতে নেই। আমার যখন মাংসের দরকার, আমি বাজার থেকে কিনে নিতে পারব। নির্দোষ কোনও হরিণকে হত্যা করে জাহির করতে হবে না আমার পৌরুষত্ব।'

'আমি তোমার সঙ্গে একমত, হোমার।'

'দাঁড়ান, আপনাকে একটা জিনিস দেখাই।' ড্র্যানডিজ পকেট হাতড়ে একটা খাম বের করল। খামের ভেতর কয়েকটি রঙিন ছবি। 'সাধারণত এসব কাউকে দেখাই না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আপনি এগুলো দেখলে উপকৃত হবেন। অন্তত বিরক্ত হবেন না, নিশ্চয়তা দিতে পারি।'

'অবশ্যই দেখতে চাই।'

'এই ছবিটি দেখুন। এটি আলাস্কার খয়েরি ভাল্লুক। এই ছবিটা নেয়ার জন্য গিয়েছি আলাস্কা, গাইড ভাড়া করেছি, রাজ্যের অর্ধেকটা চষে বেড়িয়েছি। তারপর ওর দেখা পেয়েছি। এই ছবিটি খুব কাছ থেকে তোলা। এতে কোনও টেলি-ফটো লেন্স ব্যবহার করিনি।'

'এই একটা ছবির জন্য আপনি এতকিছু করেছেন?'

'অবাক হয়েছেন? সত্যিই এসব করেছি শুধুমাত্র এই একটা ছবি তোলার জন্য। ছবি তোলা আমার কাছে নেশার মত। আগেও যা

করতাম, এখনও তাই করি। শুধু জীবন কেড়ে নেয়ার বদলে ফ্রেমে বন্দি করি। এখনও আমি জীবনের ঝুঁকি নিই, যেমনটা আগে নিতাম। যতটুকু কাছ থেকে গুলি করা যায়, তার চেয়েও অনেক কাছে গিয়ে ছবি তুলতে হয়। অথচ, আগে চার শ' মিটার দূর থেকেই শিকারকে গেঁথে ফেলতে পারতাম। ছবি তোলার জন্য শিকারের খুব কাছাকাছি যেতে হয়। অত কাছ থেকে যদি ওটা আক্রমণ করে, তা হলে আমাকে আর বেঁচে ফিরতে হবে না।' তাদের গ্লাসের তরল আবারও শেষের দিকে। 'আমি আপনাকে আরও কয়েকটি ছবি দেখাই, প্রতিটি প্রাণীই খুব হিংস্র। এসব কাজ করতে গিয়ে মারা গেছেন অনেক ফটোগ্রাফার। এমন কী আমার পৈত্রিক প্রাণটাও খোয়া যেতে পারে। কখন শিকারের মুড বদলে যায়, তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। একটা লম্বা লেন্সের ক্যামেরাকে তারা এতটা ভয় পায় না, যতটুকু গুলির আওয়াজকে পায়। এ ছাড়া, কোনও শিকারের ক্ষেত্রে বাঁধাধরা যেমন আইন-কানুন আছে, তেমনটি নেই ফটোগ্রাফির সেক্ষেত্রে। নির্দিষ্ট কোনও সময় নেই। যে-কোনও সময়... যে-কোনও ঋতুতে আপনি ছবি তুলতে পারবেন। শিকারের টুর্নামেন্টগুলো আমি খুব পছন্দ করি, কিন্তু বাস্তবে মাঝে-মাঝে তার চেয়েও বেশি চ্যালেঞ্জিং হতে পারে একটা ছবি তোলা। যেমন, আপনি যদি একটি কোকিলের ছবি তুলতে চান, তবে আপনাকে অবশ্যই প্রথমে যেতে হবে ওটার খুব কাছাকাছি। আবার এটাও খেয়াল রাখতে হবে, যাতে কোকিলটা টের পেয়ে উড়ে না যায়। টেলি-ফটো লেন্স দিয়েও আপনি ভাল ছবি তুলতে পারবেন না, যদি কাছে যেতে না পারেন। তার থেকেও বেশি পরিশ্রম হবে কাঠবিড়ালির ছবি তুলতে গেলে। ঘন জঙ্গলে যে-কোনও মুহূর্তে কাঠবিড়ালি নিজেকে আড়াল করে ফেলবে, তখন আপনার পুরোটা দিনই বৃথা। হয়তো দেখবেন সারাটি দিন খুঁজেও অন্য কোনও কাঠবিড়ালির দেখা পাচ্ছেন না। তাই যখন সারাদিন পরিশ্রমের পর কাঙ্ক্ষিত শটটা পাই, তখন মনে যে তৃপ্তি আসে, তা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। কোনও শিকারিই চাইবে না কোকিলকে গুলি করে হত্যা করতে। কারণ ওরা সৌন্দর্যের প্রতীক। মানুষ মাত্রই সৌন্দর্যের পূজারী। কিন্তু যখন আপনার হাতে ক্যামেরা, তখন পুরো গল্পটাই হবে অন্যরকম। আপনার চোখে দেখা সৌন্দর্য ছড়িয়ে দিতে পারবেন সবার মাঝে। আমি এর স্বাদ পেয়েছি, রজার।'

'অবিশ্বাস্য! সত্যিই অবিশ্বাস্য!'

'এই দেখুন, এটা একটা পাহাড়ি ছাগল, এই যে এইটা বলগা হরিণ, আরও অনেক ছবি আছে। এই যে একটা কোকিল, এই ছবিটা নিয়ে মজার একটা ঘটনা আছে... ঘটনাটি হলো...'

ঘণ্টাখানেক পর ড্র্যানডিজ খামের ভিতর ছবিগুলো গুছিয়ে রাখল। কোন ফাঁকে যে পেরিয়ে গেছে একটি ঘণ্টা, কেউই টের পায়নি।

'শুধু শুধু এতক্ষণ বকবক করে আপনার মাথা খেলাম।'

'না, একদমই না। সময়টা উপভোগ্য ছিল। আমি বিস্মিত হয়েছি। ইশ! আমিও যদি এত সুন্দর ছবি তুলতে পারতাম!'

'চেষ্টা করে দেখুন, আপনিও পারবেন।'

ক্রাল মাথা নাড়ল। 'বছরখানেক আগে একটা ক্যামেরা কিনেছিলাম। কিন্তু আমার কাছে তখন কাজটা এত আকর্ষণীয় মনে হয়নি। শেষ কবে ছবি তুলেছি, তাই তো মনে নেই।'

'আমার মধ্যেও প্রথম প্রথম অত আগ্রহ ছিল না।'

'ছবি শিকার! সত্যি বলতে কি ঠিক বুঝতে পারছি না, হোমার। আপনার হয়তো দামি ডি.এস.এল.আর. আছে, বেশ কয়েকটা লেন্স আছে, হুড, ফ্ল্যাশলাইট ইত্যাদি সবকিছুই আছে। কিন্তু এসব শিখতে গেলে কম করে হলেও আমার লাগবে দুই বছর।'

'যতটা ভাবছেন, ততটা কঠিন নয়। ছবি তোলার সুবিধার্থেই কিনেছি কিছু লেন্স। কিন্তু আপনি হয়তো বিশ্বাসই করতে পারবেন না, অতীতে কী পরিমাণ খরচ করেছি অস্ত্রের পিছনে! তবে আপনিও যেহেতু শিকারের সঙ্গে জড়িত, আপনার হয়তো কিছুটা ধারণা আছে। আগে যা খরচ করতাম অস্ত্রের পিছনে, এখন তা ক্যামেরার পিছনে করি। নতুন জাপানিজ ডি.এস.এল.আর. আনিয়েছি কিছুদিন আগে, সঙ্গে কয়েকটা দামি লেন্স। তবে সবচেয়ে দামি হলো লেন্সের পিছনে আমার চোখ। ভাল একটা ছবি তুলতে হলে আপনার ভাল ফটোসেন্স থাকতে হবে। যত ভাল ডিভাইসই হোক না কেন, একটা ভাল ছবির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আপনার চোখ। এখন শুধুমাত্র

একটা লেযার প্রিন্টার হলেই আমি স্বয়ংসম্পূর্ণ। কয়েকমাসের মধ্যেই হয়তো আমি নিজেই নিজের তোলা ছবিগুলো প্রিন্টআউট করতে পারব। তখন আর ছবি প্রিন্ট দেয়ার জন্য দোকানে দোকানে বারবার ছুটতে হবে না।'

'আমি নিজেও তাই চিন্তা করছি। এত ঝামেলা কি আমি নিতে পারব?'

'এটুকুই তো, কঠিন কিছু নয়। দেখুন, রজার, আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই তো প্রথমবার বলে একটা ব্যাপার থাকে। প্রথম শিকারের অভিজ্ঞতা কি আপনার মনে আছে? আমার এখনও মনে পড়ে সেই দিনের কথা। আমার দাদার পুরানো দোনলা বন্দুক দিয়ে প্রথম শিকার করি, তখন আমার বয়স ছিল সবে চোদ্দ। আমার প্রথম শিকার ছিল একটা কাঠবিড়ালি। চার হাত দূর থেকে সেই কাঠবিড়ালিকে জংধরা বন্দুক দিয়ে খুন করেছি। সামান্য এক কাঠবিড়ালি। কিন্তু ওটাই আমার সারাজীবনের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর শিকার। সারাজীবন অনেক পশু শিকার করেছি, কিন্তু কখনও অমন উত্তেজনা অনুভব করিনি। আপনার প্রথম শিকারও আশা করি এমনই রোমাঞ্চকর ছিল।'

'হ্যাঁ, তা তো অবশ্যই। সেই স্মৃতি তো ভুলবার নয়।'

'যখন প্রথমবার বন্দুকের বদলে হাতে ক্যামেরা তুলে নিলাম, শুরু করেছিলাম একটা ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে। সেই ছোট ক্যামেরাতে ছবি তুলে যেই আনন্দ পেয়েছি, বর্তমান ডি.এস.এল.আর.-এ ছবি তুলেও সেই একই আনন্দ পাই।'

'আপনি কি ওই ক্যামেরাতে ভাল ছবি পেতেন?'

'হুম। সেই ক্যামেরাতেও ভাল ছবি তোলা সম্ভব। দরকার শুধু সঠিক মুহূর্তটি ধরতে পারা। আমার যদি সামান্যতম জ্ঞানও থাকে ছবি সম্পর্কে, তা হলে ভাল ছবি যে-কোনও ক্যামেরা দিয়েই নিতে পারব। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাল ডিভাইস ব্যবহার করা উচিত। ভাল ডিভাইস ভাল একটা মুহূর্তকে ফ্রেমে বন্দি করতে অনেক সাহায্য করে। আর এমন তো না যে, এসব ছবি আমাকে ম্যাগাযিনে ছাপাতে হবে। ছবি একইরকম হলেই হলো। নিজের সন্তুষ্টিটাই বড় কথা।'

'তা তো অবশ্যই।'

'ছবি তোলার পর আপনার মনে শুধু প্রশান্তিই আসবে। শিকারের উত্তেজনা-রোমাঞ্চের পাশাপাশি যে হতাশা ও আত্মগ্লানি থাকে, তা আর থাকবে না। শিকারের পুরো আনন্দটুকুই আপনি খুঁজে পাবেন। এটাই এর মূল কথা।'

'আনন্দই তো মূল কথা। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে কি এই বুদ্ধি কাজ করবে?'

'ওসব চিন্তা পরে। আগে আপনি আপনার ক্যামেরাটি নিয়ে বের তো হোন! মনের ইচ্ছে মত কিছু ছবি তুলুন। তারপর নিজেই বুঝতে পারবেন।'

'আগামীকাল সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর আমার প্রথম কাজ হবে ক্যামেরা কেনা। কিছুদিন আগে নতুন মার্কেটটায় ক্যামেরার দোকান দেখেছি। নতুন একটা ক্যামেরা নিয়েই সূচনা করব নতুন জীবনের।'

'আপনার জন্য শুভ কামনা, রজার। আপনি অবশ্যই পারবেন।'

'জানি না পারব কি পারব না, কিন্তু চেষ্টা করব। যদিও এখনও নিশ্চিত নই যে এতে কতটুকু কাজ হবে, বা আদৌ হবে কি না, তবে চেষ্টা করতে ক্ষতি তো নেই!'

'তা হলে চলুন, হয়ে যাক আরেক পেগ,' বলল ড্র্যানডিজ।

আড্ডা-মদ দিয়ে কাটল চমৎকার একটা সন্ধ্যা। রাতে তারা দু'জন সে রাতের মত বিদায় নিল। পরদিন সন্ধ্যায় আবার দেখা হবে বলে ঠিক করল।

আল আমিন বুক সাপ্লাই

প্রোঃ মোঃ আলী আকবর

সেবা প্রকাশনী ও প্রজাপতি প্রকাশনের নতুন-পুরানো সব বই এবং রহস্যপত্রিকা সরবরাহ করা হয়।

মোবাইল: ০১৭২৯১১৪৪৬০, ০১৯২৭-১১২৪৮০

পরদিন সকাল-সকাল ড্র্যানডিজ গেল জঙ্গলে। ক্যামেরা হাতে সে সম্পূর্ণ আলাদা এক লোক। একাগ্র, মনোযোগী ও নিষ্কম্প হাত, যা একজন শিকারির জাত বৈশিষ্ট্য। শহরে থাকতে সাধারণত সে নির্দিষ্ট পরিমাণ মদ্যপান করত। শুধুমাত্র বন্ধুদের পাল্লায় পড়লে ব্যতিক্রম ঘটত। অতিরিক্ত মদ্যপান তখন সারাদিনের মাথাব্যথা ও শরীর ম্যাজম্যাজের কারণ হয়ে দাঁড়াত। এখানে আসার পর প্রতিদিন সন্ধ্যায় প্রচুর পান করার পরও, এসব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি কখনও। স্নিগ্ধ আবহাওয়া বা প্রতিদিন ছবি শিকারের উন্মাদনা ও উত্তেজনাই হয়তো এর কারণ। প্রতিটি ছবি তোলার সময় সে রক্তের শিরায়-শিরায় উন্মাদনা অনুভব করে।

সারাদিন প্রচুর ছবি তোলা শেষ করে সন্ধ্যায় লজে ফিরল ড্র্যানডিজ। ক্রালের সঙ্গে দেখা করার কথা সন্ধ্যার পর। সে কাকতালীয় ঘটনায় বিশ্বাসী নয়। ক্রালের সঙ্গে তার দৈবাৎ দেখা হয়নি, এর পিছনে নিশ্চয়ই কোনও না কোনও কারণ রয়েছে। নয়তো কেন সে ক্রালের মত একজন শিকারির সঙ্গে ক্যামেরা নিয়ে কথা বলবে? ক্রাল শ্রোতা হিসেবে যথেষ্ট মনোযোগী ছিল। এখন দেখার বিষয়, সে কতটুকু প্রভাবিত হয়েছে ওর কথায়। হয়তো তার জীবনটা পাল্টে যেতে পারে, যেমনটা গেছে ওর। হয়তো একটা মানুষের উপকার করতে পারল ও।

তড়িঘড়ি করে বারের দিকে রওনা হলো ড্র্যানডিজ। কিন্তু গিয়ে ক্রালকে কোথাও খুঁজে পেল না। ক্রাল কি তা হলে আজ আর আসবে না? আশাহত হলো সে। বসে-বসে একাই হুইস্কি খেতে লাগল। প্রথমে দুই পেগ নির্জলা হুইস্কি। তারপর সোডা ও বরফ মিশিয়ে দ্বিতীয় গ্লাস। দ্বিতীয় গ্লাস শেষ হওয়ার দিকে, এসময় হন্তদন্ত হয়ে বারে প্রবেশ করল রজার ক্রাল।

'আরে, রজার! যাক, এসেছেন তা হলে! আশা করি আপনার দিনটা ভাল কেটেছে।'

'সারাদিনই আজ ব্যস্ত ছিলাম ছবি তোলায়।'

'কেমন কাটল সময়টা?'

ক্রাল শ্রাগ করল। 'কী আর বলব! বলতেই ইচ্ছা করছে না আসলে! এই কাজ আমার জন্যে না!' জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা মেমোরি কার্ড বের করে হাতের মুঠোয় রাখল সে। 'আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, হোমার। এমন কী আপনার সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত। অনেক করেছেন আমার জন্যে। গতকাল রাতে, এমন কী আজ সকালেও আমার মনে হয়েছিল, হয়তো পারব নিজেকে পাল্টে নিতে, হয়তো পারব সেই নির্মল আনন্দটুকু খুঁজে নিতে। কিন্তু আজ সারাদিন শেষে সে ধারণা আমার পাল্টে গেছে। সকাল-সকাল ক্যামেরা কিনতে বের হয়েছি। নতুন ক্যামেরা নিয়ে সারাদিনই ছুটে বেড়িয়েছি। ভেবেছি ছবি শিকার একইরকম রোমাঞ্চকর হবে। সেই অনুসরণ, শিকারের পিছনে ছুটে চলা, সবকিছুই ঠিক ছিল। এবং শেষে কোনও জীবনের পরিসমাপ্তিও ঘটেনি। কিন্তু...'

'কিন্তু আপনার বেলায় তা কাজ করেনি, বলতে চান?'

'না। আমার বেলায় এটা কাজ করেনি। আপনাকে খোলাখুলিই বলি– আমি শিকার করতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। বন্দুকের ট্রিগার টিপে যে আনন্দ পাই, তা ক্যামেরার শাটার টিপে পাই না। কোনও এক অজানা কারণে গুলির আওয়াজ আমার রক্তে উন্মাদনা জাগায়, যা ক্যামেরার শাটারের ক্লিক আওয়াজ পারে না। হয়তো এটা আমার রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে। হত্যাটা পছন্দ করি না ঠিকই, কিন্তু শিকার করায় এখনও রোমাঞ্চিত হই। হত্যা ছাড়া শিকারের উত্তেজনা অপূর্ণ থাকে।'

'জানি না আপনাকে এখন কী বলব! ভেবেছিলাম একই পথ আপনাকেও আনন্দ দেবে।'

দু'জনই উপলব্ধি করল, বলার মত কোনও কথাই আর খুঁজে পাচ্ছে না। পরিবেশটা হঠাৎ করেই আড়ষ্ট হয়ে পড়ল।

'আমি সন্তুষ্ট। কারণ চেষ্টাটা তো অন্তত করেছি। আপনি অনেক ভাল মানুষ, হোমার। আপনার সঙ্গে কাটানো সময়টুকু আমার আজীবন মনে থাকবে।'

'আপনি যা করেছেন, ঠিকই করেছেন। আপনার জায়গায় আমি থাকলে আমিও একই কাজ করতাম।'

ক্রালের হাতের দিকে ইশারা করে ড্র্যানডিজ বলল, 'ছবিগুলো নিয়ে কি করবেন?'

'আমার কাছে এসব অর্থহীন। মেমোরি কার্ডটি আপনি রেখে দিলে আমি বরং খুশিই হব।'

'ঠিক আছে। এটা আমার কাছে থাকল।'

মেমোরি কার্ডটি যত্ন করে তার পকেটে রেখে দিল ড্র্যানডিজ। চিন্তা করতে লাগল, শুধুমাত্র তার মুখের কথায় বিশ্বাস করে কেন নতুন একটা ক্যামেরা কিনল ক্রাল। মাঝেমধ্যে মানুষ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো নেয়, কিন্তু নেশা কেটে গেলেই তাদের সিদ্ধান্তগুলোয় পরিবর্তন ঘটে। হয়তো নেশাগ্রস্ত ক্রালের কাছে ব্যাপারটা খুব আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল। না হলে সে এমন করবে কেন? তার কাছে হয়তো একটি ছবি থেকে বন্দুকের গুলিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ক্রালকে দেখে মনে হয় না, সে অযথা কোনও কাজে সময় নষ্ট করার লোক। কিন্তু মানুষের মন অত্যন্ত জটিল।

ড্র্যানডিজ সাইকোলজিতে অনার্স করেছে। ক্রালের মনস্তত্ত্ব খুব ভাবাচ্ছে তাকে। ক্রাল কেন এমন করল, তা জানার একটা রাস্তাই খোলা আছে এখন। মেমোরি কার্ডের ছবি দেখা। ক্রাল কী জন্তুর ছবি তুলেছে, কে জানে! ছবি দেখলে ভাল একটা ধারণা পাওয়া যাবে তার মানসিকতা সম্পর্কে। জানা যাবে সে সত্যিই কতটুকু চেষ্টা করেছে।

ঘরে ফেরার পর মেমোরি কার্ডের ছবিগুলো দেখে অবাক হয়ে গেল ড্র্যানডিজ। মেমোরি কার্ডে প্রায় পঞ্চাশটি ছবি। সবগুলো ছবিই ভাল এসেছে। একদম নতুন কারও তোলা বলে মনেই হয় না। কিন্তু একটা ছবিতেও কোনও জন্তু-জানোয়ার নেই। সবগুলো ছবি শহরে তোলা। ছবিগুলোর সাবজেক্ট মানুষ। ছবিগুলোয় দু'জন মেয়ে আর দশজন পুরুষ রয়েছে। সবার দৈনন্দিন কাজের ফাঁকে ছবিগুলো তোলা হয়েছে। কেউ বসে, কেউ রাস্তায়, কেউ দোকানে, একেকজনের কয়েকটা করে ছবি। যাদের ছবি তোলা হয়েছে, তারা হয়তো জানেই না যে, কেউ একজন তাদের ছবি তুলেছে। ছবিগুলোর কালার ভাল না এলেও ছবিগুলো একদম ঝকঝকে। বোঝা যায়, ক্রালের ফটোসেন্স ভাল। ছবিগুলোর কম্পোজিশনও যথেষ্ট ভাল।

'হায়, ঈশ্বর!' একটা সম্ভাবনা মাথায় আসতেই চিন্তিত হয়ে পড়ল ড্র্যানডিজ। ক্রাল তো বলেছিল সে তার শিকারের ছবি তুলেছে!

তবে কি...

কিছু একটা করতেই হবে! কিন্তু করার কী আছে? রজার ক্রালের নামটি ভুয়া হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। আর ভুয়া না হলেও এখন তার কাছে ছবিগুলো ছাড়া আর কোনও প্রমাণ নেই। পুলিসের কাছে যাওয়া যায়। কিন্তু তাতে নিজেই ঝামেলায় জড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কী প্রমাণ দেবে সে পুলিসকে? উল্টো যদি তাকেই সন্দেহ করে বসে?

কিন্তু কিছু একটা তো করা উচিত!

এভাবে হাত-পা গুটিয়ে তো আর বসে থাকা যায় না!

এই বারোজনের কাউকেই সে চেনে না। যেসব শহরে ছবিগুলো তোলা, তাও অচেনা লাগছে। কীভাবে কোনও তথ্য ছাড়া সে এতগুলো মানুষকে খুঁজে বের করবে?

কোনও সমাধানেই আসতে পারল না ড্র্যানডিজ।

তবে পরে ছবির বারোজনের প্রত্যেককে খুঁজতে লাগল।

অবশেষে বারোজনের প্রত্যেককেই খুঁজে পেল। অবশ্য তাতে লাগল প্রায় দুই মাস।

একেকজন একেক শহরের বাসিন্দা।

খোঁজাখুঁজির কাজে ড্র্যানডিজের তেমন কষ্ট হয়নি। যা করার পত্রিকাওয়ালারাই করেছে। প্রত্যেকের মৃত্যু-খবরই এসেছিল পত্রিকার প্রথম পাতাতেই।

সবগুলো খবরেই একটা লাইন চোখে পড়ার মত:

'অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে খুন!' ■

শাওন বই ঘর

প্রো: মোঃ শাহীন শেখর

এখানে সেবা প্রকাশনীর নতুন ও পুরাতন যাবতীয় বই পাওয়া যায়।

বি. এ. কলেজ রোড, সিরাজগঞ্জ।

মোবাইল: ০১৬৭০-৭৮৭৮৫১, ০১৯১২-৯৪৫৪৯৭

বই-পরিচিতি

মীর কাশেম আলী

তিন গোয়েন্দা ভলিউম-১৪১–শামসুদ্দীন নওয়াব। প্রকাশক: সেবা প্রকাশনী। পৃষ্ঠা–৪৭২ (নিউজপ্রিন্ট)। দাম–১৬৭ টাকা।

তিন গোয়েন্দার এই ভলিউমটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৭২। আর সে জন্যই এর নাম দেয়া হয়েছে–মেগা ভলিউম। মোট তিনটি কাহিনি স্থান পেয়েছে এই ভলিউমে। কন্ট্রা দ্বীপের রাজপুত্র র‍্যামির জন্মদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ওখানে গিয়েছে তিন গোয়েন্দা। ওখানে পৌছনোর পর ঘটল অঘটন। ওখানকার রাজা অর্থাৎ র‍্যামির বাবার একাত্তরটা সোনার বার

চুরি হয়ে গেছে! তদন্তে নামল তিন গোয়েন্দা...। 'দ্বীপের রাজা' নামের কাহিনির শুরু হয় এভাবেই। ভলিউমের দ্বিতীয় কাহিনি 'গুপ্তনগরী'। টাইম মেশিনে চেপে তুরস্কের কনস্ট্যান্টিনোপ্‌ল্‌ পৌছল তিন গোয়েন্দা, সঙ্গে হিরু চাচা। এক সময় তৎকালীন রাজার বাহিনীর হাতে আটক হলো ওরা। ওই রাজা বলি দিতে চায় ওদেরকে। এখন উপায়...? এবার বইটির তৃতীয় কাহিনি 'ম্যাক লরেন্সের উইল' থেকে সামান্য অংশ তুলে দিচ্ছি এখানে: বিদঘুটে একটা ছায়া নড়ছে বুঝে মুখ তুলে তাকাল মুসা। ফ্ল্যাশলাইটের দিকে আঙুল তাক করে আবারও ওপরে দেখাল কিশোর। ওর হাতে ফ্ল্যাশলাইট দিল মুসা। ওটা ঘুরিয়ে ঘরের চারপাশে আলো ফেলল গোয়েন্দাপ্রধান। দুর্বল আলো পড়ল ধাতব এক টিউবের ওপর। কয়েক সেকেণ্ড পর বুঝে গেল, ওটা বেশি মোটা, ওই জিনিস দিয়ে কাজ হবে না। সিন্দুকে আলো ফেলল কিশোর। আবার আলো তাক করল দরজার ওপর। এক মুহূর্ত পর আবার দেখল সিন্দুক। ইশারা বুঝে ওর সামনে গিয়ে থামল মুসা-রবিন। সিন্দুকের ভেতরের অংশ এখন খালি। ভেতরে এমন কিছু নেই যেটা কাজে আসবে...নাকি আছে? সিন্দুকের ডালার উপর টোকা দিল কিশোর। তারপর আঙুল তাক করে দেখাল বড়সড় বেঞ্চ। গোয়েন্দাপ্রধান কী বোঝতে চাইছে তা বুঝতে কয়েক সেকেণ্ড লাগল মুসা ও রবিনের...। তিন গোয়েন্দার এই ভলিউমটি কাহিনির বৈচিত্রের জন্য ইতোমধ্যেই পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

হনন–ইসমাইল আরমান সম্পাদিত। প্রকাশক: সেবা প্রকাশনী। পৃষ্ঠা–২৮৮ (নিউজপ্রিন্ট)। দাম–১০৪ টাকা।

এটি একটি ওয়েস্টার্ন কাহিনি সংকলন। বইটিতে ছোটবড় মোট দশটি কাহিনি সংকলিত হয়েছে। নবীন-প্রবীণ সবার লেখাই ঠাঁই পেয়েছে এতে। প্রয়াত কাজি মাহবুব হোসেন থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক সময়ের তরুণ লেখক ডিউক জন-এর জমজমাট কাহিনি 'কু-ঝিকঝিক' পড়তে গিয়ে মনে হয়েছে, সুলেখক ইসমাইল আরমান সংকলনটি সম্পাদনার ব্যাপারে অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন। এখানে শিরোনাম গল্প 'হনন' থেকে সামান্য অংশ তুলে দিচ্ছি: ফিনক্সের কথায় কান দিল না কালাহান। সার্কেল অ্যারোর পাঞ্জারদের দিকে রয়েছে ওর নজর। লোকগুলো যখন ওর কথামত ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল, পজিশন নিল দেয়ালের ধারে...তখন ও বুঝতে পারল যে এরা আসলে সবাই সৎ লোক। এদের নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলত। ফিনক্স যে চালই চালতে গিয়ে থাকুক, এরা তাতে জড়িত ছিল না। মস্ত একটা ভার নেমে গেল যেন ওর বুক থেকে। ঘরের কোণ থেকে একটা রাইফেল তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল ও। বাতাসের প্রচণ্ড ঝাপটা যেন স্বাগত জানাল ওকে। কোনওমতে পোর্চে বেরিয়ে এসে চোখ কুঁচকে এদিক-ওদিক তাকাল কালাহান। পুবদিকে রয়েছে স্যালুনটা ওটার জানালায়

টিমটিমে আলো চোখে পড়ছে। সারি বেঁধে একদল লোক ঢুকছে স্যালুনে, তাদের মাঝে থমসনের দীর্ঘ দেহটা চিনতে অসুবিধে হলো না। শীতে কাঁপতে কাঁপতে আস্তাবলে গিয়ে ঢুকল কালাহান। ঘোড়ার শরীরের তাপে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ রয়েছে ভেতরটা। ওখানেই একপাশে পজিশন নিয়ে বসল কালাহান...। 'হনন' নামের এই কাহিনির লেখক সৈয়দ অনির্বাণ। পাঠকের কাছে নামটি খুব একটা পরিচিত না হলেও ওয়েস্টার্ন কাহিনি রচনায় ইতোমধ্যে তিনি যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিতে পেরেছেন। 'হনন' নামের এই ওয়েস্টার্ন কাহিনি-সংকলনটি শীঘ্রি পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করবে।

দ্য সোর্ড অভ ইসলাম–রাফায়েল সাবাতিনি।
রূপান্তর: সাইফুল আরেফিন অপু। প্রকাশক: সেবা প্রকাশনী। পৃষ্ঠা ৪৭২ (নিউজপ্রিন্ট)। দাম–১৫৯ টাকা।

পঞ্চদশ শতাব্দীর ঘটনা। কাহিনির কেন্দ্রস্থল জেনোয়া অস্থির রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের বলি হলো প্রসপেরোর বাবা অ্যান্টোনিওট্টো। পিতৃহত্যার প্রতিশোধের শপথ নিল সে। এদিকে আরেক ঘটনা। স্প্যানিশ সম্রাটের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তুর্কী নৌবাহিনীর কমান্ডার দ্রাগুত রেইজ। ঘটনাচক্রে দ্রাগুতের হাতে বন্দি হলো প্রসপেরো, সঙ্গে প্রেমিকা জিয়ান্না। শেষ পর্যন্ত ও কি পারবে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে? বিষয়টি জানতে হলে আপনাকে পড়ে যেতে হবে কাহিনির শেষ পর্যন্ত। এখানে কাহিনির সামান্য অংশ তুলে দিচ্ছি: প্রসপেরো খাপ থেকে ওর তলোয়ার এক ইঞ্চিও বের করার আগেই গলায় ঝোলানো বাঁশি তুলে তাতে ফুঁ দিয়ে দিল হিসার। সঙ্গে সঙ্গে স্রোতের মত লাফিয়ে ফেলুকায় নামল সিনানের এক ঝাঁক নগ্ন পদ নাবিক বা সৈন্য। মানুষ ওখানে এত বেশি হয়ে গেল যে লড়াই করা দূরে থাক, নড়ারই আর উপায় রইল না। শেষে লোক-লস্করসহ গ্যালিতে তুলে নেয়া হলো প্রসপেরোকে। জিয়ান্নার

সঙ্গে ভদ্র আচরণই করল কোর্সেয়ার। ভয় পেয়ে থাকলেও সেটা ভালভাবেই আড়াল করে গেল জিয়ান্না। কোর্সেয়ার হিসারের প্রতি যতই বিরূপ মনোভাব পোষণ করুক, সেটাও নির্লিপ্ততার আড়ালে লুকিয়ে গেল ও। জিয়ান্নাকেও গ্যালিতে তুলে নেয়া হলো এবং স্থান দেয়া হলো টিবারনাকলে। পায়ের উপর পা তুলে বসে আছে ও। আর ওর সামনে বসা লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে স্বর্ণের সুতায় এমব্রয়ডারি করা স্কারলেট আর কোর্তা পরিহিত গোলাকার একদলা মাংসপিণ্ড। এই লোকটিই সিনান আল শানিম ওরফে সিনান রেইজ...। রাফায়েল সাবাতিনির এই ক্লাসিক উপন্যাসটির ঝরঝরে রূপান্তর করেছেন সাইফুল আরেফিন অপু। বইটি এর মধ্যেই পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করেছে।■

বইয়ের জগতে আপনাকে স্বাগতম

সেবা ও প্রজাপতি প্রকাশন-এর গল্প, উপন্যাস, ওয়েস্টার্ন, ক্লাসিক, অনুবাদ, তিন গোয়েন্দা, কিশোর হরর, মাসুদ রানা ও যাবতীয় রিপ্রিন্ট বই বিক্রেতা

নিউজ হোম

৭ গোল্ডেন প্লাজা, সোনাদিঘির মোড়, রাজশাহী।

সেবা প্রকাশনী

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ২০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই তা উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সব ক'টি সিরিজ বা যে-কোনও এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। যতদিন টাকা শেষ না হয়, ততদিন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বই পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। টাকা শেষ হয়ে এলে বাকি টাকা ফেরত নিতে পারবেন, অথবা আরও টাকা পাঠাবেন। বিস্তারিত নিয়মাবলীর জন্য প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানায় ম্যানেজার বরাবর লিখুন।

নিজের পূর্ণ ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।** বিনামূল্যে ২৪ পৃষ্ঠার সাম্প্রতিক মূল্য-তালিকার জন্য সেবা'র বই-বিক্রেতার কাছে খোঁজ করুন।

ভি.পি.পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ১০০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। চাইলে বিকাশ-এ টাকা পাঠাতে পারেন, বিকাশ নং ০১৭৮৪-৮৪০২২৮। কেবলমাত্র টাকা পৌঁছুলেই পোস্ট যোগে বই পাঠানো যাবে।

গ্রাহক চাঁদা

রহস্যপত্রিকা

ষান্মাসিক সডাক ২২৫.০০ টাকা, বার্ষিক সডাক ৪৪৫.০০ টাকা

সেবা'র আগামী কয়েকটি বই

২/৪/১৭ ধূসর মেরু+কালো হাত+মূর্তির হুঙ্কার (তিন গোয়েন্দা ভলিউম-২১) রকিব হাসান

২/৪/১৭ দ্য কর্সিকান ব্রাদার্স+প্রেশাস বেইন+বেন-হার (কিশোর ক্লাসিক ভলিউম/রিপ্রিন্ট) রূপান্তর: কাজী আনোয়ার হোসেন/কাজী শাহনূর হোসেন/কাজী মায়মুর হোসেন

১০/৪/১৭ দুঃস্বপ্ন (ওয়েস্টার্ন) প্রান্ত ঘোষ দস্তিদার

১৭/৪/১৭ মিস্ট্রেস ওয়াইল্ডিং (অনুবাদ) রাফায়েল সাবাতিনি/শাহেদ জামান

দৃষ্টিভঙ্গি বদলান জীবন বদলে যাবে

কোয়ান্টাম মেথড

ভিজিট করুন

www.quantummethod.org.bd

বই, ব্রোশিওর, স্মারক

মেডিটেশন ও ডকুমেন্টারি

ফ্রি ডাউনলোড করুন

যোগ ফাউন্ডেশন

৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক, শান্তিনগর (২য় তলা), ঢাকা-১২১৭

ফোন: ৯৩৪১৪৪১, ৯৩৫৫৭৫৬, ০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩, ০৯৬১৩-০০২০২৫

e mail info@quantummethod.org.bd

বদলে গেছে লাখো জীবন